মার্কসবাদ জানবো

(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে)

মধুসুদন চক্রবর্তী

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড
পুঁজিবাদের বিকাশ

প্রথম খণ্ড

মানবের বিকাশ

এক কোটি বছরেরও আগের কথা। এখন যেখানে ভারত মহাসাগর, সেখানে তখন কোন সাগর ছিল না। ছিল এক বিশাল ঘন বনভূমি। সেই বনভূমিতে বাস করে নানা জাতের পশুপক্ষী, সরীসৃপ আর কীটপতঙ্গ। তার মধ্যে ছিল এক বিশেষ ধরনের এপ্ বা বানর (ইংরেজী এপ্ শব্দের বাংলা অন্য কোন প্রতিশব্দ না থাকায় বানর শব্দটিই ব্যবহার করছি)। তাদের সারা গা লম্বা লম্বা ঘন লোমে ঢাকা, কান দু'টো ছুঁচালো। তাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই দাড়ি ছিল। এই বিশেষ ধরনের বানরই মানুষের পূর্বপুরুষ। তারা দল বেঁধে সেই ঘন বনভূমির বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে।

তারা দল বেঁধে এ-গাছে ও-গাছে ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন খুঁজে খুঁজে খায় গাছের ফল, ফুল আর কচি পাতা। রাতে গাছের ডালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে নেয়। ঝড়জল এলে গাছের ঘন পাতার আড়ালে আশ্রয় নেয়, মুষলধারে বৃষ্টি নামলে সেখানে বসেই ভিজতে থাকে। শীতকালে হাড়কাঁপানো শীত ভোগ করে অসহায়ের মতো। সূর্য উঠলে তার উত্তাপে শরীর গরম করে নেয়। গ্রীষ্মের রোদকে তারা ভয় করে না, কারণ, ঘন বনে ছায়ার অন্ত নেই।

এক এক ঋতুতে বনের গাছপালা ফলে ফুলে, কচি পাতায় ভরে উঠে। বানরের দল পেট ভরে খেতে পায়। কিন্তু, কিছুদিন পরেই পাকা ফল মাটিতে ঝরে পড়ে। পচে গলে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। গাছের পাতাগুলি পর্যন্ত লাল হয়ে ঝরে পড়ে। তখনই হয় মহাবিপদ। খুঁজে পেতে যা পাওয়া যায় তাতে পেট ভরে না।

কিছুদিন পরে আবার গাছে গাছে নতুন পাতা দেখা দেয়। গাছগুলি ফলে ফুলে ভরে উঠে; তারাও প্রাণ ভরে খেতে পায়। এ থেকেই তারা তাদের খাদ্যযোগানকারী প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রথম জ্ঞান লাভ করে, ঋতুভেদ বুঝতে পারে।

এমনি করে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে সেই বানর জাতি বনে বনে বাস করে। কিন্তু, বিপদ হল তখন, যখন ভূ-প্রকৃতির বিবর্তনের ফলে ঘন বনভূমি ক্রমে পাতলা হতে লাগল। বড় বড় ফলের গাছের সংখ্যা কমে যেতে লাগল, রইল ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ে ভরা বিশাল তৃণভূমি।

দেখা দিল খাদ্য সংকট। অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে বানরের দল নেমে এল সমতল প্রান্তরে। খুঁজতে লাগল নতুন খাদ্য। সরু সরু ছুঁচালো আঙুল দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে পেয়ে গেল গাছের নরম মূল,—খেতে বেশ লাগল। ফল, ফুল কচি পাতার সঙ্গে গাছের মূলও তাদের খাদ্য তালিকায় স্থান পেল।

কিন্তু এক নতুন অসুবিধা দেখা দিল। চারপায়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো সহজ। কিন্তু, সামনের ছোট পা দু'টিতে ভর দিয়ে সমান মাটিতে চলতে খুবই অসুবিধা হয়। তা ছাড়া, ও-দু'টোকে চলার কাজ থেকে মুক্ত করতে পারলে খাদ্য সংগ্রহ করা সহজ হতো। হাতিয়ার ধরতে সুবিধা হতো।

তাই সুরু হয় তার জন্য চেষ্টা,—অর্থাৎ শ্রম। যার ফলে বানরের সামনের পা-দু'টো মুক্ত হল, বানর পেয়ে গেল হাত। আজ এই হাতই হল আরো শ্রম করার প্রথম প্রাকৃতিক হাতিয়ার, সেইসঙ্গে আরো উন্নত শ্রম করার যন্ত্র। হাত মুক্ত হল, বানর আয়ত্ত করল সোজা হয়ে চলবার ও দাঁড়াবার ভঙ্গি। "বানর থেকে মানুষে উত্তরণে এই হলো চূড়ান্ত পদক্ষেপ।"[১] এই সামান্যতম বিকাশ কিন্তু ঘটেছিল লক্ষ লক্ষ বৎসরের শ্রমের ফলে।

"বানর যদি তার পিছনের পা দু'টিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাড়াতে না পারত, তবে তার উত্তরাধিকারী মানুষ—সর্বকালে চার পায়ে ভর দিয়ে চলতে বাধ্য হতো। তার দৃষ্টি হতো নিচের দিকে এবং সে একমাত্র সেখান থেকেই প্রেরণা পেত। সে তার চারপাশে ও উপরের দিকে চোখ ফেরাতে পারত না। ফলে তার মস্তিষ্ক চতুষ্পদ জন্তুর মস্তিষ্কের চেয়ে বেশী প্রেরণা পেত না। এই সবই মূলতঃ মানুষের চেতনা শক্তির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াত।"[২]

মুক্ত হাত আর সোজা হয়ে চলার ক্ষমতা—এই দু'টি জিনিস মানুষের সামনে খুলে দিল নতুন দিগন্ত। মানবের বিকাশের ধারায় এল এক বৈপ্লবিক গতি। মানুষ এখন উন্নততর শ্রম করতে পারে। উন্নততর শ্রমের ফলে তার দেহের গড়নে নানা নতুন পরিবর্তন সুরু হল। হাতের পেশী, রগ ও অস্থিতে এল বিরাট পরিবর্তন। "মানুষের বুড়ো আঙুলকে সহজেই অন্যান্য আঙুল থেকে আলাদা করা যায়। সাধারণভাবে, মানুষের হাতের গড়ন বানরের হাতের গড়নেরই মতো। কিন্তু মানুষের শ্রম করার ক্ষমতা আছে। আর শ্রম করার সময় বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করার ফলে তার হাতে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে।"[৩]

ফলে হাত হল অনেক কর্মপটু, বৃদ্ধি পেল নৈপুণ্য ও কৌশল। "তাই হাত শুধু আর শ্রমের অঙ্গই নয়, হাত হল শ্রমেরই সৃষ্টি।"[৪]

"কিন্তু হাত শুধু নিজে নিজেই বেঁচে থাকেনি। অত্যন্ত জটিল এক অখণ্ড জীবদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ এই হাত। যা কিছু হাতের উপকারে লেগেছে, তাই উপকারে লেগেছে সমগ্র দেহের, যে দেহকে সেবা করে এই হাত।"[৫]

দু'পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে চলার ফলে পায়ের গড়নের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল। মস্তিষ্ক ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে এল আনুষঙ্গিক বিকাশ। সমগ্র জীবদেহে দেখা দিল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জোয়ার।

সমান মাটিতে নেমে মানুষ এক নতুন বিপদের মুখে পড়ল। একদিন একদল বন্য মানুষ খাবার খুঁজছে। হঠাৎ পাশের ঘন ঝোপটা থেকে বেরিয়ে এল একটা বন্য শুয়োর। ছুট্‌ ছুট্‌ ছুট্‌। যে যেদিকে পারে ছুটতে থাকে। দলের বুড়ী মেয়েলোকটি কিন্তু ওদের সঙ্গে ছুটতে পারে না। তাকে একা পেয়ে শুয়োরটা তার দেহটা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে চলে যায়। আর একদিন রাতের অন্ধকারে একটা নেকড়ে এসে একটা কচি বাচ্চাকে টেনে নিয়ে যায়। পরদিন তার আধ-খাওয়া দেহটা পাওয়া গেল বনের ধারে। তার দেহটাকে ঘিরে বসে অসহায়ের মতো কেঁদেছিল বন্য মানুষগুলি।

তাই বলে তো বসে থাকলে চলবে না। আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে। তারা ভেঙে নিল গাছের ডাল। তাই দিয়ে বানালো লাঠি। এদিক ওদিক থেকে কুড়িয়ে জড়ো করল পাথরের চাঁই। ক'দিন পরেই একটা বুনো শুয়োরকে তারা খতম করল লাঠি আর পাথরের ঘায়ে। বন্য পশুর সঙ্গে লড়াই করার উপায় তারা খুঁজে পেল। পরে পাথরের উপর শ্রম প্রয়োগ করে, অর্থাৎ, পাথর ঘষে ঘষে ধারালো পাথরের অস্ত্র তৈরী করতে শিখল তারা। এই ধারালো পাথরের অস্ত্রই বোধ হয় মানুষের তৈরী প্রথম যন্ত্র।

অন্যান্য প্রাণীরা প্রকৃতির দেওয়া নিজ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অর্থাৎ দাঁত, নখ ইত্যাদি ছাড়া অন্য কিছুর সাহায্য নিতে পারে না। মানুষ কিন্তু তা পারল। আর পারল বলেই সে এক লাফে পশু-জগৎ থেকে অনেকটা এগিয়ে গেল। "যখনই আমাদের পূর্বপুরুষরা হাতিয়ার তৈরী করতে শিখল তখনই মানুষের ইতিহাস নতুন মোড় নিল। আর তখনই সত্যিকারের শ্রমের সূচনা হল, এবং বিকাশের শক্তিশালী উপাদানগুলি একের পর এক দেখা দিতে লাগল।"[৬]

এই যুগের মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী। তারা সংগ্রহ করত গাছের ফল, ফুল, মূল ও কচি পাতা। এক অঞ্চলের ফলমূল ফুরিয়ে গেলে তারা হয়ে পড়ত অসহায়। ইতোমধ্যে তাদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। ফলে খাদ্য সমস্যা আরো কঠিন হয়েছে। তাই খুঁজে বের করতে হল নতুন খাদ্যাঞ্চল। নতুন

অঞ্চলের নতুন ফলমূল তাদের খাদ্য হল। এদের রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাদের দেহ ও মস্তিষ্কে নব নব বিকাশের সূচনা করল।

বন্য-মানুষ দল বেঁধে ফলমূল সংগ্রহ করে, হিংস্র পশুর আক্রমণ ঠেকায়। এক সঙ্গে বসে শান দেয় পাথরের অস্ত্র। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করে নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করে। সেই সঙ্গে ব্যবহার করে ভাঙা ভাঙা শব্দ। কাজের পরিধি যতই বাড়তে থাকে ততই এর প্রয়োজনও বাড়তে থাকে। তাই সুরু হয় ভাষার জন্ম শ্রম। "শব্দ সৃষ্টির চেষ্টার ফলে বানরের অপরিণত স্বরযন্ত্র আস্তে আস্তে অথচ অব্যাহত গতিতে উন্নততর শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। আর সেই সঙ্গে মুখের প্রত্যঙ্গগুলি ক্রমে ক্রমে একটার পর একটা স্পষ্ট ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে।"[৭] ভাষা মানুষকে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যায়।

"প্রথমে শ্রম, পরে তার সঙ্গে ভাষা—এই দু'টি প্রধানতম প্রেরণার প্রভাবে বানরের মস্তিষ্ক ক্রমে মানুষের মস্তিষ্কে রূপান্তরিত হল। দেখতে এক রকমের হলেও মানুষের মস্তিষ্ক অনেক বড়, অনেক নিখুঁত।"[৮]

"মস্তিষ্কের বিকাশের পাশে পাশে মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হাতিয়ার অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশ হতে লাগল।"[৯] আবার, "মস্তিষ্ক ও তার সহজ ইন্দ্রিয়গুলির বিকাশের প্রভাব পড়ল শ্রম ও বাকশক্তির উপর। সেই সঙ্গে চেতনার ক্রমবর্ধমান স্বচ্ছতা, কল্পনা ও বিচার শক্তির প্রভাবও পড়ল শ্রম ও ভাষার উপর ফলে শ্রম ও ভাষা উভয়ই নিত্য নতুন বিকাশের প্রেরণা লাভ করল।"[১০]

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে শ্রমের প্রভাবে বস্তুর উন্নততর বিকাশের ফলেই মানুষের মস্তিষ্ক তৈরি হয়েছে। মস্তিষ্ক ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতি ও বস্তুগুলি থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করে। এর জন্য কোন অপ্রাকৃতিক মন বা আত্মার প্রয়োজন হয় না। মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এইটি হল একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা।

সেই যুগে জীবনধারণের জন্য খাদ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা মানুষকে বিকাশের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছে। যেমন, কোন একটি অঞ্চলের সমস্ত ফলমূল শেষ হয়ে গেছে। নতুন করে আবার ফল হতে তখনও অনেক দেরি। বাধ্য হয়ে মানুষ বেরিয়ে পড়ল খাদ্যের সন্ধানে। ক'দিন পরেই তারা পেয়ে গেল একটি নতুন বন। সেই বনে গাছের ডালগুলি ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। আর সেই বনের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী, টল্ টল্ করছে তার স্বচ্ছ জল।

অনেক দিন পর মানুষগুলি পেট ভরে কম খেল। তারপর দল বেঁধে নদীতে গেল জল খেতে। হঠাৎ একজনের চিৎকার শুনে সবাই ছুটে গেল তার কাছে। দেখল, মস্ত একটা কাঁকড়া আটপায়ে চলছে নদীর ঢালু পার বেয়ে। এর আগে এমন জীব তারা কখনও দেখেনি। একজন সাহস করে ওটা ধরতে গেল। অমনি সেটা তার দাড়া দিয়ে কামড়ে ধরল লোকটার হাত। সে পরিত্রাহি চিৎকার করে হাত ঝাড়তে লাগল। কাঁকড়াটা ছিটকে পড়ে আবার চলতে থাকে। তখন একজন একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। পাথরের ঘায়ে কাঁকড়াটা মরে গেল। কাঁকড়াটা যে লোকটার হাত কামড়ে ধরেছিল, সে এইবার প্রতিশোধ নিল। দু'হাতে কাঁকড়াটাকে তুলে নিয়ে ওতে একটা কামড় বসিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত খোলসের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কতকটা নরম মাংস। সে চিবিয়ে চিবিয়ে মাংসটা খেতে লাগল। অন্য সবাই অবাক হয়ে তা দেখতে লাগল। এক সময় সে কাঁকড়াটা দলের সব চেয়ে বুড়ো লোকটার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'খেতে বেশ ভাল'। দলের নেতা তখন বাকিটা সবাইকে ভাগ করে দিল। জিনিসটা খেতে ভালই লেগেছে। তখন সবাই মিলে আরো কাঁকড়া খুঁজতে লাগল। এমনি করে কাঁকড়া খুঁজতে খুঁজতে মানুষ মাছ ধরতে ও খেতে শিখল।

মাছ ও কাঁকড়া খেতে শেখার পরই মানুষের নজর পড়ল ছোট ছোট প্রাণীর উপর। প্রথম প্রথম তারা ধীরগামী অপেক্ষাকৃত ছোট পশু শিকার করত। ক্রমে তারা দ্রুতগামী পশুও শিকার করতে শিখল। নিহত পশুদের কাচা মাংস খেতে সুরু করল। আমিষ আহারের অভ্যাস মানুষের বিকাশে এক নব দিগন্ত খুলে দিল। শরীরের দিক থেকে অনেক নতুন বিকাশ দেখা গেল। দেহের শক্তিবৃদ্ধি হল। সবচেয়ে বেশী সুফল ফলল মস্তিষ্কের উপর। মাংস থেকে মস্তিষ্কের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেল। "নিরামিষ-ভোজীদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হয়, আমিষ আহার ছাড়া মানুষের বিকাশ সম্ভব হয়নি। তাই আমাদের জানা সমস্ত জাতির মধ্যেই আমিষ আহার থেকে কোন না কোন সময়ে নরখাদক-বৃত্তির উদ্ভব অবশ্যই হয়েছিল। অবশ্য এ নিয়ে এখন আর আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে।"

এই যুগেই আগুনের আবিষ্কার মানুষের অগ্রগতিতে এক বৈপ্লবিক জোয়ার নিয়ে এল। আগুনের সঙ্গে মানুষের প্রথম পরিচয় সম্ভবত ভয়মিশ্রিত ভক্তির মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিক আগুনকে তারা প্রথম দেখতে পায় দাবানলরূপে। দাবানল তাদের খাদ্য যোগানকারী বনাঞ্চল ধ্বংস করে; পুড়িয়ে ফেলে তাদের আশ্রয়স্থল। তাদের কোন কোন সঙ্গীকেও পুড়িয়ে মারে। আবার এই আগুনই তাদের প্রধান-

ওর শত্রু হিংস্র প্রাণীদেরও পুড়িয়ে মারে। তারা আরো দেখতে পায় যে, আগুনের ভয়ে হিংস্র পশুরা পালিয়ে যায়। তা ছাড়া শীতকালে আগুনের উত্তাপ ঠাণ্ডা নিবারণ করে।

দাবানলের পর আগুন নিভে গেলে তারা ভয়ে ভয়ে জায়গাটা দেখতে যায়। তখনও এখানে ওখানে মোটামোটা গাছের গুঁড়িগুলি জ্বলছে। এদিকে ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় তারা দেখতে পায় কয়েকটি বন্য পশুর আধ-পোড়া মৃতদেহ। যে বন্য পশু শিকার করতে তাদের হন্যে হয়ে ছুটতে হয় তারই কয়েকটা তারা বিনা পরিশ্রমেই পেয়ে গেল। ভয়ের কথা ভুলে গিয়ে সবাই একসঙ্গে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। ধারালো পাথরের ছোরা দিয়ে চামড়া ছাড়িয়ে তখনই সবাই মিলে মাংস খেতে বসে গেল। বা! এ যে কাঁচা মাংসের চেয়ে অনেক ভাল। সবাই মিলে ভাবতে লাগল—কি করে এমন হল? ক্রমে তারা বুঝতে পারে আগুনই এর জন্য দায়ী।

তখন সুরু হল আগুনকে আয়ত্ত করার জন্য শ্রম। প্রথম প্রথম হয়ত দাবানলের শেষের পোড়া কাঠের আগুনকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছে দিনের পর দিন কাঠ ও শুকনো পাতা দিয়ে। যেমন বৈদিকযুগে যজ্ঞের আগুনকে রক্ষা করা হতো। এখনও আমাদের দেশের দূর গ্রামাঞ্চলে মাটির হাঁড়িতে তুষ ও কাঠ দিয়ে দিনের পর দিন আগুন রাখা হয়। পরে অবশ্য নানা উপায়ে আগুন জ্বালানোর পদ্ধতি মানুষই আবিষ্কার করল।

আগুনের আবিষ্কার মানব-বিকাশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পরবর্তীকালে এই আগুনই তার বিকাশের পথে প্রধান সহায়ক হয়। তারা আগুনের সাহায্যে মাংস পুড়িয়ে ও সেদ্ধ করে খেতে শিখল। সেদ্ধ মাংস খুব সহজেই হজম হয়। তাই পরিপাকযন্ত্রের আনুষঙ্গিক পরিবর্তন হল। মাংস তাদের নিয়মিত খাদ্য হয়ে পড়ল; আর সেই সঙ্গে শিকার হল প্রধান উপজীব্য।

আগুনের সাহায্যে 'আকর' থেকে তারা পিতল, তামা প্রভৃতি ধাতু বার করতে শিখল। আবার ধাতুতে ধাতুতে মিশিয়ে মিশ্র ধাতু তৈরি হল আগুনেরই সাহায্যে। পাথর ও কাঠের অস্ত্রের চেয়ে ধাতু নির্মিত অস্ত্র হল অনেক নিখুঁত, অনেক কার্যকর। ধনুর্বাণ বোধ হয় কিছুদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। তখন তারা তীরের ডগায় পাথরের ফলা ব্যবহার করত। কিন্তু পাথরের ফলার বদলে এখন ধাতু নির্মিত তীরের ফলা শিকারকে আরও সহজসাধ্য ও অব্যর্থ করে তুলল। এর অনেক আগেই মানুষ মাটি ও পাথরের পাত্রের ব্যবহার শিখেছিল। এখন তারা ধাতু নির্মিত পাত্রও ব্যবহার করতে শুরু করল। প্রস্তর যুগের মানুষ প্রবেশ

করল ধাতুর যুগে। বিকাশের গতিবেগে এল অভাবনীয় দ্রুততা। এই বিরাট গুণগত পরিবর্তন আগুনের আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হয়েছিল।

শিকারের সাহায্যে মানুষ খাদ্য হিসাবে মাংস পেত বটে, তবে ঘন বনে শিকার সব সময় সহজলভ্য ছিল না। এমনও হয়, পর পর ক'দিন একটা শিকারও মেলে না। তাই, মানুষ নতুন করে চিন্তা করতে বাধ্য হয়। প্রথম প্রথম তারা বন্য পশুদের চারিদিক থেকে তাড়িয়ে নিয়ে বনের একটা জায়গায় আটকে রাখত। প্রয়োজনমতো তা থেকে একটা দু'টো পশু মেরে মাংসের অভাব মিটাত। ক্রমে তারা দেখতে পেল স্ত্রী-পশু থেকে কিছুদিন পরপর কয়েকটা করে পশু-শাবক পাওয়া যায়। তখন বন্য পশুকে পোষ মানিয়ে গৃহে পোষার কথা তাদের মনে জাগল। সুরু হল তার জন্য শ্রম. মানুষ আয়ত্ত করল পশুপালন ও পশু প্রজননের কলাকৌশল। এইভাবে পশুপালনের ফলে মাংসের যোগানই যে শুধু নিয়মিত হল তাই নয়, তার পরিমাণও বৃদ্ধি পেল।

সুরু হয়ে গেল নিয়মিত পশুপালন। এতে আরো একটা উপরি লাভ হল। মাংসের সমস্যা তো মিটলই, উপরন্তু পাওয়া গেল দুধ। পরে এই দুধ থেকে অন্যান্য প্রকার খাদ্য পাওয়া গেল। শরীরের পক্ষে দুধ খুবই পুষ্টিকর, বিশেষত শিশুদের পক্ষে।

ফলমূল মাছমাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের নানা খাদ্য সম্ভার এখন মানুষের দখলে। তাই খাদ্যের অভাব অনেকটা মিটেছে। কিন্তু, নতুন এক বিপদ দেখা দিল। তাদের আদি বাসস্থান গ্রীষ্ম-অঞ্চলে ক্রমে এক হিমপ্রবাহ নেমে আসতে থাকে। তার প্রভাবে বন ও তৃণভূমি লোপ পেতে থাকে। ফলে পশু খাদ্যের দারুণ অভাব দেখা দেয়। এদিকে বন্য মানুষের জনসংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের পালিত পশুযূথও হয়ে উঠেছে খুব বড়। তাই মানুষ বাধ্য হয় উষ্ণতর অঞ্চলের সন্ধান করতে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বাসযোগ্য বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বাসস্থান গড়ে তোলে এশিয়া, ইউরোপ আমেরিকা ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে।

এই সকল অঞ্চলের জলবায়ু ছিল স্বভাবতই ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে বেঁচে থাকার ক্ষমতা মানুষ আয়ত্ত করে। "তাদের আদিবাস ছিল সবঋতুতে প্রায় সমান উষ্ণতা বিশিষ্ট অঞ্চলে। এখন তাদের বাসস্থান পরিবর্তিত হল এমন সব অঞ্চলে যেখানে প্রতিটি বছর গ্রীষ্ম ও শীত ঋতুতে বিভক্ত এবং অঞ্চলগুলির অধিকাংশই শীতপ্রধান। ফলে নতুন নতুন প্রয়োজন দেখা দিল। যেমন,—মাথা গোঁজবার জন্য আশ্রয়, শীত ও জলো হাওয়া থেকে

রক্ষা পাওয়ার উপযুক্ত পোশাক। সুতরাং, শ্রমের নতুন ক্ষেত্র খুলে গেল। সুরু হল নতুন ধরনের কর্মকাণ্ড। ফলে মানুষ পশু থেকে আরো বেশী করে পৃথক হয়ে পড়ে।"[১২]

পশুপালক মানুষ প্রথম দিকে প্রায়ই ছিল যাযাবর। তারা তাদের পশুপাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। এক জায়গায় ঘাস বা পশুর খাদ্য শেষ হয়ে গেলে তারা পশুপাল নিয়ে নতুন জায়গায় উঠে যেত। এমনি যাযাবর লোক আমরা এখনও দেখতে পাই। শীতকালে গাঁয়ের মাঠে মাঠে ভেড়া বা শুয়োরের পাল নিয়ে তারা তাঁবু খাটিয়ে বাস করে। পশুর বিষ্ঠায় জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় বলে জমির মালিকরা সানন্দে ওদের তাদের জমিতে থাকতে দেয়।

পশুখাদ্যের জন্য ঘাস জন্মাতে গিয়েই মানুষ চাষ করতে শিখল। "শস্য পশুর জন্য উৎপন্ন হবার পর অবিলম্বেই শস্যদানা মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে।"[১৩] সুরু হয় নিয়মিত কৃষিকাজ; এবং ক্রমে কৃষিই মানুষের প্রধান উপজীব্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পশুপালন ও শিকারও পাশাপাশি চলতে থাকে। খাদ্য-সংগ্রহকারী মানুষ এখন সার্থক অর্থে খাদ্য-উৎপাদনকারীতে পরিণত হয়। যাযাবর মানুষ বাঁধা পড়ে মাটির সঙ্গে, জমির সঙ্গে। পত্তন হয় গ্রাম, পরে শহর ও নগর, আর তার চারপাশে ফল ও শস্যের খামার।

খাদ্য সংগ্রহকারী থেকে খাদ্য-উৎপাদনকারীতে পরিণত হওয়া মানবের বিকাশে একটি মৌলিক গুণগত পরিবর্তন। এতদিন মানুষ প্রকৃতি থেকে শুধু তার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহই করতে পারত। কিন্তু প্রকৃতিকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করতে পারত না। কৃষি, কিন্তু সেই প্রক্রিয়ারই সূচনা করল। মানুষ প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে তার জ্ঞান কাজে লাগিয়ে প্রকৃতিকে এখন তার নিজের সেবায় নিয়োজিত করল। "সংক্ষেপে বলতে গেলে, পশুরা তাদের বহিঃ-প্রকৃতিকে কেবল ব্যবহারই করে থাকে এবং কেবলমাত্র নিজেদের উপস্থিতি দ্বারাই তাতে পরিবর্তন আনতে পারে। মানুষ কিন্তু নিজের চেষ্টায় প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনে তাকে তার নিজের কাজে লাগায়। অর্থাৎ, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব করে। এইটাই হল মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত ও উল্লেখযোগ্য প্রভেদ। আবার শ্রমই এই প্রভেদ ঘটিয়েছে।"[১৪]

প্রকৃতিকে নিজের সেবায় নিয়োজিত করতে গিয়ে মানুষ প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃততর ও গভীরতর জ্ঞানের অধিকারী হল। ফলে মানুষের উৎপাদন শক্তির উন্নতি হল। উৎপাদন ক্ষেত্রেও নানা বৈচিত্র্যের সূচনা হল। বিকাশ লাভ করল নানা প্রকারের হস্তশিল্প, নানা প্রকারের গৃহশিল্প। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের

সম্পর্কের নব নব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও নানা বিকাশের সূচনা হল।

পরবর্তীকালে লোহা ও ইস্পাতের আবিষ্কার মানবের বিকাশের ক্ষেত্রে একটি চূড়ান্ত বিপ্লব। কৃষি ও হস্তশিল্পে লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার শ্রমকে অধিকতর উৎপাদনক্ষম করে তুলল। এতদিন যে সকল ধাতু মানুষের জানা ছিল লোহা ও ইস্পাত তার চেয়ে অনেক শক্ত, যন্ত্রপাতি তৈরির পক্ষে অধিকতর উপযোগী। ইস্পাতের তৈরি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির উদ্ভবের ফলে উন্নততর শ্রম সম্ভব হল। এরপর বাষ্প ও বিদ্যুতের আবিষ্কার মানব জাতিকে সভ্যতার বর্তমান উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে।

আজ মানুষ তার অসংখ্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য হাজারো রকমের জিনিস অনায়াসে তৈরি করছে, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিত্যনতুন জিনিস আবিষ্কার করছে। উৎপাদন পদ্ধতিতে নিত্যনতুন পরিবর্তন এনে মানুষের শ্রমকে করছে আরো বৈচিত্র্যময়, আরো উৎপাদনক্ষম। তার উদ্যম এখন আর পৃথিবীর পরিসীমার মধ্যেই শুধু আটকা পড়ে নেই। বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য উদঘাটন করতে সে আজ বদ্ধপরিকর। ইতোমধ্যে সে চাঁদের মাটিতে পাড়ি জমিয়েছে।

কোন আধুনিক বিশাল শহরের গগনচুম্বী প্রাসাদগুলির সামনে দাঁড়িয়ে কারো কি একবার মনে পড়ে যে, এমন একদিন ছিল যখন তাদেরই পূর্বপুরুষ ঝড়জলের ভয়ে গাছের পাতার আড়ালে আশ্রয় নিত,– একটা তুচ্ছ শিকারের জন্য দল বেঁধে বনে বনে ছুটে বেড়াত।

কিন্তু, এই অসম্ভব কি করে সম্ভব হল? এর গোপন চাবিকাঠিটি কি? কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি কি আমাদের অজান্তে এই সব ব্যবস্থা করেছে? অবশ্যই নয়। এই অসম্ভব সম্ভবকারী শক্তিটি হল শ্রম। মানুষ নিজেই শ্রমের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে এই উন্নত স্তরে পৌঁছেছে। আমাদের এই পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এমন মানব গোষ্ঠী বাস করে, যারা এখনও সভ্যতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে পারেনি। এর একমাত্র কারণ এই যে, সেই সেই এলাকায় পরবর্তী সমাজব্যবস্থায় পৌঁছানোর সামাজিক পরিবেশ এখনও গড়ে ওঠেনি।

মানব বিকাশে শ্রমের ভূমিকা সম্বন্ধে উপসংহারে বলা যায়, "হাত, বাক্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্কের সম্মিলিত কাজের ফলে মানুষ শুধু ব্যক্তিগত ভাবেই নয়, সমাজগত ভাবেও জটিলতর কাজ করতে সক্ষম হল। সক্ষম হল উন্নততর লক্ষ্য স্থির করতে এবং সেই লক্ষ্যকে কাজে পরিণত করতে। যুগভেদে শ্রম নিজেই হয়ে পড়ল

ভিন্নতর, নিখুঁত ও বহুমুখী। শিকার ও পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকাজ যুক্ত হল। তারপর এল সুতো কাটা, কাপড়-বোনা, ধাতুর কাজ, মৃৎশিল্প ও নৌচালনা। ব্যবসা ও শিল্পের সঙ্গে অবশেষে কলা ও বিজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করলো। উপজাতি পরিণত হল জাতি ও রাষ্ট্রে। দেখা দিল আইন ও রাজনীতি। সেই সঙ্গে দেখা দিল মানুষের মনের উপর মানবীয় বস্তুর অতিপ্রাকৃত প্রতিবিম্ব অর্থাৎ, ধর্ম। শ্রমিকদের হাতের তৈরি সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর গুরুত্ব কমে যেতে থাকে সমাজের এই সব ধ্যান-ধারণার তুলনায়, যেগুলিকে প্রথম দৃষ্টিতে মানুষের মনের কাজ বলে ধারণা হয় এবং সমাজকে প্রভাবিত করছে বলে মনে হয়। ক্রমেই এই ঘটনা বেশী বেশী করে ঘটতে থাকে। কারণ, সমাজ বিকাশের আদিপর্ব (উদাহরণ স্বরূপ আদিম পরিবারের উল্লেখ করা যায়) থেকেই দেখা যায় যে, যে মন শ্রমের পরিকল্পনা করে সেই মনের মালিককে কখনই নিজের হাতে কাজ করতে হয়নি। সে অপরকে দিয়ে সেই শ্রম করিয়ে নিতে পেরেছে। তাই, সভ্যতার দ্রুত বিকাশের সমস্ত কৃতিত্ব আরোপ করা হয় মানুষের মনের উপর এবং মস্তিষ্কের বিকাশ ও তার সক্রিয়তার উপর। প্রয়োজন বা অভাববোধ নয়, চিন্তাই হল সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টার উৎস—এমনি ভাবেই সবকিছু ব্যাখ্যা করতে মানুষ অভ্যস্ত হল (কিন্তু, যে ভাবেই হোক না কেন অভাববোধই প্রথম মনের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তখন মন তা বুঝতে পারে।)। এই ভাবে কালক্রমে ভাববাদী বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গির উদ্ভব হল। প্রাচীন যুগের পরিসমাপ্তির পর থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের মনকে প্রভাবিত করে আসছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে এখনও এতদূর প্রভাবিত করে রেখেছে যে, চূড়ান্ত বস্তুবাদী ডারউইনপন্থী প্রকৃতিবিজ্ঞানীরাও এখন পর্যন্ত মানবের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে অক্ষম। কারণ, ভাববাদী মতবাদের প্রভাবে পড়ে তারা মানবের উৎপত্তিতে শ্রমের ভূমিকা স্বীকার করে না।"[১৫]

ধর্মের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে বলা যায় যে, "সমস্ত ধর্ম কার্যতঃ মানুষের মনের উপর সেই সব বহিঃশক্তির প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়, সে সব বহিঃশক্তি তাদের প্রতিদিনের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। এই প্রতিফলনের পার্থিব শক্তিগুলি অতিপ্রাকৃত শক্তির রূপ নেয়। ইতিহাস বলে গোড়ার দিকে প্রথমতঃ প্রকৃতির শক্তিগুলিই প্রতিফলন হত। পরবর্তীকালে বিকাশের ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীতে অসংখ্য ও বৈচিত্র্যময় নরত্বের আরোপ হয়েছে।"[১৬]

উপরের প্রবন্ধ থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, মানবের বিকাশের কোন পর্যায়েই ঈশ্বর বা অন্য কোন দৈবশক্তির কোন প্রভাব ছিল না। বিশেষ এক ধরনের বানর

বিশেষ এক প্রকার শ্রমের প্রভাবেই মানুষের পূর্বপুরুষ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। পরে সেই বন্য মানুষ তার জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ ও উৎপাদনের জন্য উন্নত থেকে উন্নততর শ্রম করতে থাকে। আর শ্রমের প্রভাবেই আজ তারা সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। এটাও স্পষ্ট দেখা যায় যে মানবের বিকাশ ক্রমবিবর্তনের ধীরগতিতে না হয়ে বিশেষ বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে বৈপ্লবিক দ্রুতগতিতে হয়েছে। আরো দেখা যায় যে, মানুষ তার সজ্ঞান প্রচেষ্টা দ্বারা প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলিকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করতে পেরেছে বলেই পশুজগৎ থেকে ক্রমেই উন্নততর স্তরে উঠতে পেরেছে।

নির্দেশক টীকা :

[মানুষ কোথা থেকে এল ? কি করেই বা মানুষ পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল ?

এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। নানা যুগে, নানা জন, নানাভাবে এর উত্তর দিতে চেষ্টা করেছেন। উত্তরগুলি এসেছে প্রধানতঃ কোন না কোন ধর্মীয় উপাখ্যান বা সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। আর ঐগুলি তৈরি হয়েছে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে। যেমন, কোন একটি হিন্দু উপাখ্যান বলে --'মানুষ ব্রহ্মার সন্তান'। প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা হল অমনি ব্রহ্মা মানুষ সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ সৃষ্টি হয়েছে, যেমন, মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু থেকে বৈশ্য ও পদযুগল থেকে শূদ্র। স্বভাবতঃ ব্রহ্মার বিভিন্ন অঙ্গের শ্রেষ্ঠত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন বর্ণের সামাজিক অবস্থান বুঝতে হবে। সুতরাং এই উপাখ্যান মতে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সেবা করা শূদ্রের জন্মগত কর্তব্য।

তার উপর আছে জন্মান্তরবাদ। যার মূল বক্তব্য হল -'ইহজন্ম কিছু নয়, পরজন্মই সব'। ইহজন্মের সব অভাব অভিযোগ, দুঃখ, লাঞ্ছনা পূর্বজন্মের পাপের ফলভোগ। ইহজন্মে পুণ্য করলে, অর্থাৎ কোন প্রতিবাদ না করে সব অত্যাচার ও শোষণ সহ্য করে গেলেই পরজন্মে অক্ষয় স্বর্গসুখ লাভ হবে।

বৌদ্ধ ধর্মের জাতকের উপাখ্যান, খ্রীষ্ট-ধর্মের আদম ও ইভের উপাখ্যান মানুষের জন্ম বৃত্তান্তকে রহস্যময় করে রেখেছে, আর অনুশাসন দিচ্ছে,—অন্যায়ের প্রতিবাদ করা বা প্রতিকারের চেষ্টা করা ধর্মপ্রাণ মানুষের কর্তব্য নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানীগণ নানা গবেষণা দ্বারা মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন তাদের মতে, কোটি কোটি বৎসরের বিবর্তনের ফলে প্রকৃতির মধ্যেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব হয়েছিল। মানুষ ও অন্যান্য উদ্ভিদ ও

প্রাণী সেই প্রাণেরই ক্রমবিবর্তনের ফল। বিশেষ এক প্রকার বানর (ape) থেকে ক্রমবিবর্তনের । মানুষের উদ্ভব হয়েছে, -ডারউইন
স্বীকৃত। এতৎসত্বেও ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এখনও আমাদের মধ্যে এত প্রবল যে সব স্বীকার করেও আমরা একটা 'তবু' দিয়ে শেষ করি।

মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম চিন্তাবিদ যারা মানবের উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। ঐতিহাসিক 'বস্তুবাদ' তত্ত্বের সাহায্যে তারা সার্থকভাবে প্রমাণ করেছেন যে,—বিশেষ ধরনের শ্রমের ফলেই এক উন্নত ধরনের বানর (ape শব্দটির অন্য কোন বাংলা প্রতিশব্দ না থাকায় আমরা বানর শব্দটিই ব্যবহার করব) থেকেই মানুষের উদ্ভব হয়েছে। আর সেই মানুষ একসঙ্গে কাজ করে এবং ক্রমে উন্নততর শ্রম করে আজ সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে। সুতরাং, মানবের উদ্ভব ও বিকাশের কোন পর্যায়েই ঈশ্বর বা অন্য কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির হাত ছিল না।

মানবের বিকাশ সম্বন্ধে মার্কস ও এঙ্গেলসের বক্তব্যের বিশেষত্বগুলি হল—

(১) মানবের উদ্ভব ও বিকাশের প্রতি স্তরেই অতিপ্রাকৃত কোন শক্তির হাত ছিল না।

(২) মানবের উদ্ভব ও বিকাশের প্রাত স্তরে শ্রমের ভূমিকাই ছিল প্রধান।

(৩) মানবের বিকাশ সব সময় ক্রমবিবর্তনের ধীর গতিতে না হয়ে, বিভিন্ন যুগসন্ধিক্ষণে বৈপ্লবিক দ্রুতগতিতে ঘটেছে।

(৪) অন্যান্য প্রাণীদের চেয়ে মানুষের বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন এক স্তরে এসে তারা প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলিকে প্রভাবিত করে নিজের সেবায় নিযুক্ত করতে পেরেছিল।]

১—এঙ্গেলস ২—ডারউইন ৩—মিখাইল ন্যাসতুক ৪—এঙ্গেলস ৫—ঐ ৬—মিখাইল ন্যাসতুক
৭—এঙ্গেলস ৮—ঐ ৯—ঐ ১০—ঐ ১১—ঐ ১২—ঐ ১৩—ঐ ১৪—ঐ ১৫—ঐ ১৬—ঐ।

সমাজের বিকাশ

শ্রমের ফলে বানরের সামনের পা দু'টো মুক্ত হল সে পেল হাত সেই সঙ্গে সে আয়ত্ত করল সোজা হয়ে দাঁড়াবার ও চলবার ভঙ্গি। বানর থেকে মানুষের উত্তরণের এইটাই ছিল চূড়ান্ত পদক্ষেপ। কিন্তু, তখনও মানুষ অনেককাল ধরে বানরের মতোই ফলমূল সংগ্রহ করে তা থেকে বেঁচে থেকেছে। দল বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করেছে. এ বন থেকে ও বনে ঘুরে বেড়িয়েছে। তখন তাদের মধ্যে কোন প্রকার **শ্রম-বিভাগ** অর্থাৎ **কাজের ভাগাভাগি** ছিল না।

পরে খাদ্য হিসাবে তারা মাংস খেতে শিখল, শুরু হল মাংসের জন্য শিকার। বন্য পশু শিকার করতে তার পিছনে দ্রুত ছুটতে হত অনেক সময় সারা দিন ধরে শিকারের পিছনে ছুটাছুটি করতে হত। শারীরিক গঠনের দিক থেকে নারী ছিল কিছুটা দুর্বল। বিশেষতঃ, সন্তানধারণের সময় তাদের পক্ষে ছুটাছুটি করা অসম্ভব ছিল। তাই, দেখা দিল প্রথম **স্বাভাবিক শ্রম বিভাগ**—এই কাজগুলি পুরুষরা করবে, ঐ কাজগুলি নারীরা করবে। সেই মতো পুরুষ শিকার করে খাদ্য সংগ্রহ করে, নারী খাবার ভাগ করে দেয়, গৃহস্থালী সামলায, শিশুদের লালন পালন করে। শিকারের অস্ত্র-শস্ত্র পুরুষদের হেফাজতে, আর গৃহস্থালী জিনিসপত্র নারীদের অধিকারে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রধান।

আদিম সাম্যবাদী সমাজ :

এক বা একাধিক বয়স্ক নারীর সন্তান সন্ততিদের নিয়েই ছিল এক একটি দল। পিতৃ-পরিচয়ের চেয়ে মাতৃ-পরিচয় ছিল অনেক বেশী সঠিক। তাই, তখন মায়ের পরিচয়ে সন্তানদের পরিচয়ই ছিল স্বাভাবিক। মায়ের রক্তের সম্বন্ধকে ভিত্তি করেই বন্য মানুষের দলগুলি প্রথম সংগঠিত হতে সুরু করল। গড়ে উঠল গোষ্ঠী-প্রথা এই গোষ্ঠী-প্রথাই আজকের দিনের সমাজ ও রাষ্ট্রের ভ্রূণ।

গোষ্ঠী-প্রথার মধ্যে মানুষ বাস করেছে হাজার হাজার বছর ধরে। এমনকি তিন হাজার বছর আগে পর্যন্ত এই প্রথাই সব জায়গায় চালু ছিল। এখনও পৃথিবীর নানা অঞ্চলে আদিম গোষ্ঠী-প্রথার সমাজ দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আদিবাসীদের মধ্যে এখনও গোষ্ঠি-ব্যবস্থার কিছু কিছু অবশেষ দেখতে

পাওয়া যায়। এই গোষ্ঠি-প্রথার আদিম সমাজ ব্যবস্থাকেই বলা হয়, "আদিম সাম্যবাদী সমাজ" (আদিম যৌথ সমাজ)।

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য নানা প্রকারের দ্রব্য-সামগ্রীর প্রয়োজন হয়। যেমন খাদ্যের জন্য চাই ফল, মূল, মাছ, মাংস ইত্যাদি। আশ্রয়ের জন্য চাই গৃহ অথবা গুহা, শিকার করার জন্য চাই অস্ত্র-শস্ত্র, দ্রুতগামী যান ইত্যাদি। প্রকৃতির গাছপালায় রয়েছে ফলমূল। মানুষ শ্রম করে তা সংগ্রহ করে আনলে, তবে সেই ফলমূল মানুষের ক্ষুধা দূর করে। প্রকৃতির বনে রয়েছে ডালপালা, লতাপাতা। মানুষ শ্রম করে তা নিয়ে এসে তাই দিয়ে কুঁড়ে ঘর তৈরি করলে, তবে সেই মতো মানুষকে রোদবৃষ্টি, ঝড়জল থেকে রক্ষা করে, তাদের আশ্রয়ের কাজ করে। প্রকৃতির মাঠে ময়দানে পড়ে আছে নানা প্রকারের নানা আকারের অসংখ্য পাথর। মানুষ শ্রম করে তা সংগ্রহ করে আনে। শ্রম করে পাথরে পাথর ঘষে শান দিয়ে হাতিয়ার বা অস্ত্র তৈরি করে, তবে সেই অস্ত্র দিয়ে বন্য পশু শিকার করতে পারে। তবে তারা মাংস খায়।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলির উপর মানুষ তার শ্রম প্রয়োগ করে তবে নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পেতে পারে। এই প্রক্রিয়ার নামই **উৎপাদন**। সুতরাং উৎপাদনের মূল উপাদান হল দুটি—প্রকৃতি ও শ্রমশক্তি।

আবার, প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলির উপর সার্থকভাবে শ্রম প্রয়োগ করতে হলে এদের সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। যেমন, মানুষকে জানতে হবে যে, একজাতের পাথর সহজেই ক্ষয় হয়, অথচ অন্য একটি জাতের পাথর তা হয় না। তবে তারা শক্ত পাথরের উপর নরম পাথর ঘষে তাকে ধারালো করতে পারে। আবার মানুষ জেনেছে যে, জল সর্বসময় নিচের দিকে যায়। তাই কুঁড়ে ঘরের চাল বাইরের দিকে ঢালু করে তৈরি করে। মানুষের শ্রমশক্তি ও প্রকৃতির উপর তা প্রয়োগ করার কৌশল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির মিলিত শক্তিকেই বলা হয় **উৎপাদন শক্তি**। প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞানের বৃদ্ধি, কলাকৌশলের উন্নতি ও যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে এই উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশ ঘটে।

উৎপাদন কিন্তু মানুষ একা একা করে না। তারা তা করে অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে, অর্থাৎ, সমাজবদ্ধ ভাবে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে এই সম্বন্ধকে বলা হয়—**উৎপাদন সম্পর্ক**। উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদনের উপাদানের মালিকানার ভিত্তিতে; অর্থাৎ, উৎপাদনের উপাদান ও যন্ত্রপাতির মালিক এবং শ্রমকারী মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধ দিয়ে।

সমাজ বিকাশের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাব যে, উৎপাদন শক্তির বিকাশ

ও তার ফলে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ইতিহাসই সমাজ বিকাশের ইতিহাস।

আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থার যুগে উৎপাদন শক্তি ছিল খুবই অনুন্নত। প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল সীমাবদ্ধ। ধারালো পাথরের অস্ত্র ও তীর-ধনুকই ছিল মানুষের প্রধান হাতিয়ার। হাতিয়ার ব্যবহার করার কৌশলও ছিল খুবই মামুলী ধরনের। এই অনুন্নত উৎপাদন শক্তি দিয়েই মানুষ তাদের জীবনধারণের জন্য দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করত। মানুষকে বেঁচে থাকতে হত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও হিংস্র পশুদের আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। উৎপাদন শক্তি অনুন্নত থাকায় উৎপাদন কখনই পর্যাপ্ত হত না, উদ্বৃত্তের (নিজের ভাগের পরও বাড়তি) কথা তো উঠতেই পারে না। বেঁচে থাকার মতো খাদ্য সংগ্রহ করতে সবাইকে সারাদিন ব্যস্ত থাকতে হত।

অতএব, 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের মূল ভিত্তি হল উৎপাদনের উপাদানগুলির (ধারালো পাথরের অস্ত্র, তীর-ধনুক ইত্যাদি—লেখক) মালিক গোটা সমাজ। এটা মূলতঃ সেই আমলের উৎপাদন শক্তির চরিত্রের সঙ্গে সুসঙ্গত ছিল। পাথরের হাতিয়ার ও পরবর্তীকালে তীর ধনুক নিয়ে একাকী ব্যক্তিগতভাবে প্রাকৃতিক শক্তি ও হিংস্র প্রাণীদের মোকাবেলা করা অসম্ভব ছিল। বন্য ফল সংগ্রহ করতে, মাছ ধরতে যে কোন প্রকার বাসস্থান তৈরি করতে মানুষ একসঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করতে বাধ্য ছিল, যদি না সে অনাহারে মরতে চাইত বা বন্য হিংস্র পশু বা প্রতিবেশী গোষ্ঠির শিকার হতে চাইত। এক সঙ্গে শ্রম করা, উৎপাদনের উপাদানের যৌথ মালিকানা,—এইসব উৎপন্ন দ্রব্যে যৌথ মালিকানাই নির্দেশ করে। উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি তখনও প্রচলিত হয়নি। হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ নিজেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকটি মাত্র হাতিয়ার প্রত্যেকের থাকত। সেখানে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না, ছিল না শোষণ।'[২]

শ্রেণীভেদ না থাকায় শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী-শাসনের কোন প্রশ্নই ছিল না। তাই, ছিল না শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র—রাষ্ট্র। গোষ্ঠিপ্রধান ও নারীদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদাই ছিল সমাজের অনুশাসন। তারাই ছিল গোষ্ঠী-সভ্যদের মধ্যে প্রধান যোগসূত্র। সমাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও উৎপাদনের ধারা চালু রাখার ব্যবস্থাও তারাই করত। উপর থেকে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোন বিশেষ ধরনের লোকের প্রয়োজন ছিল না। আলাদা করে সশস্ত্র পুলিস বা সৈন্যবাহিনী ছিল না। গোষ্ঠীর প্রতিটি সভ্যই ছিল সশস্ত্র, আর এরাই ছিল গণরক্ষী বাহিনী।

আদিম সাম্যবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) উৎপাদন শক্তি অনুন্নত ধরনের। হাতিয়ারগুলি প্রধানতঃ পাথর ও কাঠের তৈরি।

(২) উৎপাদন সম্পর্ক হল,—উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক গোটা সমাজ। সমস্ত সভ্য একসঙ্গে কাজ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য একসঙ্গে ভোগ করে।

(৩) শ্রেণীভেদ ছিল না, ছিল না শ্রেণী-শোষণ।

(৪) পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন পার্থক্য ছিল না, ছিল না পুরুষ কর্তৃক নারীকে শোষণ।

(৫) শ্রেণীভেদ না থাকায় শ্রেণী-আধিপত্য বজায় রাখার প্রশ্ন ছিল না। তাই ছিল না রাষ্ট্র অর্থাৎ শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র। প্রতিটি গোষ্ঠীসভা ছিল সশস্ত্র গণরক্ষী।

দাস সমাজ ব্যবস্থা :

আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যযুগ পর্যন্ত সব দেশের মানুষই বিকাশের প্রায় একই স্তরে ছিল। তারা সবাই ফলমূল সংগ্রহ ও শিকার করেই জীবন যাপন করত। কিন্তু সব জায়গায় মানুষ এই স্তরে পড়ে থাকেনি। এশিয়াতে তারা এমন সব পশু পেয়ে গেল যাদের পোষ মানানো যায় এবং গৃহপালিত অবস্থায় তাদের থেকে পশু শাবক পাওয়া যায়। তাই, "বন্য পশু পোষ মানানো এবং পরে গবাদি পশু প্রজনন ও প্রতিপালন —এইগুলি আর্য, সেমেটিক ও সম্ভবতঃ তুরানীদের মূল পেশা হয়ে দাঁড়াল। পশুপালক উপজাতিগুলি সাধারণ বর্বরদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ল। এটিই হচ্ছে **প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রম বিভাগ**।"

পশুপালন শুরু হওয়ায় মাংসের যোগান যেমন নিয়মিত হল, তেমনি উপরি হিসাবে পাওয়া গেল দুধ। পরে দুধ থেকে তৈরি হতে লাগল নানা প্রকারের দুগ্ধজাত দ্রব্য। আর পাওয়া গেল পশুর চামড়া ও লোম। তা দিয়ে তৈরি হতে লাগল কাপড় ও পোশাক আর তাঁবু। পাথরের পাত্র ও ইট তৈরি হতে লাগল। পরে যখন ধাতু আবিষ্কৃত হল, তখন ধাতুর পাত্র ও ধাতুনির্মিত অস্ত্র ও যন্ত্র তৈরি হল।

পশুপালক উপজাতিগুলি নিজেদের প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জিনিস তৈরি করতে লাগল। আর তারা বিভিন্ন প্রকারের জিনিসও তৈরি করত। নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর পরও তাদের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থাৎ, বাড়তি জিনিস থাকত। অথচ, অন্যান্য স্থানে মানুষ তখনও শুধুই শিকার নিয়ে ছিল। তাই, "আমরা দেখতে পাই, পশুপালক উপজাতি ও পশুপালনহীন অনুন্নত উপজাতিগুলির মধ্যে শ্রম-বিভাগ। ফলে দু'টি ভিন্ন স্তরের উৎপাদন ব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে থাকে।"[৩]

শিকারী উপজাতিগুলি পশুপালক উপজাতিগুলির নিকট থেকে তাদের উদ্বৃত্ত জিনিস সংগ্রহ করত। পরিবর্তে শিকারীরা দিত মাংস, পশুর কাঁচা চামড়া, জ্যান্ত পশু-শাবক ইত্যাদি। এই পদ্ধতিকে বলা হয় বিনিময় অর্থাৎ, একপ্রকার জিনিসের বদলে অন্য প্রকার জিনিস সংগ্রহ করা। প্রথম দিকে এই বিনিময় কিন্তু ছিল খুব অনিয়মিত। যখন বিনিময় হত, তখন তা হত গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এবং গোষ্ঠী-প্রধানদের মারফত। কারণ, তখন পর্যন্ত শিকারের অস্ত্রশস্ত্র ও পশুপালগুলি প্রতিটি গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি ছিল।

"গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পত্তি থেকে পশুদলগুলি কখন ও কিভাবে প্রতিটি পরিবারের কর্তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত তা আমাদের জানা নেই। কিন্তু, তা প্রধানত দুই স্তরেই হয়েছিল। পশুদল ও অন্যান্য নতুন নতুন সম্পদের অধিকার পরিবারগুলিতে এক বিপ্লবের সূচনা করল।"[৪] গোষ্ঠীর সাধারণ সম্পদ প্রতিটি পরিবারের আলাদা আলাদা সম্পদে পরিণত হওয়ায় বিনিময়ের ধারায় পরিবর্তন দেখা দিল। এখন প্রতিটি পরিবারের মালিকই ব্যক্তিগতভাবে বিনিময় করে। ক্রমে ব্যক্তিগত বিনিময়ই প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়াল।

এই সময়ে পশু-খাদ্যের জন্য শস্যের চাষ সুরু হয়। আর অবিলম্বেই সেই শস্যকণা মানুষের খাদ্য হয়ে ওঠে। সুরু হয় নিয়মিত চাষবাস। ইতোমধ্যে তামা, পিতল, সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতুর আবিষ্কারের ফলে ধাতুনির্মিত যন্ত্র ও অস্ত্রের ব্যবহার সুরু হয়। নানা প্রকার অলঙ্কারের ব্যবহারও এই সময়ই সুরু হয়েছিল। মানুষ এখন প্রকৃতির অনেক বস্তু ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে। উৎপাদনের বিভিন্ন কৌশলও সে আবিষ্কার করেছে তাই উৎপাদন শক্তির এখন বেশ কিছুটা বিকাশ ঘটেছে। ফলে উৎপাদনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

"পশুপালন, কৃষি ও গার্হস্থ্যশিল্প প্রভৃতি উৎপাদনের সমস্ত শাখায় উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মানুষের শ্রমশক্তি তার অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনের চেয়ে বেশী উৎপাদন করতে লাগল। আবার, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গোষ্ঠী, গোত্র বা একক পরিবারের প্রতিটি সভ্যের দৈনিক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল, ফলে আরো অধিক শ্রমশক্তির প্রয়োজন দেখা দিল।"[৫]

মানুষ খুঁজতে লাগল এমন লোক যাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে পরের জন্য কাজ করার লোক সেই আমলে পাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ গোষ্ঠীতে প্রতিটি সভ্যের সামাজিক মর্যাদা ছিল সমান। উৎপাদন ক্ষেত্রে তাদের সম্পর্ক ছিল—একসঙ্গে শ্রম করা ও একসঙ্গে উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ

করা। পরের জন্য কাজ করার কথা তারা ভাবতেও পারত না। সুতরাং, সেই যুগের উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ, সাম্যবাদী সমাজের সম-মর্যাদার উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াল। এই উৎপাদন সম্পর্ক পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রয়োজন হল এমন এক শ্রেণীর লোকের যারা খাওয়া থাকার পরিবর্তে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকদের জন্য শ্রম করবে, অথচ সমান অধিকার দাবী করবে না।

খুব সহজেই একটা উপায় বেরিয়ে গেল। খাদ্যাঞ্চল ও শিকারভূমির অধিকার নিয়ে প্রতিবেশী গোষ্ঠীদের মধ্যে কখনও কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহ হত। পূর্বে এই সব যুদ্ধের বন্দীদের হয় বিনিময় করা হত, নয়ত মেরে ফেলা হত, নয়ত তাড়িয়ে দেওয়া হত। কারণ, শত্রুগোষ্ঠীর কতকগুলি লোককে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ানোর কথা উঠতে পারে না। অথচ, সেই সময়ে উৎপাদন ব্যবস্থা এমন স্তরে ছিল না যে, যুদ্ধবন্দীদের সার্থকভাবে কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। এখন কিন্তু তার সুযোগ হয়েছে। তাই, এখন যুদ্ধবন্দীদের আর মেরে ফেলা হয় না। তাদের নিযুক্ত করা হয় বিজেতাদের জন্য উৎপাদনের কাজে। সুরু হয় ক্রীতদাস প্রথা।

এই "সাধারণ ঐতিহাসিক অবস্থায় প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রম-বিভাগ শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়িয়ে তুলল অর্থাৎ, সম্পদ বৃদ্ধি করল। আর সেই সঙ্গে উৎপাদনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে অনিবার্যভাবে দাসপ্রথাকে তার পিছু পিছু টেনে নিয়ে এল। এই প্রথম বিরাট সামাজিক শ্রম-বিভাগ থেকেই সূচনা হল প্রথম বিরাট সমাজ-বিভাগ। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল দু'টি শ্রেণীতে,—দাস-মালিক ও ক্রীতদাস—শোষক ও শোষিত।"৬

প্রায় এই সময়ে লোহার আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথম দিকে উৎপন্ন লোহা অবশ্য প্রচলিত অন্যান্য ধাতুগুলির চেয়ে বেশী শক্ত ছিল না। কিন্তু, পরে নানা প্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্যে শক্ত লোহা পাওয়া গেল। লোহার লাঙল, কোদাল. কুড়োল ইত্যাদির সাহায্যে বিস্তৃত বনাঞ্চল চাষের উপযুক্ত করা সম্ভব হল। হস্তশিল্পে লোহার ব্যবহার উৎপাদনের নানা নতুন নতুন দিক্ খুলে দিল। সেই সঙ্গে কৃষিতে নানা প্রকার শস্য ও ফলের চাষ সুরু হয়। সব মিলিয়ে উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রমশক্তি প্রয়োগ করার নতুন নতুন সুযোগ দেখা দিল।

কিন্তু এক একটি লোকের পক্ষে উৎপাদনের এতসব শাখার সব কয়টিতে নজর দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই আবার একটা শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন দেখা দিল। এবার কৃষি ও হস্তশিল্প আলাদা হয়ে গেল। কিছু লোক কৃষিকার্য নিয়ে রইল;

আর কিছু লোক দায়িত্ব নিল সমাজের প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য যোগান দেওয়ার কাজ। এইটাই হল দ্বিতীয় বিরাট সামাজিক শ্রম-বিভাগ।

"উৎপাদন ব্যবস্থা কৃষি ও হস্তশিল্প এই দু'টি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ায় বিনিময়ের জন্য উৎপাদন, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন (উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ উৎপাদনকারী নিজে ভোগ না করে অন্য জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করে তাকে বলে 'পণ্য'—লেখক) সুরু হল। এর সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যবসা বাণিজ্য—আর তা শুধু নিজেদের দেশে এবং গোষ্ঠীর সীমানার মধ্যেই নয়, বিদেশেও। অবশ্য এসবই তখন ছিল অপবিণত অবস্থায়।"৭

এতদিন দাস-ব্যবস্থা তার শৈশব অবস্থায় ছিল বলা যায়। উৎপাদনের কাজে ক্রীতদাস মূলতঃ ছিল সাহায্যকারী। এইবার ক্রীতদাসকে সার্থকভাবে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করা গেল। তাদের দল বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় দাস-মালিকের চাষের খামারে বা কর্মশালায়। সেখানে তারা সারাদিন ধরে তাদের মালিকের জন্য উৎপাদন করে।

উৎপাদন শক্তি এখন অনেক উন্নত হয়েছে। ক্রীতদাস খাটিয়ে ব্যক্তিগত মালিকদের সম্পত্তি ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে এইজন্য যে, একটি ক্রীতদাস যা খায় তার চেয়ে অনেক বেশী উৎপাদন তার কাছ থেকে আদায় করা যায়। সুতরাং যে দাস-মালিক কয়েকটি ক্রীতদাস খাটাতে পারে তার নিজেকে আর শ্রম না করলেও চলে। এই অবস্থা থেকেই সৃষ্টি হল পরশ্রম-ভোগী বিলাসী শ্রেণী—দাস-মালিক। সৃষ্টি হল শোষক শ্রেণী; সুরু হল শ্রেণী শোষণ।

"দাস-সমাজ ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি ছিল,—দাস মালিক উৎপাদনের সমস্ত উৎপাদনের মালিক এমনকি উৎপাদনকারী, অর্থাৎ ক্রীতদাসেরও মালিক। এই ক্রীতদাসকে সে কিনতে পারে, বেচতে পারে, এমনকি পশুর মতো হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। এইরূপ উৎপাদন সম্পর্ক সে যুগের উৎপাদন শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। পাথরের হাতিয়ারের পরিবর্তে এখন ধাতুনির্মিত হাতিয়ার হয়েছে। পশুপালন ও চাষবাসে অনভিজ্ঞ শিকারী মানুষের নগণ্য ও আদিম গৃহস্থালীর পরিবর্তে প্রচলিত হয়েছে পশুপালন, চাষবাস ও হস্তশিল্প। আবার, এইসব উৎপাদন ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছে শ্রম-বিভাগ; বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময় এবং তার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ সঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। উৎপাদন কাজে সমাজের সব সভ্যকে একযোগে ও স্বাধীনভাবে কাজ করতে এই যুগে আর দেখা যায় না। কর্মবিমুখ দাস-মালিক কর্তৃক শোষিত ক্রীতদাসদের দিয়ে জোর করে কাজ করিয়ে নেওয়া"

ঐ সময়ে প্রচলিত ছিল। সুতরাং, এখানে উৎপাদনের উপাদান ও উৎপন্ন দ্রব্যের উপর আর যৌথ মালিকানা নেই। ব্যক্তিগত মালিকানা তার স্থান দখল করেছে। দাস-মালিকই প্রকৃত অর্থে প্রথম ও প্রধান সম্পত্তিবান।"

"ধনী ও দরিদ্র, শোষক ও শোষিত, সম্পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন ও অধিকারহীন এবং তাদের মধ্যে কঠিন শ্রেণীদ্বন্দ্ব—এই হল দাস-ব্যবস্থার চিত্র।"৮

ব্যক্তিগত সম্পদের রীতি চালু হওয়ায়, ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা দিল। কিছু কিছু লোক ছলে, বলে, কৌশলে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করতে লাগল। তারা হয়ে উঠল বিপুল সম্পদের অধিকারী। আবার এই বিপুল সম্পদের উপর অধিকারের দৌলতে তারা আরো বেশী বেশী সম্পদ দখল করার সুযোগ পেল।

পশুপালনের যুগে পরিবারগুলির সম্পদের হিসাব করা হত পশুর সংখ্যা দিয়ে। এর উদাহরণ আমাদের মহাভারতেও রয়েছে। বিরাট রাজা গো ধনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু, এখন ক্রীতদাসের সংখ্যা দিয়ে ব্যক্তিগত সম্পদের হিসাব করা হতে লাগল। যার যত বেশী ক্রীতদাস আছে, সে তত বেশী সম্পদশালী। বড় বড় দাস-মালিকদের ক্রীতদাসদল ক্রমে ক্রীতদাস-বাহিনীতে পরিণত হতে লাগল।

দাস-মালিকদের কাছে ক্রীতদাস গরু-বাছুরের মতোই একটি পণ্য। গবাদি পশুর সঙ্গে তাদের বিনিময় করা হয়। নৃশংসতম ব্যবস্থা ছিল এই যে,—মালিক ইচ্ছামতো ক্রীতদাসকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। তারা মালিকের খামারে বা কর্মশালায় উদয়াস্ত খাটতে বাধ্য ছিল। অনেক সময় ভারবাহী পশুর পরিবর্তে ক্রীতদাসদের দিয়ে লাঙল টানানো হত, বোঝা বহানো হত। প্রতিদানে তারা পেত দিনান্তে একপেট খাবার। তাও আবার সাধারণতই হত মানুষের খাওয়ার অযোগ্য।

বিশাল বিশাল দাস-বাহিনী পরিচালনার জন্য থাকত সশস্ত্র পাইক, বরকন্দাজ। তারা প্রতিদিন ভোরবেলায় ক্রীতদাসদের লাইন দিয়ে নিয়ে যেত কাজের জায়গায়। কয়েদীদের মতো দড়ি দিয়ে পরস্পর জুড়ে দেওয়ার রীতিও ছিল; যেন তারা না পালিয়ে যেতে পারে। তাদের কাজ করতে হত কঠিন পরিশ্রমের। যেমন, মাটি কোপানো, লাঙল ঠেলা বা টানা, পাথর ভাঙা, পাথর বহা, জল তোলা ইত্যাদি। বিশ্রামের কোন সুযোগ ছিল না। পরিশ্রান্ত হয়ে ঢলে পড়লে পাইকের বেতের ডগায় উঠে আসত তাদের পিঠের চামড়া। তবু কাজ থেকে রেহাই পেত না তারা।

এই অমানুষিক অত্যাচার থেকে পালিয়ে গিয়েও ক্রীতদাসদের মুক্তি ছিল না;

তাদের প্রত্যেকের গলায় ঝুলত তাদের মালিকদের নাম লেখা ফলক। পাইক বরকন্দাজরা তাই দেখে তাদের মালিকদের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যেত। পালিয়ে যাওয়ার জন্য তখন কঠিনতর শাস্তি তাদের ভোগ করতে হত। একমাত্র মৃত্যুই তাদের এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি দিতে পারত। আর তাদের এই রক্তঝরা শ্রমে উৎপন্ন সমস্ত সম্পদই ভোগ করত দাস-মালিকরা।

স্বভাবতই ক্রীতদাসরা এইসব অত্যাচার সব সময় নীরবে সহ্য করেনি। অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সময় সময় তারা পালিয়ে যেত। কখনও কখনও তারা এর বিরুদ্ধে একা বা মিলিতভাবে প্রতিবাদ করেছে। সময় সময় সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছে। তাই সংখ্যালঘু দাস-মালিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। কারণ, সমাজ এখন এমন এক শ্রেণীদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে যা মিটমাট করা তার পক্ষে অসম্ভব। এমনি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় সমাজের প্রয়োজনে সমাজের মধ্য থেকেই রাষ্ট্রশক্তির জন্ম হয়। শ্রেণীদ্বন্দ্বকে শৃঙ্খলার মধ্যে রেখে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থা বজায় রাখাই ছিল এই রাষ্ট্রের কাজ। আর শ্রেণীদ্বন্দ্ব থেকেই এর জন্ম হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর অর্থাৎ দাস-মালিকদের স্বার্থরক্ষার যন্ত্র হিসাবে তা ব্যবহার হতে লাগল। শোষকশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে রেখে তাদের শোষণ ও শাসন চালায়। ক্রমে ক্রমে রাষ্ট্র গড়ে তোলে শোষিত শ্রেণীকে দমন ও নির্যাতন করার বিভিন্ন অস্ত্র।

সমাজের শ্রেণীভেদ ও শোষণের প্রভাব পড়ল প্রতিটি পরিবারের উপর। "বন্য যোদ্ধা ও শিকারী পুরুষ গৃহে নারীর প্রাধান্য মেনে নিয়ে সেখানে দ্বিতীয় স্থান দখল করেই সন্তুষ্ট থাকত। 'নম্রতর স্বভাবের' পশুপালক সম্পদের অধিকারের স্পর্ধায় নিজেই প্রথম স্থান দখল করে নিল। নারীকে ঠেলে দিল দ্বিতীয় স্থানে; কিন্তু, নারী প্রতিবাদ করতে পারেনি। আগে পরিবারের মধ্যে শ্রম-বিভাগ দিয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে সম্পদের অংশ স্থির হত। সেই শ্রম-বিভাগ ঠিকই রয়ে গেল; অথচ, পরিবারের বাইরের শ্রম-বিভাগের পরিবর্তন পারিবারিক সম্পর্ককে ওলটপালট করে দিল।"[৭] সুরু হল নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্যের যুগ।

দাস সমাজ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ল—দাস-মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত। সুরু হল শ্রেণী-শোষণ, দেখা দিল শ্রেণী দ্বন্দ্ব।

(২) এই ব্যবস্থাতেই সর্বপ্রথম পরশ্রমভোগী বিলাসী কর্মবিমুখ শোষক-শ্রেণীর জন্ম হয়। সেই শ্রেণী হল দাস-মালিক।

(৩) উৎপাদনের উপাদানগুলি এমনকি উৎপাদনকারী ক্রীতদাসেরও মালিক হল দাস-মালিক। সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যও দাস-মালিকের অধিকারে।

(৪) এই ব্যবস্থাতেই শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী-শোষণ বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাষ্ট্র তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য সৃষ্টি করে একশ্রেণীর সশস্ত্র বাহিনী।

(৫) নারী ও পুরুষদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্য দেখা দেয়। সুরু হয় নারীর উপর পুরুষের আধিপত্য।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ :

দাস-ব্যবস্থার শেষের দিকে "নতুন শ্রম-বিভাগের ফলে সমাজে এক নতুন শ্রেণীভেদ দেখা দিল—মুক্ত-মানুষ ও ক্রীতদাসের বিভেদের সঙ্গে এখন ধনী ও দরিদ্রের বিভেদ এসে যুক্ত হল। বিভিন্ন পরিবারের কর্তাদের মধ্যে সম্পদের তারতম্যের ফলে আদিম যৌথ-ব্যবস্থার যে অবশেষ এখন পর্যন্ত কোথাও কোথাও বজায় ছিল তাও ভেঙে পড়ল। আর তার ফলে সমাজের জন্য যৌথভাবে ভূমি-চাষের রীতির অবসান হল। প্রথমদিকে কয়েকটি করে পরিবারকে চাষযোগ্য জমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য দেওয়া হত। পরে তা বরাবরের জন্য দেওয়া হতে লাগল। জোড় বাঁধা পরিবার থেকে একপতি-পত্নীত্বের পরিবারে রূপান্তরের পাশাপাশি ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি প্রতিষ্ঠিত হল। আর, এক একটি পরিবার সমাজের অর্থনৈতিক এককে পরিণত হল।"[১০]

আমরা আগেই দেখেছি যে লোহার আবিষ্কার এবং কৃষি ও হস্তশিল্পে তার ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে উৎপাদন শক্তির প্রভূত বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। ইতোমধ্যে কৃষি ও হস্তশিল্পের মধ্যে শ্রম-বিভাগ হয়ে গেছে। কৃষি ও হস্তশিল্পে নতুন নতুন যন্ত্র ও পদ্ধতির প্রচলন হওয়ায় উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশ হতে লাগল। অথচ, দাস-ব্যবস্থার উৎপাদন শক্তির মূল অংশ, অর্থাৎ উৎপাদন শ্রমিক, অর্থাৎ, ক্রীতদাস ছিল অত্যাচারিত ও পরাধীন। তার না ছিল উদ্যোগ, না ছিল কাজে উৎসাহ। তাই, দাস-ব্যবস্থার উৎপাদন সম্পর্কই উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এটি হল সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের চাহিদার অর্থনৈতিক দিক।

কিন্তু, দাস-মালিকগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের তাগিদে দাস-ব্যবস্থার উচ্ছেদের বিরোধী, অর্থাৎ পরিবর্তন বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। তাদের হাতে রয়েছে রাষ্ট্রশক্তি। সেই রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে তারা সমাজ পরিবর্তনের যে কোন প্রগতিশীল প্রচেষ্টাকে দমন করতে চেষ্টা করে। তাই, একমাত্র তাদের হাত

থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিয়েই সমাজ-ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল।

ক্রীতদাস ও দাস-মালিকদের মধ্যকার শ্রেণীদ্বন্দ্ব সেই কাজটির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। আর এই শ্রেণীদ্বন্দ্বই হল সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের চাহিদার রাজনৈতিক দিক। দাস-যুগের ইতিহাস দাসপ্রথার বিরুদ্ধে ক্রীতদাসদের বিরামহীন মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। দাস-মালিকদের বিরুদ্ধে তাদের এই শ্রেণী সংগ্রামে তারা সময় সময় মুক্ত সম্পদহীন শ্রেণীর সহায়তাও পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রায় দু' হাজার বছর পূর্বের স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস-বিদ্রোহের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পার্টাকাস নিজেও একজন ক্রীতদাস ছিলেন। তার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ জয়যুক্ত হয়নি সত্য ; তবে, তা দাসপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত রোম-সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল ; ঘোষণা করেছিল তার মৃত্যুর পরোয়ানা।

সমাজ-ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তন, অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লবের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র তো তৈরী হয়েই ছিল, এইবার এই রাজনৈতিক চাপে দাস-ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে বাধ্য হল। তার জায়গায় গড়ে উঠল সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। ক্রীতদাস মুক্ত হল ; কিন্তু, সমাজে শ্রেণীভেদ রয়েই গেল। তার নতুন রূপ হল,—সামন্ত জমিদার ও ভূমিদাস, শোষক ও শোষিত।

"নতুন উৎপাদন শক্তি দাবি করছিল—শ্রমিককে উৎপাদন ক্ষেত্রে কোন না কোন প্রকারের উদ্যোগ দেখাতেই হবে। আর তার থাকতে হবে কাজের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ। সুতরাং, সামন্ত প্রভুরা ক্রীতদাসদের এই বলে বাতিল করে দেয় যে, তাদের কাজে কোন উৎসাহ নেই ; তারা সম্পূর্ণ উদ্যোগবিহীন। সামন্ত-প্রভুরা ভূমিদাসদের সঙ্গে কারবার করাই বেশী পছন্দ করল। কারণ তাদের ভারবাহী পশু রয়েছে, আর রয়েছে উৎপাদনের যন্ত্রপাতি। সর্বোপরি তাদের রয়েছে জমি চাষ করার উৎসাহ। আর সামন্তপ্রভুদের খাজনা হিসাবে ফসলের অংশ দিতেও তারা ইচ্ছুক।"১১

সুতরাং, উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথ খুলে দিতে দাসপ্রথার উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়ল। গড়ে উঠল নতুন উৎপাদন সম্পর্ক—সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক। ক্রীতদাস দাস-বন্ধন মুক্ত হল, সে পরিণত হল ভূমিদাসে। "সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক ছিল জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভূমিদাসদের মূল চিহ্ন হল,—কৃষকদের (সে যুগে কৃষকই ছিল সংখ্যাধিক, শহরের লোক ছিল খুবই কম) মাটির সঙ্গে বাঁধা বলে মনে করা হত,—ভূমিদাসদের ঘরবাড়ী এখানেই এবং সেখানেই। সামন্তপ্রভু কৃষককে যে জমি দিত সেখানে সে নিজের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকদিন কাজ

করতে পারত। বাকী দিনগুলি কৃষক ভূমিদাসকে খাটতে হত তার মালিকের জন্য।"[১২] উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশে তার অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় ভূমিদাস উৎপাদনে উৎসাহ ও উদ্যোগ দেখাতে লাগল। উৎপাদন শক্তির নব নব বিকাশের সূচনা হল।

"সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হল—সামন্তপ্রভু উৎপাদনের উপাদানের মালিক; কিন্তু, উৎপাদন শ্রমিক অর্থাৎ ভূমিদাসের সম্পূর্ণ মালিক সে নয়। ভূমিদাসকে সে কিনতে পারে, বেচতে পারে, কিন্তু সে তাকে আর হত্যা করতে পারে না। সামন্ত মালিকানার পাশাপাশি রয়েছে চাষী ও হস্তশিল্পীদের ব্যক্তিগত মালিকানা। তাদের সম্পত্তি হল—উৎপাদনের জন্য তাদের নিজস্ব যন্ত্রপাতি এবং ব্যক্তিগত শ্রমের উপর নির্ভরশীল তাদের নিজের কর্মশালা। ঐ আমলের উৎপাদন শক্তির প্রকৃতির সঙ্গে এইরূপ উৎপাদন সম্পর্ক মূলতঃ সঙ্গতিপূর্ণ ছিল।"[১৩]

এই ব্যবস্থায় সমাজের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ, অর্থাৎ সামন্তপ্রভুদের হাতে উৎপাদনের মূল উপাদান, অর্থাৎ জমি কেন্দ্রীভূত ছিল। তাই, সমাজের বৃহত্তম অংশকেই শোষণের মধ্যে বাস করতে হত। "এখানে ব্যক্তিগত মালিকানা আরো বিকাশ লাভ করেছে। শোষণ প্রায় দাস প্রথার মতোই রয়ে গেছে,—সামান্য একটু লঘু হয়েছে মাত্র। শোষক ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব—এইটাই হল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য।"[১৪]

সামন্তপ্রভুদের জমিতে বেগার খাটা ছাড়াও ভূমিদাসকে যখন তখন তাদের হুকুম তামিল করতে হত। সামন্তপ্রথার আওতায় হস্তশিল্পীগণও সামন্তপ্রভুদের হুকুমমতো তাদের বিলাস সামগ্রী তৈরি করে দিতে বাধ্য ছিল। তাদের হুকুম না মানলে বা তাদের পাওনা-গণ্ডা সময়মতো না দিতে পারলে ভূমিদাসকে দৈহিক অত্যাচার পর্যন্ত সইতে হত, এমনকি কয়েদ পর্যন্ত ভোগ করতে হত। "শ্রেণী বিভক্ত সমাজের সার বস্তুটি রয়েই গেল,—তা হল শ্রেণী-শোষণ।"[১৫]

সামন্তপ্রথার প্রথম দিকে শোষণের মাত্রা সহ্যের সীমার মধ্যে থাকলেও ক্রমেই তা বাড়তে লাগল। বণিকশ্রেণী দেশ-বিদেশ থেকে নিয়ে এল নানা প্রকারের বিলাস সামগ্রী। সামন্তপ্রভুরা তা ভোগ করতে লাগল। কিন্তু, বিলাস সামগ্রী পেতে হলে অর্থের প্রয়োজন। তাই, অতিরিক্ত অর্থের জন্য সামন্তপ্রভুরা সামন্ত-শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। প্রথম দিকে ভূমিদাস তাদের খাস জমিতে বেগার খেটেই রেহাই পেত। বন্যা-খরা হলে সামন্তপ্রভু ভূমিদাসকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিত। পরে এল ফসলের নির্দিষ্ট অংশে খাজনা দেওয়ার রীতি। ফলে বন্যা-খরার দায়িত্বের

কিছুটা পড়ল ভূমিদাসের ঘাড়ে। সর্বশেষে সামন্তপ্রভুরা যখন গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে আস্তানা গাড়তে সুরু করল, তখন প্রচলিত হতে লাগল মুদ্রায় খাজনা দেওয়ার রীতি। উৎপাদনের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সমস্ত দায়িত্বটা গিয়ে পড়ল ভূমিদাসের ঘাড়ে।

"জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিকাশের পাশে পাশেই মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাই, এখন জমি হল এমন একটি পণ্য যাকে বিক্রি করা যায়, বাঁধা দেওয়া যায়। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার রীতি পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধক দেওয়ার রীতি আবিষ্কৃত হল (এথেন্সের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য)"।[১৬]

"বিনিময়ের বিস্তার, মুদ্রার ব্যবহার, সুদে অর্থ ধার দেওয়ার রীতি, সম্পদ হিসাবে জমি ও জমি বন্ধকী কারবারের সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে সম্পদ দ্রুত অল্পসংখ্যক লোকের হাতে জমতে ও কেন্দ্রীভূত হতে লাগল; অপর দিকে সম্পদহীন লোকের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল।"[১৭]

ব্যক্তিগত মালিকানার আরো বিকাশ ও সেই সঙ্গে উত্তরাধিকার রীতির প্রবর্তনের ফলে নারীর স্বাধীনতা আরো খর্ব হল। সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর মাতাকে হতে হবে সন্দেহের অতীত—এই ধারণা থেকে নারীকে তার সমস্ত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হল। "গৃহে প্রকৃত প্রাধান্য লাভই পুরুষের স্বৈরাচারের পথের শেষ প্রতিবন্ধক ভেঙে ফেলে। তার স্বৈরাচারের অধিকার সুদৃঢ় ও চিরস্থায়ী হয় মাতৃ-অধিকারের পতন ও পিতৃ-অধিকারের প্রবর্তনের ফলে, আর সেই সঙ্গে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে একপতি-পত্নীত্বের পরিবারে ক্রমবিকাশের ফলে।"[১৮] সম্পদমদে মত্ত পুরুষ নারীকে তার ন্যায্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করল। "জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধকীপ্রথা তেমনি ভাবে দৃঢ় হয়েছিল, যেমন ভাবে একপতি-পত্নীত্ব প্রথার পিছে পিছে এসেছিল হেটায়ারিজম ও বেশ্যাবৃত্তি।"[১৯]

শ্রেণী-বিভক্ত দাস সমাজে শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-শাসনের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। সামন্তপ্রভুরা সেই রাষ্ট্রকে দখল করেই দাস-ব্যবস্থার উচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিল। কিন্তু, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজ সেই শ্রেণীবিভক্তই রয়ে গেছে। সুতরাং, শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-শাসন বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রও রয়ে গেছে। এইটুকু মাত্র পরিবর্তন হয়েছে—রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব চলে গেছে দাস মালিকদের হাত থেকে সামন্তপ্রভুদের হাতে। রাষ্ট্রের গড়ন ও তার বিভিন্ন অংশের কিছুটা অদল-বদল হলেও শ্রেণীস্বার্থ রক্ষার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের মূলনীতি অপরিবর্তিতই রয়ে গেল। উপরন্তু রাষ্ট্রের নির্যাতনের যন্ত্রগুলি আরো শক্তিশালী করা হল।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) এই ব্যবস্থায় শ্রেণীভেদ রয়ে গেছে, শুধু তার রূপ পালটেছে মাত্র। এখানে সামন্ত-প্রভু শোষক আর ভূমিদাস শোষিত। শ্রেণীভেদ বজায় থাকায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব বর্তমান।

(২) সামন্তপ্রভুরা হল পরশ্রমভোগী বিলাসী শোষক।

(৩) উৎপাদনের উপাদানগুলি সামন্তপ্রভুদের দখলে। কিন্তু, ভূমিদাস আর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।

(৪) ভূমিদাসদের উপর সামন্ত প্রভুদের আধিপত্য বজায় রাখা ও শোষণ কায়েম রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র বর্তমান।

(৫) নারীর স্বাধীনতা আরো খর্ব করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজ :

সামন্তপ্রথার গোড়ার দিকে "প্রায় সমস্ত ধন-সম্পদই ছোট ছোট মালিকরা তৈরী করত। আর এরাই ছিল জনসংখ্যার সবচেয়ে বড় অংশ। লোকজন স্থায়ীভাবে গ্রামেই বাস করত। তারা যে সব জিনিসপত্র তৈরি করত তার অধিকাংশই নিজেরা ব্যবহার করত, নয়ত আশেপাশের গ্রামের হাটে বিক্রয় করত ; গ্রামের হাটগুলির বাইরের বাজারের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্বন্ধ ছিল না। এরা সামন্তপ্রভুদের জন্য জিনিসপত্র তৈরি করত। আবার সামন্তপ্রভুরা জোর করে এদের দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করিয়ে নিত। নানা প্রকার জিনিস তৈরি করার জন্য ঘরের তৈরী কাঁচামাল কারিগরদের দেওয়া হত। এই কারিগরগণ গ্রামেই বাস করত। সময় সময় তারা আশেপাশের গ্রামে গিয়েও কাজ করত।"২০

কৃষি ও হস্তশিল্প আগেই বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এইবার গ্রামের পাশে পাশে গড়ে উঠতে লাগল শহর। আর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে উঠতে লাগল বিভিন্ন শ্রেণীর ক্রমপর্যায়—একদিকে সামন্তপ্রভু, জোতদার, তালুকদার, ভূমিদাস ইত্যাদি, অন্যদিকে গিল্ডমাস্টার, জার্নীম্যান, শিক্ষানবিশ ইত্যাদি। আবার এই সব শ্রেণীর নানা উপশ্রেণীরও উদ্ভব হল।

হস্তশিল্পে তৈরী হতে লাগল নিত্য নতুন জিনিস। কারিগরগণ ব্যবহার করতে লাগল নতুন নতুন যন্ত্র, প্রয়োগ করতে লাগল নতুন নতুন পদ্ধতি। কৃষিতে সুরু হল বিভিন্ন প্রকারে ফসলের চাষ। সব মিলিয়ে উৎপাদন শক্তির বিকাশ হতে লাগল দ্রুততালে। সেই সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়তে লাগল।

কৃষি ও হস্তশিল্প আলাদা হয়ে যাওয়ায় বিনিময় এখন একটি প্রয়োজনীয় এবং সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা হস্তশিল্পের কাজে কাজ করে তারা তাদের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী বিনিময় করে তবে চাষীর কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য পেতে পারে।

বিনিময়ের পরিধিও ক্রমেই বাড়তে লাগল। গ্রামের হাটের চাহিদার সঙ্গে শহরের হাটের চাহিদাও যোগ হল। আবার ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হল বিদেশের হাটের চাহিদা। ব্যবসা-বাণিজ্য স্বরু হওয়ার পর থেকেই একটি নতুন শ্রেণী সৃষ্টি হতে থাকে। তাদের বলা হয় বণিকশ্রেণী। প্রথম দিকে তারা মাঝে মাঝে গ্রামের উৎপন্ন জিনিস নিয়ে গিয়ে শহরে বা বিদেশে সওদা করত। এখন এই ব্যবস্থা আরো নিয়মিত ও সাধারণ রূপ নিল। ক্রমে শ্রেণী হিসাবে বণিকশ্রেণী সমাজে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে লাগল। এইটাই হল **বিরাট সামাজিক শ্রম-বিভাগ।**

এই বণিকশ্রেণী না ছিল উৎপাদনকারী, না ভোগকারী। তাদের কাজ ছিল উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে জিনিসপত্রের দালালি করা। উৎপাদনকারীর কাছ থেকে তারা কম দামে জিনিস কিনে নিত, আর ভোগকারীর কাছ থেকে আদায় করত চড়া দাম। এমনি করে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়কে ঠকিয়ে তারা জড়ো করতে লাগল অর্থসম্পদ। ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও চড়া স্বদে টাকা ধার দিয়ে এরা তাদের অর্থসম্পদ বাড়াতে লাগল। এই শ্রেণীই হল উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্বস্বরী। বণিকদের বলা হত 'বারগার্স'। তা থেকেই বুর্জোয়া নামের উৎপত্তি।

এই আমলেই নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হল। স্বরু হল সেইসব দেশের সম্পদ লুট। এই লুটের কারবারে বণিকশ্রেণীই সবচেয়ে বেশী লাভবান হয়। তারা জড়ো করে প্রচুর ধন-সম্পদ। এইসব দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য স্বরু হওয়ায় বিনিময়যোগ্য পণ্যের চাহিদাও বাড়তে লাগল। বণিকশ্রেণীর হাতে রয়েছে পর্যাপ্ত অর্থ-সম্পদ। তারা চাষী ও হস্তশিল্পীদের সেই টাকা দাদন দিয়ে উৎপাদনে উৎসাহ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করে। কিন্তু, সামন্তপ্রথায় হস্তশিল্প ও গার্হস্থ্যশিল্পের পক্ষে এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানো আর সম্ভব হচ্ছিল না। তাই, প্রয়োজন দেখা দেয় উন্নততর উৎপাদন ব্যবস্থার, যাতে কম সময়ে অধিক পণ্য উৎপন্ন হতে পারে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

কিন্তু কেবল মাত্র পুঁজি থাকলেই পুঁজিবাদী উৎপাদন হতে পারে না। "পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য দু'টি ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত প্রয়োজন,—প্রথমতঃ, কিছু ব্যক্তি বিশেষের হাতে বেশ কিছু অর্থ-সম্পদ জমতে হবে, এবং তা জমতে হবে এমন এক সময়ে যখন সাধারণভাবে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের এক উচ্চ স্তরে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, এমন এক শ্রমিকশ্রেণী থাকতে হবে যারা দু'টি অর্থে স্বাধীন,—শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করার ব্যাপারে সমস্ত বাধানিষেধ থেকে

মুক্ত ; আবার, সে জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মালিকানা থেকে মুক্ত, অর্থাৎ সে একজন স্বাধীন ও নিরাসক্ত শ্রমিক—একজন সর্বহারা ; এবং সে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় না করলে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।"[২১]

এই ঐতিহাসিক পূর্বশর্তের প্রথমটি প্রায় তৈরী—বণিকশ্রেণীর হাতে প্রচুর অর্থ-সম্পদ জড়ো হয়েছে, আবার পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাও যথেষ্ট উন্নত স্তরে রয়েছে। কিন্তু সামন্তপ্রথায় ভূমিদাস জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। যতক্ষণ না সে সর্বহারা হয় ততক্ষণ সে জমি আঁকড়ে পড়ে থাকে। তাই, যতক্ষণ সামন্ততান্ত্রিক ভূমিদাস প্রথা বজায় থাকবে ততক্ষণ যথেষ্ট সংখ্যক সর্বহারা শ্রমিক পাওয়া সম্ভব নয়। আবার, সামন্ত-ব্যবস্থার হস্ত ও ক্ষুদ্র শিল্পও পুঁজিবাদের বিকাশের পথে একটি বিরাট বাধা। কারণ, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে গিল্ডপ্রথা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের বাধা সৃষ্টি করে। সর্বোপরি, সামন্ত-প্রভুদের নানা বাধা-নিষেধ ও করভার পুঁজিবাদের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিভিন্ন সামন্তপ্রভুদের এলাকায় বাণিজ্য করতে বিভিন্ন প্রকারের চুঙ্গিকর দিতে হত। এইসব কর দিয়ে স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা পুঁজিপতিদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়ে পড়ত।

তাই, দ্বন্দ্ব সুরু হয় উদীয়মান বুর্জোয়াস্বার্থ ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থে। অন্যভাবে বললে তা দাঁড়ায়—বিকাশমান উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ বেধে যায়। অর্থাৎ একটি সমাজ-বিপ্লবের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এইবার তৈরী।

ইতোমধ্যে বুর্জোয়াদের ক্রিয়াকাণ্ডের ফলে সামন্ত-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত ক্রমেই আলগা হতে সুরু হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে বণিকশ্রেণী নিয়ে এল নানা প্রকারের বিলাস-সামগ্রী, যা ভোগ করতে গিয়ে সামন্তপ্রভুদের বিলাসিতার ব্যয় দিনের পর দিন বাড়তে লাগল। আর এই খরচ জোগাতে হত ভূমিদাস ও সামন্তপ্রজাদের। তাদের উপর সামন্ত শোষণের মাত্রা ক্রমাগতই বাড়তে থাকে। তারা ক্রমেই আরো গরীব হতে থাকে এবং ঋণের দায়ে সুদখোর মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়তে থাকে। এমনি করে একদিন তারা দেখতে পায়, তাদের বাড়ী, জমি সব গিয়ে ঢুকেছে সুদখোর মহাজনের পেটে। আর তারা পরিণত হয়েছে সর্বহারায়।

বণিকশ্রেণী অভাবগ্রস্ত হস্তশিল্পীদের দাদন ও ঋণের দায়ে জড়িয়ে ফেলে। অবশেষে একদিন তাদের কর্মশালাগুলিই দখল করে নেয়। সেখানে নতুন নতুন যন্ত্র বসিয়ে পত্তন করে কারখানা প্রথায় উৎপাদন। সর্বহারা পূর্বতন মালিকরা

এইসব কারখানার মজুরী-শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। এইরূপে চারিদিক থেকে আক্রমণের ফলে গ্রামের ভূমিদাস ও হস্তশিল্পীরা এবং শহরের ক্ষুদ্র শিল্পীরা সর্বহারায় পরিণত হতে থাকে। আর এরাই যোগান দেয় পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মজুরী শ্রমিক। সামন্ত-ব্যবস্থায় ভূমিদাস ও হস্তশিল্পীদের, তথা মেহনতী জনগণের উপর সামন্তপ্রভুদের শোষণ-পীড়নের রূপ আমরা দেখেছি। স্বভাবতই মেহনতী কৃষক ও হস্তশিল্পীরা নির্বিবাদে এই শ্রেণীশোষণ মেনে নেয়নি। প্রতিটি দেশের সামন্ত যুগের ইতিহাসে অসংখ্য কৃষক আন্দোলনের কাহিনীই তার প্রধান সাক্ষ্য। এই আন্দোলন যে সব সময়ই অহিংস থেকেছে তা নয়। সামন্ত প্রভুরা যখনই সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে নৃশংসভাবে গণহত্যা করে এই আন্দোলন দমন করতে চেয়েছে, তখনই কৃষক ও মেহনতী জনগণ নিতান্ত সাধারণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তা প্রতিরোধ করেছে। নানা কারণে তাদের এইসব আন্দোলন সব সময় সার্থক হয়নি এ কথা সত্য। তবু এই দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন শ্রেণীসংগ্রামই সামন্ত প্রথার ভিত দুর্বল করেছে, তৈরী করেছে সমাজবিপ্লবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই বিশেষভাবে জড়িত। তাই, এই যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীই সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী অংশ। সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ ছাড়া এই শ্রেণীর বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না। বুর্জোয়ারা প্রথমে আবেদন নিবেদনের পথ ধরে। কিন্তু, ইতিহাস বলে সশস্ত্র সংঘর্ষ ছাড়া কোন সমাজ-বিপ্লব সম্ভব হয়নি এবং জোর করে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেই সমাজ-ববস্থায় পরিবর্তন আনতে হয়। কারণ, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় শোষক ও শাসকশ্রেণী সব সময়ই নিজস্ব স্বার্থরক্ষার তাগিদে যে কোন পরিবর্তনের বিরোধিতা করে, অর্থাৎ তারা সব সময়ই প্রতিক্রিয়াশীল। আর রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকারে। তারা তাদের স্বার্থরক্ষায় সেই শক্তিকে ব্যবহার করে। তাই সশস্ত্র সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এমনকি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক দায়িত্ব পড়ে তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ, অর্থাৎ বুর্জোয়াদের উপর। তারা তুলে ধরে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার এক প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ। সমাজের তদানীন্তন অবস্থায় এই মতবাদ সমাজের প্রয়োজনীয় দাবীগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। তাই, সামন্ত শোষণে পিষ্ট কৃষক, শ্রমিক-ক্ষুদ্রশিল্পী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী সহজেই এই মতবাদ গ্রহণ করে। তারা সমবেত হয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের পিছনে। আর তখনই তা হয়ে উঠে একটি অপ্রতিহত শক্তি। মুক্তির জন্য সুরু হয় রক্তঝরা

সংগ্রাম ; শ্রমিক-কৃষকের রক্তে ভিজে ওঠে প্রতিটি রণক্ষেত্রের মাটি ; আর তার মুখে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথা ভেঙেও পড়ে। উদ্ভব হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থা।

বুর্জোয়াশ্রেণী কিন্তু তার বিপ্লবের সঙ্গীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা তাকে প্রয়োগ করে বুর্জোয়া-শোষণ কায়েম ও স্থায়ী করার অস্ত্র হিসাবে।

"পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হল—পুঁজিপতি উৎপাদনের উপাদানের মালিক, কিন্তু, উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিক, অর্থাৎ মজুরী-শ্রমিকের মালিক সে নয়। যেহেতু শ্রমিক ব্যক্তিগতভাবে মুক্ত ও স্বাধীন, পুঁজিপতি তাকে হত্যা করতে পারে না, বা বেচতে পারে না। কিন্তু, তারা উৎপাদনের সর্বপ্রকার উপাদান থেকে বঞ্চিত। তাই, অনাহারে মৃত্যু এড়াতে তারা পুঁজিপতিদের নিকট তাদের শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হয় এবং শোষণের জোয়াল মেনে নেয়। পুঁজিপতি-দের সম্পদের পাশাপাশি প্রথম দিকে কৃষক ও হস্তশিল্পীদের উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যক্তিগত সম্পদ ছিল। কারণ এখন এই সকল কৃষক ও হস্তশিল্পী আর ভূমিদাস নয়। আর তাদের এই সম্পদের ভিত্তি হল ব্যক্তিগত শ্রম। হস্তশিল্পীদের ছোট ছোট কর্মশালা ও উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন দেখা দিল বড় বড় যন্ত্রপাতিসহ বিরাট বিরাট মিল ও ফ্যাক্টরী। জমিদারের খাস জমিতে চাষীর আদিকালের হাতিয়ার দিয়ে চাষের পরিবর্তে এখন বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ও চাষের যন্ত্রপাতিসহ বিশাল পুঁজিপতি-খামারের উদ্ভব হল।

"নতুন উৎপাদন শক্তির জন্য প্রয়োজন ছিল নির্যাতিত ও অশিক্ষিত ভূমি-দাসদের চেয়ে অধিকতর শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান শ্রমিক। তাদের যেন যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকে এবং তারা যেন উপযুক্তভাবে তা ব্যবহার করতে জানে। সুতরাং ভূমিদাস প্রথা থেকে মুক্ত এবং যন্ত্রপাতি ঠিকমতো পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট শিক্ষিত মজুরী-শ্রমিকদের সঙ্গে কারবার করতে পুঁজিপতিরা বেশী পছন্দ করে।"[২২]

আইনের চোখে মজুরি-শ্রমিক ক্রীতদাস বা ভূমিদাসের চেয়ে অধিক স্বাধীন। পুঁজিপতি শ্রমিককে বেচতে পারে না, কিনতে পারে না, হত্যাও করতে পারে না। ক্রীতদাস ও ভূমিদাস নিজেরাই পণ্য ছিল। কিন্তু, মজুরী-শ্রমিক নিজে তো পণ্য নয়ই, বরং সে পণ্যের মালিক। তার পণ্য হল তার শ্রমশক্তি। সে তার এই পণ্য পুঁজিপতিকে বেচবে, কি বেচবে না, বেচলেও তা কত দামে বেচবে, তা ঠিক করার স্বাধীনতা তার রয়েছে।

আইনসম্মত এই উজ্জ্বল শর্তটির বাস্তব চিত্রটি কিন্তু খুবই মর্মান্তিক। মজুরী-শ্রমিক সর্বহারা; তার জমি নেই, উৎপাদনের অন্য কোন উপাদানও নেই,

এমন কি মাথা গুঁজবার ঠাঁইটি পর্যন্ত নেই। তার একমাত্র সম্বল হল তার শ্রমশক্তি। আর এর বিনিময়েই সে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় পেতে পারে। অবশ্য, তার শ্রমশক্তি ক্রয় করার মতো পুঁজিপতি যদি সে যোগাড় করতে পারে। তা না হলে অর্থাৎ বেকার অবস্থায় অনাহারে মৃত্যুই তার একমাত্র সম্বল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষমতাশীল পুঁজিপতি কিন্তু মজুরী-শ্রমিকের এই অসহায় অবস্থার সুযোগ চূড়ান্তভাবেই গ্রহণ করে। অন্যায় ও ক্ষতিকর শর্তে কাজ করতে মজুরী-শ্রমিককে তারা বাধ্য করে।

মজুরী-শ্রমিক তার শ্রমশক্তি দিনের কয়েক ঘণ্টা হিসাবে পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করে। আর শ্রমিকের মজুরী ঠিক হয় তার পরিবারের ভরণপোষণের নিম্নতম ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা।

"মজুরী-শ্রমিক জমি কারখানা ও শ্রম-যন্ত্রের মালিকদের নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে। দৈনিক শ্রম-সময়ের এক অংশ শ্রমিক নিজের ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যয় সংগ্রহ করার জন্য ব্যবহার করে। অপর অংশ কোন মজুরী না পেয়েও সে পুঁজিপতিদের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে ব্যয় করতে বাধ্য হয়। উদ্বৃত্ত-মূল্যই হল পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস, পুঁজিপতিদের সম্পদের উৎস।"[২৩]

উদ্বৃত্ত আদায়ের রীতি দাস ও সামন্ত প্রথায়ও ছিল। তখন এই উদ্বৃত্ত আদায় হত দাস-মালিক ও সামন্তপ্রভুর ভোগের জন্য। সুতরাং, ব্যক্তিগত ভোগের পরিমাণ দ্বারা উদ্বৃত্ত আদায়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ থাকত। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় হয় মুদ্রারূপে। আর এই মুদ্রাই আবার পরে পুঁজিরূপে আরও উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের ব্যাপারে পুঁজিপতিশ্রেণীর লোভের শেষ নেই। শ্রমিকশ্রেণীর উপর সীমাহীন শোষণ চালিয়ে আরো বেশী বেশী উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের লালসাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণের বৈশিষ্ট্য। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূলতত্ত্ব হচ্ছে শ্রেণীশোষণ। এখানে পুঁজিপতি শোষক এবং মজুরী-শ্রমিক শোষিত। আর পুঁজিপতি ও সর্বহারাশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্বই হল এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত থাকায় শ্রেণী-শোষণ ও শাসন বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে এখানেও রাষ্ট্র বর্তমান। সামন্ত-শোষণ ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রশক্তি দখল করেছিল সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে। এখন বুর্জোয়াশ্রেণী সেই রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে সর্বহারাশ্রেণীর উপর শোষণ কায়েম রাখতে। রাষ্ট্রের কাঠামোতে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু শ্রেণী-শোষণের মূলনীতি অপরিবর্তিতই

রয়ে গেছে। নির্যাতনের যন্ত্র হিসাবে বুর্জোয়া সংবিধান, আইন-আদালত, পুলিস-মিলিটারী, জেল হাজত ইত্যাদি আরো দৃঢ় সংগঠিত করা হয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) এই ব্যবস্থায় সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে গেছে। তার রূপ হল—পুঁজিপতি শোষক ও সর্বহারা শোষিত। শ্রেণীভেদ থাকায় শ্রেণীদ্বন্দ্বও রয়ে গেছে।

(২) পুঁজিপতি উৎপাদনের সমস্ত উৎপাদনের মালিক ; মজুরী-শ্রমিক সর্বহারা। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বেচতে পারলে মজুরী পায়, যা দিয়ে সে তার নিজের ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায় সংগ্রহ করতে পারে।

(৩) শ্রমিকের শ্রমশক্তি উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে এবং এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতির মুনাফার উৎস। এই উদ্বৃত্ত-মূল্য দখল করেই পুঁজিপতি পরশ্রম ভোগীর জীবন যাপন করে।

(৪) সর্বহারা শ্রেণীর উপর পুঁজিপতিদের শোষণ ও শাসন বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র বর্তমান।

(৫) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব বর্তমান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ :

উৎপাদন ব্যবস্থার উপর থেকে সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বাধা দূর করে সুরু হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন। উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথ খুলে যায়। এই যুগে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। বাষ্প ও বিদ্যুৎশক্তি মানুষের আয়ত্তে আসে। এইগুলি উৎপাদন শক্তির দ্রুত বিকাশের পথে খুবই সাহায্য করে। শিল্পে বাষ্প ও বিদ্যুৎ চালিত নতুন নতুন যন্ত্রের ব্যবহার সুরু হয়। কৃষিতেও যন্ত্র ও রাসায়নিক সারের প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুঁজিপতিরা স্থাপন করল বিরাট বিরাট মিল ও ফ্যাক্টরী। আর তাতে উৎপন্ন হতে লাগল কম খরচে প্রচুর পণ্য। কম দামের এই সব পণ্যের সঙ্গে প্রতি-যোগিতায় পিছিয়ে পড়তে লাগল ক্ষুদ্র ও হস্তশিল্পীদের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী। ক্রমে তাদের কর্মশালাগুলি উঠে যেতে লাগল। এদের পূর্বতন মালিক ও কর্মচারীগণ হয়ে পড়ল বেকার। তারা মজুরী-শ্রমিক হিসাবে কাজ নিল এইসব মিল ও ফ্যাক্টরীতে। কৃষিতেও সুরু হল পুঁজিবাদী উৎপাদন। হাজার হাজার বিঘা জমি নিয়ে উন্নত যন্ত্রপাতিসহ পত্তন হল বিরাট বিরাট পুঁজিবাদী খামার। সর্বহারা ভূমিদাস এইসব খামারে মজুরী শ্রমিকের কাজ নিল।

হাজার হাজার মজুরী-শ্রমিক কাজ করে একই কারখানায়। একই ছাদের নীচে, নয়ত একই খামারে। তাদের কাজের অবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর ও আয়াস-সাধ্য। অথচ, দিনান্ত পরিশ্রম করে তারা তাদের পরিবারের জন্য ন্যূনতম ভরণ-

শোষণের উপায়ও সংগ্রহ করতে পারে না। তারা সাক্ষাৎভাবে বুঝতে পারে পুঁজিবাদী শোষণের চাপ। সকলেই একই প্রকার শোষণের শিকার হওয়ায় তারা সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে। তাই গড়ে ওঠে শ্রমিক সংগঠন—ট্রেড-ইউনিয়ন। আর এই সব সংগঠন তুলে ধরে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবীদাওয়া।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হল,— মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন। পূর্ববর্তী সব যুগেই উৎপাদন হত প্রধানতঃ ভোগের জন্য। বিনিময় যা হত তাও হত মূলতঃ ভোগের জন্যই। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন মূলতঃ পণ্যোৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য ভোগ নয়, মুনাফা।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের পূর্বেও উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য হিসাবে বিনিময় হত। উৎপাদনকারী বেশীর ভাগ উৎপন্ন দ্রব্য নিজেই ব্যবহার করত। সামান্য যা উদ্বৃত্ত থাকত তা অপরের উৎপন্ন দ্রব্যের সঙ্গে বিনিময় করত। পরে যখন মুদ্রার প্রচলন হল, তখন উৎপাদনকারী নিজের উদ্বৃত্ত পণ্য (ক) বিক্রয় করে মুদ্রা সংগ্রহ করে এবং সেই মুদ্রা দ্বারা পণ্য (খ) ক্রয় করে। অর্থাৎ ধারাটি হল, "পণ্য (ক)—মুদ্রা—পণ্য (খ)"। যেহেতু পণ্য (ক) ও পণ্য (খ) একই প্রকারের দ্রব্য নয়, সুতরাং বিনিময়ের এই ধারা ছিল খুবই যুক্তিসম্মত।

কিন্তু, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই ধারা হল, "মুদ্রা—পণ্য—মুদ্রা"। এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি মুদ্রা, অর্থাৎ পুঁজি দিয়ে পণ্য ক্রয় করে, পরে সেই পণ্যকে আবার পুঁজিতে রূপান্তরিত করে। পুঁজিপতি যে পরিমাণ মুদ্রা দ্বারা পণ্য ক্রয় করে, পণ্য বিক্রয় করেও যদি সেই পরিমাণ মুদ্রাই ফিরে পায়, তবে পুঁজিপতি কোন স্বার্থে বিকি-কিনির ঝামেলা সইবে? সুতরাং, এই ধারায় পরবর্তী মুদ্রার পরিমাণ অবশ্যই বেশী হতে হবে। অর্থাৎ, পুঁজিপতি যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করে পণ্য বিক্রয়ের সময় তার চেয়ে বেশী মূল্য আদায় করে। আর এই বাড়তি মূল্যই উদ্বৃত্ত-মূল্য। আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতির মুনাফার উৎস।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা আমাদের বুঝাতে চায় যে, পুঁজিপতি কম দামে জিনিস ক্রয় করে তা বেশী দামে বিক্রয় করে বলেই তার মুনাফা হয়। কিন্তু, এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব। কারণ, তখন একজন পুঁজিপতির লাভ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় অন্য কোন পুঁজিপতির ক্ষতি হওয়া। এ-অবস্থায় গোটা পুঁজিপতি সমাজকে ধরে হিসাব করলে দেখা যাবে যে, লাভ-ক্ষতি কাটাকাটি হয়ে কোন সাধারণ মুনাফাই থাকছে না। সুতরাং, বিকি-কিনির মধ্যে মুনাফার উৎপত্তি হতে পারে না। দ্রব্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যেই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির গুপ্তকথা লুকিয়ে আছে। দেখা যাক, কিভাবে উৎপাদনের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়।

পুঁজিপতি তার পুঁজি দ্বারা প্রথম বাড়ী, কারখানা, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সংগ্রহ করে। কিন্তু, শুধু এদের দিয়ে উৎপাদন হয় না। উৎপাদন করতে হলে চাই শ্রমিক। শ্রমিকের আছে কাজ করার ক্ষমতা অর্থাৎ শ্রমশক্তি। পুঁজিপতি মজুরী দিয়ে শ্রমিকদের সেই শ্রমশক্তি দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য কিনে নেয়। আর তা প্রয়োগ করে এই সব যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের উপর। তবে পণ্য-দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

উৎপন্ন দ্রব্যে পুঁজিপতি কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির হারাহারি অংশই মাত্র ফিরে পায়। সুতরাং কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি কখনই উদ্বৃত্ত মূল্য দেয় না। আর বাকী থাকে শ্রমশক্তি। এই শ্রমশক্তিই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত জিনিসের মূল্য স্থির হয় তার উৎপাদন খরচ দ্বারা। আবার মজুরী হল শ্রমশক্তির মূল্য। সুতরাং, শ্রমশক্তির মূল্য, অর্থাৎ মজুরী স্থির হয় শ্রমশক্তির উৎপাদন খরচ দ্বারা। প্রশ্ন হল—শ্রমশক্তির উৎপাদন খরচ বলতে কি বুঝায়? শ্রমশক্তির উৎপাদন খরচ হল—শ্রমিক ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ও আশ্রয়,—অর্থাৎ, মুদ্রার হিসাবে এই-গুলির মূল্য। শ্রমশক্তির অব্যাহত যোগান পেতে হলে এই মজুরী দিতে হবে দু'টি কারণে। প্রথমতঃ শ্রমিককে অবশ্যই প্রত্যহ চুক্তিমতো শ্রমসময় কাজ করার মতো সক্ষম রাখতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কিছুদিন পর এই শ্রমিক যখন অকর্মণ্য হয়ে পড়বে, তখন যেন নতুন আরও শ্রমিক সে যোগান দিতে পারে তার জন্য তার স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কারণ, তা না হলে ভবিষ্যতে শ্রমিকের যোগান বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং শ্রমিকের মজুরীর হার স্থির হয় তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয়ের ন্যূনতম পরিমাণ দ্বারা।

এই মজুরীর পরিবর্তে শ্রমিক তার শ্রমশক্তি দিনের কয়েক ঘণ্টার জন্য পুঁজি-পতিকে বিক্রয় করে। সুতরাং সেই নির্দিষ্ট শ্রমসময়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি যা উৎপাদন করে তার সবটাই পুঁজিপতি দখল করে। অথচ, শ্রমিক যা মজুরী পায় তার চেয়ে অনেক বেশী মূল্যের দ্রব্য সে ঐ সময়ে তৈরী করে। তাই, শ্রমিককে মজুরী দিয়েও পুঁজিপতির হাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে যায়। "শ্রমিক তার শ্রমসময়ের এক অংশ নিজের ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় সংগ্রহ করার জন্য ব্যয় করে। অপর অংশ সে কোন মজুরী না পেয়েও কাজ করতে বাধ্য হয় পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে। এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস, পুঁজিপতিদের সম্পদের উৎস।"[২৪]

তাই দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই উদ্বৃত্ত-মূল্য মুদ্রায় রূপান্তরিত হচ্ছে অর্থাৎ, পুঁজিতে রূপান্তরিত

হচ্ছে ততক্ষণ এর কোন মূল্য নেই। কারণ, এমনও হতে পারে যে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় হল না। তাই, বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে পণ্য-দ্রব্য মুদ্রায় রূপান্তরিত হলে তবে মুনাফা প্রাপ্তির প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়।

সুতরাং, মুনাফার জন্য পণ্যোৎপাদন প্রক্রিয়াটিকে, পুঁজিবাদী উৎপাদনকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়—(১) উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিককে বঞ্চিত করে পণ্যে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি। (২) পণ্য বিক্রয়ের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য মুদ্রায় রূপান্তরিতকরণ। এর প্রথমটি হল পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ এবং দ্বিতীয়টি হল বুর্জোয়াশ্রেণীর নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণ।

ক্রীতদাস ও ভূমিদাসের উপর দাস-মালিক ও সামন্তপ্রভুদের শ্রেণী-শোষণের ধারা আমরা লক্ষ্য করেছি। কিন্তু, শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণের মাত্রা তার চেয়ে অনেক বেশী তীব্র ও অনেক বেশী গভীর। দাস-মালিক ও সামন্ত প্রভুরাও উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করত। তবে, সেই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ, দাস-মালিক ও সামন্তপ্রভুরা নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের প্রয়োজন মেটাতে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করত। আর তা আদায় করত মূলতঃ ক্রীতদাস ও ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলক শ্রম করিয়ে অথবা উৎপন্ন ভোগ্য পণ্যের একটা নির্দিষ্ট অংশ আদায় করে। সেই আমলে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা ছিল অনুন্নত, যার পণ্য বিনিময়ের সুযোগও ছিল সীমাবদ্ধ।

কিন্তু, পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের মূল উদ্দেশ্য ভোগ নয়, মুনাফা। আর এই মুনাফা আদায় হয় মুদ্রায়। আবার সেই মুদ্রা পরের বারে পুঁজিরূপে কাজ করে আরও মুনাফা সংগ্রহ করতে পুঁজিপতিকে সাহায্য করে। তাই, পুঁজিপতিদের উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের লালসার শেষ নাই। আর সেই জন্যই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মজুরী-শ্রমিকের উপর পুঁজিপতিদের শোষণ হয় লাগামহীন।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য পুঁজিপতিরা সাধারণতঃ দু'টি উপায় অবলম্বন করে। তার প্রথমটি হল—মজুরী কমানো, অথবা শ্রম-সময় বৃদ্ধি করা। পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি এর ফলে সোজাসুজি উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, শ্রমিকশ্রেণী এই সাক্ষাৎ শোষণের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ রুখে দাঁড়ায়। অবশ্য শ্রমিকদের সংগঠন যদি শক্তিশালী হয় তবেই তারা এক হয়ে রুখতে পারে।

এমতাবস্থায়, পুঁজিপতিশ্রেণী কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা নতুন নতুন উন্নত ধরনের দ্রুতগতি যন্ত্রপাতি আমদানী করে। এই যন্ত্রের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করতে চলে শ্রমিককে একই শ্রম-সময়ে বেশী শ্রম করতে হয়। ফলে শ্রমিকের উপর

শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। আর তখন আগের চেয়ে অনেক কম সময়ে অনেক বেশী পণ্য উৎপন্ন হয়। তাই, এখন শ্রম-সময়ের একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই শ্রমিকের মজুরীর পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন হয়। আর শ্রম-সময়ের বড় অংশটিতে মালিকের জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়। এইভাবে শ্রম-সময় অপরিবর্তিত রেখে শুধু শ্রমিকের শ্রমকে তীব্রতর করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ, অর্থাৎ মুনাফা বাড়িয়ে নেয়। ফলে শ্রমিকের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

আজকের দিনের সচেতন ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু এর কোনটাই মানতে রাজী নয়। তাই, তারা মজুরী হ্রাস, শ্রম সময় বৃদ্ধি বা স্বয়ংক্রিয় দ্রুতগতি যন্ত্রপাতি প্রবর্তনে বাধা দেয়। তারা সবসময় পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করার পরিমাণ কমিয়ে নিজেদের উপর শোষণের চাপ কমাতে চেষ্টা করে।

প্রথম প্রথম প্রতিটি কারখানার শ্রমিকরা নিজ নিজ পুঁজিপতি মালিকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। ক্রমে তারা বুঝতে পারে যে, বিশেষ কোন পুঁজিপতি নয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই তাদের সকল দুঃখদুর্দশার মূল। তখন তারা গোটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করে। তাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাই পুঁজিপতিশ্রেণীর সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী।

আমরা আগেই দেখেছি, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পণ্যের উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হলেই কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফা প্রাপ্তি সম্পূর্ণ হয় না। এমনও হতে পারে যে, পুঁজিপতি উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় করতে পারছে না। অর্থাৎ পণ্যে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঁজিতে রূপান্তরিত করতে পারছে না। তখনই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকট দেখা দেয়।

এর কারণ এই যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় প্রতিটি পুঁজিপতি স্বতন্ত্রভাবে পণ্য উৎপাদন করে। বাজারে সেই পণ্য কতটুকু প্রয়োজন, অন্যান্য উৎপাদনকারীরাই বা সেই পণ্য কে কি পরিমাণ বাজারে আনছে,—এর কোনটির সম্বন্ধেই উৎপাদনকারীর সঠিক জ্ঞান থাকে না। উৎপাদন চলে আন্দাজের উপর নির্ভর করে। প্রতিটি পুঁজিপতি চায়, সে একাই বাজারে সবচেয়ে বেশী পণ্য বেচবে। সুতরাং, এ অবস্থায় বাজারে বিশৃঙ্খলা হওয়া স্বাভাবিক। তাই, বাজার দখল করা ও বাজার দখলে রাখার জন্য পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। উৎপাদন খরচ হ্রাস করে, কম দামে জিনিস বিক্রয় করে গোটা বাজারটা না হলেও অন্ততঃ বাজারের বেশীর ভাগ অংশই প্রতিটি পুঁজিপতি নিজেই দখল করতে চায়। ফলে, তাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। অবশ্য নিজেদের মধ্যে বিবাদ থাকলেও, শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার প্রশ্নে তারা সব সময়ই একাট্টা হয়ে কাজ করে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় "উৎপাদন শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ এমন এক বিরোধে জড়িয়ে পড়ে যা সে সমাধান করতে পারে না। অধিক থেকে অধিকতর পণ্য উৎপাদন করে এবং সেই সঙ্গে পণ্যেরই দাম কমিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিযোগিতাকে তীব্রতর করে; ছোট ও মাঝারি ব্যক্তিগত মালিকদের ধ্বংস করে, তাদের সর্বহারায় পরিণত করে। ফলে এদের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। অপর দিকে, উৎপাদন বাড়িয়ে এবং মিল ও ফ্যাক্টরীতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক জড়ো করে পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি সামাজিক চরিত্র দেয়। এইভাবে সে তার নিজের অস্তিত্বের ভিতের গোড়া আলগা করে ফেলে। উপরন্তু, উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক চরিত্র উৎপাদনের উপাদানে সামাজিক মালিকানা দাবী করে। অথচ, উৎপাদনের উপাদানগুলি পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবেই রয়ে গেছে। তাই, এই অবস্থা উৎপাদন পদ্ধতির সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে কখনই খাপ খায় না।"

"উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সমাধানের অযোগ্য এই সব বিরোধ সাময়িকভাবে অতি-উৎপাদনের (overproduction) সংকটরূপে দেখা দেয়। জনসাধারণের সর্ববৃহত্তম অংশ পুঁজিপতির কাজের ফলে সর্বস্বান্ত হওয়ায় উৎপন্ন-দ্রব্যের কোন কার্যকরী চাহিদা থাকে না। তাই তারা তাদের উৎপন্ন-দ্রব্য পুড়িয়ে ফেলতে, তৈরি মাল ধ্বংস করতে, উৎপাদন বন্ধ রাখতে এবং উৎপাদন শক্তি নষ্ট করে ফেলতে বাধ্য হয়। আর, তা করে এমন এক সময়, যখন লক্ষ লক্ষ লোক বেকারী ও অনাহারে কষ্ট পাচ্ছে। জনগণের এই কষ্ট কিন্তু যথেষ্ট দ্রব্য সামগ্রী নেই বলে নয়, উপরন্তু, দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন বেশী হয়ে গেছে বলেই তাদের এই কষ্ট।"

"এর অর্থ এই যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির চলতি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না এবং ফলে তাদের মধ্যে মিটমাটের অযোগ্য এক বিরোধ ঘটেছে।"

"এর অর্থ এই যে, পুঁজিবাদ বিপ্লবকে জন্ম দেওয়ার জন্য তাকে নিজের গর্ভে ধারণ করে আছে। আর এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য হল,—উৎপাদনের উপাদানের উপর থেকে পুঁজিবাদী মালিকানা উচ্ছেদ করে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।"[২৫]

এই বাস্তব অবস্থা থেকেই বোঝা যায় যে, একটি সমাজ বিপ্লবের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে।

আবার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সুরু থেকে আজকের দিনের সমস্ত

ইতিহাসই পুঁজিপতিশ্রেণী ও সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এই সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ নিয়েছে। কিন্তু, কখনই তা থেমে যায়নি, এগিয়ে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ হবে সেইদিন, যেদিন সমাজে শ্রেণী-ভেদ থাকবে না, অর্থাৎ যখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশে এই সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের রূপে আত্মপ্রকাশ করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে। অন্যান্য দেশে এই সংগ্রাম বিকাশের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। আর এই শ্রেণীসংগ্রামই সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উচ্ছেদের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয় সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে। কারণ, এই ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীই একমাত্র প্রগতিশীল উদীয়মান শক্তি। "আজকের দিনে বুর্জোয়াদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে যে সকল শ্রেণী তার মধ্যে একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীই কার্যতঃ বিপ্লবী শ্রেণী। অন্যান্য শ্রেণীরা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং অবশেষে বর্তমান শিল্পব্যবস্থার ধাক্কায় তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অথচ, সর্বহারা-শ্রেণী হল এই শিল্পব্যবস্থারই বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় ফসল।"[২৬]

একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীই বুর্জোয়া শাসন উচ্ছেদ করতে সক্ষম। কারণ, নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে সেই কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলে, আর তাকে যোগায় প্রয়োজনীয় সামর্থ্য। "যে সময়ে বুর্জোয়াশ্রেণী কৃষক ও পেটি বুর্জোয়াশ্রেণীকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে, তাদের ছত্রভঙ্গ করছে, ঠিক সেই সময়ে তারা নিজেরাই সর্বহারাশ্রেণীকে একত্র জড়ো করে সুসংহত ও সংগঠিত করছে। বৃহৎ শিল্পে নিজের অবস্থানের জোরে সর্বহারাশ্রেণী সমস্ত খেটে খাওয়া শোষিত মানুষের নেতৃত্ব করতে সক্ষম। এই খেটে খাওয়া শোষিত মানুষ হল তারাই, যাদের বুর্জোয়াশ্রেণী সর্বহারার চেয়েও বেশী মাত্রায় বঞ্চিত করে, শোষণ করে এবং নিষ্পেষিত করে; অথচ, নিজেদের মুক্তির জন্য আলাদাভাবে সংগ্রাম করার ক্ষমতা এদের নেই।"[২৭]

এমনি এক ঐতিহাসিক পটভূমিকায় সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর উপর। তারা তুলে ধরে সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ। যার মূল কথা হল,—উৎপাদনের উপাদানের উপর থেকে পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা। স্বভাবতই, এই মতবাদের মধ্যে ভাষা পায় তৎকালীন সমাজের ভবিষ্যৎ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দাবীগুলি। তাই বুর্জোয়া-শোষণে জর্জরিত সমস্ত খেটে খাওয়া মানুষ ও পেটি-বুর্জোয়ারা এই সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সমর্থনে

সমবেত হয়। আর এই সম্মিলিত শক্তির বিপ্লবী নেতৃত্বে থাকে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী।

এর পরই সুরু হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের দখলে থাকে। সর্বহারা শ্রেণী জানে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা এই রাষ্ট্রশক্তি বুর্জোয়াদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারছে, ততক্ষণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। অথচ, বুর্জোয়ারা কখনই তাদের অধিকার নির্বিবাদে ছেড়ে দিতে পারে না। তাদের হাতে রয়েছে সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনী। জনসাধারণের ন্যায্য ও সম্মিলিত সংগ্রামকে ধ্বংস করতে তারা সেই সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনীকে লেলিয়ে দেয়। তাই, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্বার্থে সর্বহারাশ্রেণীকে জোর করে রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে হয়।

রাষ্ট্রশক্তি দখল করার পর সর্বহারাশ্রেণীর প্রথম কাজ হল,—বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটি ভেঙে ফেলে তার জায়গায় সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। তখন সেই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের সাহায্যে সুরু হয় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য ; যার মূল উদ্দেশ্য হল,—সাম্যবাদী সমাজ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন, শোষণহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায় না। অধিকারচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবের সাহায্যে তখনও তাদের অধিকার পুনর্দখলের চেষ্টা করে। তাই, তাদের দমন করার জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন তখনও থাকে। তবে রাষ্ট্র এখন আর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর স্বার্থ রক্ষার যন্ত্র থাকে না। রাষ্ট্র এখন সমাজের সর্ববৃহত্তম অংশের সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের সাক্ষাৎ সহায়ক হিসাবে কাজ করে। রাষ্ট্রকে কেবলমাত্র তাদের বিরুদ্ধেই নিযুক্ত করা হয় যারা সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যের বিরোধিতা করে। আর এই সময়কার এই রাষ্ট্রই হল,— **সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব।** "পুঁজিবাদী সমাজ ও সাম্যবাদী সমাজের মধ্যে রয়েছে একটি থেকে অপরটিতে যাওয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ। আর এই যুগে রাষ্ট্র 'সর্বহারা শ্রেণীর বৈপ্লবিক একনায়কত্ব ছাড়া' (মার্কস্) অন্য কিছুই হতে পারে না।"[২৮]

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সাহায্যে উৎপাদনে পুঁজিবাদী সম্পর্ক উচ্ছেদ করা হয়। এতদিন এই সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা সরে যাওয়ায়, উৎপাদন শক্তির বিকাশ হতে থাকে অচিন্তনীয় দ্রুতগতিতে। উৎপাদনও বাড়তে থাকে একই হারে। কিন্তু, এখন আর অতি উৎপাদনের সংকটের ভয় নেই। কারণ, এখন উৎপাদন বেশী হওয়ার অর্থ হল,—

গোটা সমাজের জন্য আরো বেশী পরিমাণে ভোগ্যদ্রব্যের যোগান। এখন উৎপাদনের উদ্দেশ্য কোন পুঁজিপতির মুনাফা নয়; এখন উৎপাদনের উদ্দেশ্য হল সমাজের সমস্ত জনগণের জীবনধারণের অবস্থা ও সুখসুবিধা বৃদ্ধি করা।

"সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি হল,—উৎপাদনের উপাদানের উপর সামাজিক মালিকানা। এখানে এখন আর শোষক ও শোষিত নেই। যে যেমন শ্রম করে, উৎপন্ন দ্রব্যের সে তেমন ভাগ পায়। এই নীতির মূল কথা হল—'যে কাজ করবে না, সে খাবেও না'। এখানে উৎপাদন ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হল—বন্ধুসুলভ সহযোগিতা এবং শোষণমুক্ত শ্রমিকদের পারস্পরিক সমাজতান্ত্রিক সহযোগিতা। এখনকার উৎপাদন শক্তির চরিত্রের সঙ্গে এই উৎপাদন সম্পর্ক সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, উৎপাদনের উপাদানে সামাজিক মালিকানা উৎপাদন ব্যবস্থার সামাজিক চরিত্রকে শক্তিশালীই করে।"[২৯]

সমাজতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

(১) এই ব্যবস্থায় শ্রেণী-শোষণ দূর হয়েছে। তবে অধিকারচ্যুত বুর্জোয়াদের সম্যক প্রতিরোধ সম্পূর্ণ দূর হয়নি।

(২) উৎপাদনের উপাদানে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক মালিকানা। প্রতিটি লোককে শ্রম করতে হয়। প্রত্যেকে নিজ নিজ শ্রমের অনুপাতে উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ পায়।

(৩) পরশ্রমভোগী কোন শ্রেণীর অস্তিত্ব এই ব্যবস্থায় নেই।

(৪) সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে সহায়তা করা ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ-শক্তিকে দমন করার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব হল এই যুগের রাষ্ট্রের রূপ।

(৫) নারী ও পুরুষের সমান অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকায় নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্বের অবসান হয়েছে।

সাম্যবাদী সমাজ :

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে বিচার করে মার্কস পুঁজিবাদের পতন ও সমাজতন্ত্রের উদ্ভব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় সেই ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম সফল হয়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এরপর এশিয়া, ইউরোপ ও আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশে পরপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য করে চলেছে। অন্য অনেক দেশে পুঁজিপতি ও সর্বহারাশ্রেণীর শ্রেণীদ্বন্দ্ব এখন বিস্ফোরণের মুখে।

সাম্যবাদী সমাজ সম্বন্ধে মার্কস কোন রঙিন চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেননি। তিনি বলেননি যে, রাত পোহালেই দেখতে পাওয়া যাবে, আমরা একটা আদর্শ সমাজব্যবস্থায় পৌঁছে গেছি। বরং তিনি বলেছেন যে, সমাজতান্ত্রিক যুগের প্রথমদিকে বুর্জোয়া সমাজের অনেক দোষের অবশেষ থেকে যাবে। কারণ পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভে দীর্ঘ গর্ভযন্ত্রণা ভোগের পর সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়। তার জন্মলগ্নে তার অঙ্গে পুরাতন ব্যবস্থার অনেক জন্মচিহ্নই বর্তমান থাকবে। তবে, তখন যা থাকবে না, তা হল—সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার ও তার নিত্যসঙ্গী শ্রেণীশোষণ। আর তখন চলবে সর্বহারার একনায়কত্বে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য যার ভবিষ্যৎ পরিণতিতে আসবে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা।

"কমিউনিস্ট সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে এক সময় মানুষের উপর থেকে শ্রম-বিভাগজনিত দাসত্ব ও সেই সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক শ্রমের পার্থক্য দূর হয়ে যাবে। তখন শ্রম আর শুধু জীবনধারণের উপায় হিসাবে গণ্য না হয়ে জীবন-ধারণের প্রয়োজন হিসাবে গণ্য হবে; সেই সময়ে প্রতিটি মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে উৎপাদন শক্তির প্রভূত বিকাশ হবে এবং সম্মিলিত সম্পদের সমস্ত উৎসগুলি থেকে অপর্যাপ্ত সম্পদ যোগান আসবে। তখনই সংকীর্ণ বুর্জোয়া রীতিকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে সমাজ তার পতাকায় লিখতে পারবে,—'প্রত্যেকের নিকট থেকে তার সামর্থ্য মতো এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মতো।'" -0

অর্থাৎ, উৎপাদন শক্তির অপ্রতিহত বিকাশের পথ খুলে যাবে। অতি-উৎপাদনের সংকট ও পাইকারী বেকার সৃষ্টির ভয় না থাকায় যন্ত্রপাতির উন্নতিতে এখন আর কোন বাধা থাকবে না। এখন উন্নত যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হলে তা সমস্ত জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করবে। উন্নত যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমের সময় ও বোঝা দুই-ই লাঘব করবে। তারা এখন আরো বেশী বেশী করে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে। শ্রম তখন আর উপর থেকে চাপানো শোষণের অস্ত্র থাকবে না। শ্রম তখন মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ হয়ে যাবে; যেমন খেলা ধুলা, পড়াশুনা প্রতিটি মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গ।

এমনিভাবে সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সম্পদভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে থাকবে। তখন সমাজের প্রত্যেক সভ্য সেই ভাণ্ডার থেকে নিজস্ব প্রয়োজন মতো ভোগ্যপণ্য নেওয়ার পরেও যথেষ্ট উদ্বৃত্ত থাকবে। সুতরাং, কেউ এই প্রতিবাদ করতে আসবে না যে, অমুক লোক বেশী ভোগ করে ফেলায় আমার কম পড়েছে। সেই বাগ শ্রেণীভেদের কোন প্রশ্নই থাকবে না, সুতরাং শ্রেণী-

শোষণের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে। তাই রাষ্ট্র তখন ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সমাজ বিকাশের ইতিহাসে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকারের সমাজ-ব্যবস্থা দেখা যায় যথা,—(১) আদিম সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা, (২) দাস সমাজ-ব্যবস্থা, (৩) সামন্ত-তান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, (৪) পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থা, (৫) সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা।

বুর্জোয়া ইতিহাস লেখকগণ সমাজের ক্রমবিকাশকে কখনই সঙ্গতিপূর্ণ ধারায় যুক্ত করেননি। তাঁদের ইতিহাস হল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ মাত্র। একমাত্র সময়ের যোগসূত্র ছাড়া আর কোন যোগসূত্রই তাতে নেই। কাহিনী-গুলি মূলতঃ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ, ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য দিগ্বিজয় অভিযান, ধর্মপ্রচারের নামে হানাহানি, সাম্রাজ্য বিস্তারের কুটিল চক্রান্ত, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কার ইত্যাদি। এর ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য ক্রীতদাস, কৃষক ও শ্রমিক বিদ্রোহের কাহিনীও দেখা যায়। তবে, তা বলা হয় কোন রাজা বা সম্রাটের রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণ হিসাবে। সেখানেও প্রাধান্য পায় সেই রাজা বা সম্রাটের নৃশংস অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহ দমনের ক্ষমতার বিবরণ। এই সব ঘটনার মধ্যে যে সমাজ বিকাশের উপাদান রয়েছে, তা তাঁদের চোখে পড়ে না বা তাঁরা কখনই তা তুলে ধরেন না।

মার্কসই সর্বপ্রথম দেখান যে ইতিহাস কখনই পরস্পর সম্পর্কবিহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর সমষ্টি নয়; প্রতি যুগের প্রতিটি ঘটনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অতীত ঘটনার প্রভাব যেমন রয়েছে বর্তমান ঘটনার উপর, তেমনি বর্তমান ও অতীত ঘটনাবলীর প্রভাব থাকবে ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর উপর। মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ইতিহাসের ঘটনাবলীকে সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের অন্তর্নিহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করে ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছে।

জীবনধারণের জন্য মানুষকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী, যথা—খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, যন্ত্রপাতি, অস্ত্র ইত্যাদি উৎপাদন করতে হয়। আর মানুষ এই উৎপাদন করে সমাজবদ্ধভাবে। সুতরাং, সর্বসময়ে সর্বকালে উৎপাদন হল সামাজিক উৎপাদন। কি কি জিনিস উৎপন্ন হয়, কি ভাবে উৎপন্ন হয়, উৎপাদনে কি কি যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়,—তার উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠে বিভিন্ন যুগের সমাজ-ব্যবস্থা। প্রতিটি সমাজ-ব্যবস্থার "উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে উৎপাদন শক্তি ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত। নতুন উৎপাদন শক্তি আয়ত্ত করতে গিয়ে মানুষ উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে। আর জীবনধারণের উপায় সংগ্রহের পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্য

দিয়ে সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক পরিবর্তন করে। তাই, হস্তচালিত যাঁতাকল যে সমাজ দেয়, তাতে থাকে সামন্তপ্রভু আর বাষ্প-চালিত যন্ত্রের সমাজে থাকে শিল্প-পুঁজিপতি।”৩১

কোন একটি নির্দিষ্ট যুগে সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে সেই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর। যেমন যেমন উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়, মানুষে মানুষে সম্পর্কও তেমন তেমন পরিবর্তন হয়। যেমন, যৌথ উৎপাদন-ব্যবস্থার যুগে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সমান সমান ভিত্তিতে। উৎপাদনের উপাদানগুলি ছিল গোটা সমাজের দখলে। প্রত্যেকে সামাজিক উৎপাদনে শ্রম করত, আর তার ফসল ভাগ করে ভোগ করত। দাস উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্রীতদাসকে দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার রীতি প্রবর্তিত হল, সৃষ্টি হল পরশ্রমভোগী দাস-মালিক শ্রেণী। দাস মালিক উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের মালিক, এমনকি ক্রীতদাসেরও মালিক। ক্রীতদাসদের শোষণ করে শোষক দাস-মালিক সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য দখল করে। তেমনি, সামন্ত ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মানুষে মানুষে বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়।

এই বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক কিন্তু মানুষ তার নিজস্ব ইচ্ছা-অনিচ্ছা দ্বারা স্থির করে না। “জীবনধারণের জন্য সামাজিক উৎপাদন করতে গিয়ে মানুষ এইসব নির্দিষ্ট অথচ অপরিহার্য সম্পর্কে যুক্ত হয়। আর এই উৎপাদন সম্পর্কের রূপ কি হবে, তা মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সমাজের বাস্তব উৎপাদন শক্তির বিকাশের বিশেষ স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই এই সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। এই উৎপাদন সম্পর্কগুলির মিলিত রূপই হল সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো,—আর এই সেই বনিয়াদ যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে আইনানুগ ও রাজনৈতিক উপরি-কাঠামো, যার সঙ্গে ঐ সমাজের ধ্যান-ধারণার বিশিষ্ট রূপগুলির সঙ্গতি থাকে। সাধারণভাবে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ উৎপাদন করার ব্যবস্থাই মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানসিক জীবন-ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষের ধ্যান-ধারণা তার জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার ধ্যান-ধারণাকে প্রভাবিত করে।”৩২

অর্থাৎ, কোন একটি যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রচলিত হয়; গড়ে ওঠে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, নৈতিক আদর্শ, রাজনৈতিক মতবাদ ও অন্যান্য ভাবধারা। কারণ, এইগুলির উপর সমাজের বাস্তব অবস্থা ও অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হতে বাধ্য।

এখন দেখতে হবে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন কেন হয়? আমরা দেখেছি যে উৎপাদন ব্যবস্থার মূল অংশ হল দু'টি,—(১) উৎপাদন শক্তি, (২) উৎপাদন সম্পর্ক। আমরা আরো দেখেছি যে, এই দু'টি অংশের মধ্যে সঙ্গতি রেখেই উৎপাদন কার্য চলতে পারে। প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে; আর মানুষের সেবায় এইগুলিকে নিযুক্ত করার কলাকৌশলও মানুষ আরো বেশী বেশী করে আয়ত্ত করছে। ফলে যন্ত্রপাতি ও তার প্রয়োগকৌশল বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন শক্তি উন্নততর স্তরে উঠতে থাকে। ক্রমে "বিকাশের এক বিশেষ স্তরে সমাজের বাস্তব উৎপাদন শক্তির সঙ্গে প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ ঘটে। এই একই ব্যাপারকে আইনের ভাষায় বললে দাঁড়ায়—উৎপাদন শক্তি এতদিন যে সম্পদ-সম্পর্কের (property relations) মধ্যে কাজ করে আসছিল তার সঙ্গে তার (উৎপাদন শক্তির—লেখক) বিরোধ বেধে যায়। এই সম্পর্ক এখন উৎপাদন শক্তির বিকাশের উপযুক্ত আদর্শ না হয়ে তার শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখনই একটি সমাজ-বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়।"৩৩

অর্থাৎ, উৎপাদন ধারায় অগ্রগতি বজায় রাখতে হলে বিকশিত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে পড়ে, তার জায়গায় দেখা দেয় নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। আবার, "অর্থনৈতিক বুনিয়াদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিরাট উপরি-কাঠামো অল্পাধিক দ্রুতগতিতে বদলে যায়। এই রূপান্তরের কথা আলোচনা করতে গিয়ে দু'টি ব্যাপারের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে। একটি হল, উৎপাদনের অর্থনৈতিক অবস্থার বাস্তব রূপান্তর। এই রূপান্তর প্রকৃতি বিজ্ঞানের ঘটনার মতোই নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায়। অপরটি হল, মানুষের ধ্যান-ধারণার স্বরূপ অর্থাৎ, আইন, রাজনীতি, ধর্ম, সৌন্দর্যতত্ত্ব, দর্শন ইত্যাদির রূপান্তর। এদের মধ্য দিয়েই মানুষ বিরোধ সম্বন্ধে সচেতন হয় এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কোন একজন তার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করে তা দিয়ে আমরা যেমন তাকে বিচার করি না, তেমনি কোন যুগ-পরিবর্তনকে তার নিজস্ব চেতনা দিয়ে বিচার করতে পারি না। বিপরীতপক্ষে, বরং সেই যুগের চেতনাকেই তার বাস্তব জীবনের স্ববিরোধ দিয়ে বিচার করতে হবে। যুগ পরিবর্তনকে বিচার করতে হবে সেই যুগের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব দিয়ে।"৩৪

কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, "কোন একটি সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে

উৎপাদন শক্তির বিকাশের জন্য যে সুযোগ রয়েছে তা শেষ না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেই সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় না। যতদিন পর্যন্ত না পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার গর্ভে এমন এক অবস্থা পরিপক্ক হয় যাতে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা বেঁচে থাকতে পারে ততদিন নতুন উন্নততর উৎপাদন সম্পর্কের আবির্ভাব সম্ভব নয়। সুতরাং, মানুষ শুধু সেই দায়িত্বই গ্রহণ করে যা সে সমাধান করতে পারে। কারণ, আমরা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে, দায়িত্বটি তখনই কর্তব্য হিসাবে দেখা দেয় যখন এর সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বা সৃষ্টি হতে যাচ্ছে।"৩৫

তাই বলে "এর অর্থ এই নয় যে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন এবং পুরাতন উৎপাদন সম্পক থেকে নতুন উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমবিকাশ নির্ঝঞ্ঝাটে, সংঘর্ষ ছাড়াই, বিপ্লব ছাড়াই সংঘটিত হয়। বিপরীতপক্ষে, বিপ্লবের সাহায্যে পুরাতন সম্পর্কের উচ্ছেদ করে এবং নতুন সম্পর্ক পত্তন করে এই ক্রমবিকাশ সাধারণত ঘটে থাকে। একটা স্তর পর্যন্ত উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করেই ঘটে। কিন্তু, তা ততদিনই সম্ভব যতদিন পর্যন্ত না নতুন ও বিকশিত উৎপাদন শক্তি উপযুক্ত পরিপকতা লাভ করে। নতুন উৎপাদন শক্তি পরিপক্কতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ধারক-বাহক, অর্থাৎ শাসকশ্রেণী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন একমাত্র উদীয়মান শ্রেণীদের সজ্ঞান ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারাই অর্থাৎ এইসব শ্রেণীর বলপ্রয়োগ, অর্থাৎ বিপ্লব দ্বারাই তা দূর করা সম্ভব।"৩৬

সমাজ বিপ্লবের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র যখন পরিপকতার পথে তখনই দেখা দেয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কারণ, প্রচলিত ব্যবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্থনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন শাসকশ্রেণীর হাতে রয়েছে। আর এই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল না করে কোন সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনৈতিক বাধা উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। তাই "তখনই নতুন সামাজিক মতবাদের দারুণ উপযোগিতা প্রবলভাবে দেখা দেয়। প্রয়োজন দেখা দেয় নতুন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও নতুন রাজনৈতিক শক্তির, যার উদ্দেশ্য হবে বলপূর্বক পুরাতন সম্পর্কের উচ্ছেদ করা। পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে নতুন উৎপাদন শক্তির দ্বন্দ্ব ও সমাজের নবতম অর্থনৈতিক দাবীগুলি থেকেই জন্ম নেয় নতুন সামাজিক মতবাদ।"৩৭ আর "একবার এই মতবাদ জনগণকে আকৃষ্ট করলে তা বাস্তব শক্তিরূপে পরিণত হয়।"৩৮ তখন "এই নতুন মতবাদ জনগণকে সংগঠিত ও সক্রিয় করে। জনসাধারণ তখন একটি

রাজনৈতিক বাহিনীতে সংগঠিত হয়, তৈরি করে একটি বৈপ্লবিক শক্তি এবং এই শক্তিই বলপূর্বক পুরাতন উৎপাদন সম্পর্কের ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে এবং নতুন ব্যবস্থাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। বিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত গতির স্থান এইবার দখল করে জনগণের সজ্ঞান কর্মকাণ্ড,—দেখা দেয় শান্তিপূর্ণ বিকাশের স্থানে প্রবল উত্থান অর্থাৎ ক্রমবিবর্তনের স্থানে বিপ্লব।"[৩৯]

১—কার্ল মার্কস, ২—ঐ, ৩—ঐ, ৪—ঐ, ৫—ঐ, ৬—স্তালিন, ৭—ঐ, ৮—কার্ল মার্কস, ৯—স্তালিন, ১০—ঐ, ১১—এঙ্গেলস, ১২—ঐ, ১৩—ঐ, ১৪—ঐ, ১৫—ঐ, ১৬—ঐ, ১৭—স্তালিন, ১৮—এঙ্গেলস, ১৯—ঐ, ২০—স্তালিন, ২১—লেনিন, ২২—স্তালিন, ২৩—ঐ, ২৪—লেনিন, ২৫—এঙ্গেলস, ২৬—ঐ, ২৭—ঐ, ২৮—ঐ, ২৯—লেনিন, ৩০—ঐ, ৩১—স্তালিন, ৩২—লেনিন, ৩৩—ঐ, ৩৪—স্তালিন, ৩৫—কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো, ৩৬—লেনিন, ৩৭—কার্ল মার্কস, ৩৮—স্তালিন, ৩৯—কার্ল মার্কস।

রাষ্ট্রের বিকাশ

সমাজের বিকাশের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না। সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল খুবই সাদাসিধা ধরনের। ফলমূল সংগ্রহ করা, মাছ ধরা ও বন্য পশু শিকার করাই ছিল প্রধান পেশা। হাতিয়ার ও তার ব্যবহারের কলা কৌশলও ছিল অতি মামুলী ধরনের। এ অবস্থায় একসঙ্গে কাজ করা এবং কাজের ফল একসঙ্গে ভাগ করে ভোগ করাই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম।

সমাজের পুরুষরা মিলেমিশে পরামর্শ করে শিকার ধরত, ফলমূল সংগ্রহ করত। শ্রমকারী মানুষ ও শ্রমের পরিকল্পনাকারী মনের অধিকারী মানুষ বলে কোন প্রভেদ ছিল না। গৃহে নারীরা গৃহস্থালী সামলাতো। পুরুষ ও নারীর মধ্যে মর্যাদার কোন তারতম্য ছিল না।

কোন প্রকার ব্যক্তিগত সম্পত্তির অস্তিত্ব তখন ছিল না। তাই ছিল না ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ব্যক্তিগত মতভেদ দেখা দিলে গোষ্ঠী প্রধানরাই তা মিটিয়ে দিত। তখন সমাজে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না, তাই ছিল না শ্রেণী-শোষণ, ছিল না শ্রেণীদ্বন্দ্ব। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী-শাসন না থাকায় ছিল না রাষ্ট্র। "তখন মূল জিনিস ছিল রীতি নীতি। আর ছিল গোষ্ঠী প্রধানদের কর্তৃত্ব, ক্ষমতা ও তাদের প্রতি সকলের শ্রদ্ধা। কখনও কখনও মেয়েদের হাতে ক্ষমতা থেকেছে। তখনকার নারীদের অবস্থা আজকের দিনের পদানত উৎপীড়িত নারীদের মতো ছিল না। তাই, কোথাও এমন এক বিশেষ ধরনের লোক দেখা যেত না যাদের হাতে রয়েছে অন্যদের শাসন করার অধিকার।"[২]

আর ছিল না এমন এক বিশেষ ধরনের সশস্ত্র বাহিনী, যারা সমাজের অল্পসংখ্যক লোকের স্বার্থ রক্ষার জন্য সমাজের বৃহত্তম অংশকে নির্যাতন করে। সমাজের প্রতিটি কর্মক্ষম সভ্য ছিল সশস্ত্র। তারাই ছিল সমাজের গণরক্ষী। প্রতিবেশী গোষ্ঠী বা হিংস্র পশুর আক্রমণ তারা মিলিতভাবে মোকাবেলা করত। শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্রহীন শাসন, এই ছিল সে যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইতোমধ্যে পশুপালন ও চাষবাস প্রধান পেশা হয়ে পড়েছে। শিকারও অবশ্য রয়েছে। তবে জীবনরক্ষার জন্য শিকার না করলেই নয়, এ অবস্থা এখন আর

নেই। বরং সারাদিন শিকারের পিছনে ছোটার চেয়ে পশুপালন ও চাষবাস অনেক লাভজনক। তাই, শিকার ক্রমেই মূল পেশা থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। কালক্রমে তা নেশা ও খেলার পর্যায়ে চলে গেল।

এই যুগের শেষদিকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব হল। উৎপাদন শক্তির ক্রমোন্নতি হওয়ায় ব্যক্তিগত উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হল। দেখা দিল ব্যক্তিগত বিনিময় প্রথা। পরে বিনিময়ের আরো বিকাশের ফলে আরো শ্রমশক্তির প্রয়োজন দেখা দিল। আর সেই প্রয়োজনের পথ ধরেই দাস প্রথার উদ্ভব হল। সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ল মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে—দাস-মালিক ও ক্রীতদাস, শোষক ও শোষিত। শুরু হল শ্রেণীশোষণ, দেখা দিল শ্রেণীদ্বন্দ্ব।

"গোষ্ঠী প্রথার উদ্ভব হয়েছিল এমন এক সমাজব্যবস্থায় যেখানে কোন অন্তর্বিরোধ ছিল না। আর গোষ্ঠী প্রথা এইরূপ সমাজব্যবস্থাতেই উপযুক্ত ছিল। এই ব্যবস্থায় জনমত ছাড়া অন্য কোন বল প্রয়োগের শক্তি ছিল না। কিন্তু, এখন এমন এক সমাজব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যা তার অস্তিত্ব রক্ষার সর্বপ্রকার অর্থনৈতিক চাপের ফলে প্রথমে মুক্ত মানুষ ও ক্রীতদাস এবং পরে শোষণকারী ধনী ও শোষিত দরিদ্র-শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই সমাজব্যবস্থায় তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব মিটমাট করতে শুধু অক্ষমই ছিল না, উপরন্তু এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে চরম পর্যায়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এইরূপ একটি সমাজ হয়ত বিবাদমান শ্রেণীগুলির মধ্যে নিরন্তর ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থাকতে পারত নয়ত টিকে থাকতে পারে কোন একটি তৃতীয় শক্তির শাসনের অধীনে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এই শক্তি যেন শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে থেকে শ্রেণীসংঘর্ষকে দমন করে; বড়জোর শ্রেণীদ্বন্দ্বকে তথাকথিত আইনসম্মত পদ্ধতিতে শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চলতে দেয়। ইতোমধ্যে গোষ্ঠীপ্রথার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে। শ্রম-বিভাগ এই প্রথাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে এবং তার ফলে সমাজ হয়ে পড়েছে শ্রেণীবিভক্ত। আর গোষ্ঠীপ্রথার স্থান দখল করেছে রাষ্ট্র।"[২]

গোষ্ঠীপ্রথায় যে গোষ্ঠী-প্রধানদের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করত, এখন তা ভেঙে পড়েছে। প্রধানদের অনেকেই এখন সম্পদশালী শ্রেণীর সভ্য হয়ে পড়েছে। তাদের কাছে নিরপেক্ষতার চেয়ে এখন শ্রেণীস্বার্থ অনেক জরুরী। সুতরাং তাদের পূর্বমর্যাদা নষ্ট হয়ে গেছে। সমাজকে বেঁধে রাখার শক্তি এখন আর তাদের নেই।

রাষ্ট্র কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বকে মেটাতে পারেনি। এ শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্বকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে সাহায্য করে। আর তা করে, সে শুধু প্রচলিত শোষণ

ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতেই সাহায্য করে। রাষ্ট্রের আইন-কানুন শোষকশ্রেণীর শোষণ ও পীড়নকে আইনসম্মত বলে স্বীকৃতি দেয়। তাই দেখি দাসব্যবস্থায় দাস-মালিকরাই একমাত্র পূর্ণ অধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক। ক্রীতদাসরা তাদের অস্থাবর সম্পত্তি। ক্রীতদাসকে হত্যা করার অধিকার দাস-মালিকদের আইনসম্মত অধিকার। "রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী শাসনের যন্ত্র, এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণের যন্ত্র। ইহা পরস্পর বিবদমান শ্রেণীগুলির সংঘর্ষকে নিয়ন্ত্রিত রাখার মতো 'শৃঙ্খলা' স্থাপন করে। আর সেই শৃঙ্খলা দ্বারা এই শোষণকে আইনসম্মত ও চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা করে।"৩

ইতোমধ্যে গড়ে উঠেছে গ্রাম এবং পরবর্তীকালে গড়ে উঠল শহর ও নগর। কাঠ ও ইটের প্রাচীর দিয়ে সেগুলিকে করা হল সুরক্ষিত। শত্রু গোষ্ঠী ও হিংস্র পশুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে করা হল সুদৃঢ়। উন্নত ধরনের যান যেমন, রথ আবিষ্কৃত হল। নানা প্রকার উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি হল। ফলে, এখন আর গোষ্ঠীর সকল সভ্যকে একসঙ্গে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে যেতে হয় না। তাই, উৎপাদনে নিযুক্ত জনগণের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার কমতে লাগল।

অপরদিকে, পরশ্রমভোগী দাস মালিকদের হাতে অফুরন্ত অবসর। তারা শখ করে শিকার করে বেড়ায়, অস্ত্রশস্ত্রের নানা কৌশল আয়ত্ত করে, যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করে। আর লুট করে বেড়ায় প্রতিবেশী গোষ্ঠীর ধনসম্পদ। ক্রমে এরাই হয়ে উঠল সমাজের সামরিক অধিনায়ক।

সমস্ত দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে এখন প্রতিটি গোষ্ঠীই অধিকতর সম্পদের অধিকারী হয়েছে। আর এই সম্পদ স্বভাবতই প্রতিবেশী গোষ্ঠীর লোভ জাগাত। তাই প্রতিবেশী গোষ্ঠীদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ লুট করার কাজ একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। একদা প্রতিশোধ লওয়া বা ভূখণ্ড ও শিকারভূমি দখল করা বা দখল রাখার জন্য যে যুদ্ধ করা হত, এখন তা করা হয় লুটের উদ্দেশ্যে।

লুণ্ঠনের কাজে সামরিকশ্রেণীর গুরুত্ব স্বভাবতই বেশী থাকে। তাই বিভিন্ন স্থানে সেখানকার জনগণের মধ্য থেকে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক অধিনায়কগণই সমাজের সর্বেসর্বা হয়ে উঠে। তার অধীনস্থ উপনায়কদের ক্ষমতাও সেই সঙ্গে বাড়তে থাকে। লুটের সম্পদ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে তুলল। প্রথম দিকে তারা প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সভ্যদের সম্পদ লুট করত, তাদের পীড়ন করত। ক্রমে তারা নিজেদের ও সমাজের অন্যান্য সম্পদশালী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজ নিজ সমাজের শোষিত জনগণের উপর দমন-পীড়ন করতে শুরু করল। তারা পরিণত হল—সম্পদশালীশ্রেণীর শাসন ও শোষণ বজায় রাখার যন্ত্রে।

রাষ্ট্রের প্রাচীনতম রূপ, অর্থাৎ, দাস-মালিক রাষ্ট্র, যা গড়ে উঠেছিল গোষ্ঠী-প্রথার ধ্বংসের উপর, তা হল—সামরিক গণতন্ত্র। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে তার রূপ ছিল ভিন্ন ভিন্ন। প্রধান সামরিক অধিনায়ক ও তার অধীনস্থ উপনায়কদের নিয়ে গড়ে ওঠে এক প্রতিষ্ঠান যার উপর বর্তায় সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি। এবং "সেই সঙ্গে রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থাগুলি গোটা সমাজের জনগণের ইচ্ছা প্রকাশের সংস্থার পরিবর্তে স্বীয় জনগণের উপর শাসন ও পীড়নের আলাদা হাতিয়ার হিসাবে গড়ে উঠল। এটি কিন্তু হতে পারত না, যদি ধন-লালসা গোষ্ঠী সভ্যদের ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীতে বিভক্ত করে না ফেলত; যদি গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পত্তিভেদের ফলে গোষ্ঠী সভ্যদের ঐক্যবদ্ধ স্বার্থ না তাদের বিরোধে পরিণত হত, (মার্কস) এবং যদি দাস-প্রথার বিকাশের ফলে ইতোমধ্যেই জীবিকার জন্য শ্রমকে দাসদের করণীয় কাজ বলে মনে করা হত এবং তাকে লুণ্ঠনের চেয়েও অনেক বেশী অসম্মানজনক বলে চিহ্নিত করা না হত।"[৪]

প্রথম দিকে প্রায়ই সামরিক অধিনায়কদের বংশধরদের মধ্য থেকে যোগ্য ব্যক্তিদের পরবর্তী অধিনায়ক নির্বাচিত করা হত। ক্রমে জমির উপর উত্তরাধিকার রীতি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিনায়কের পদগুলিতেও উত্তরাধিকারের রীতি চালু হয়। গোড়ার দিকে এই রীতিকে সাধারণত সহ্য করা হত। কিন্তু, ক্রমে এটাই রীতি হয়ে দাঁড়াল এবং পরিবারগুলি একে তাদের অধিকার বলে দাবী করতে লাগল। তাই দেখি, প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করেও তারা এই অধিকার আদায় করে নিয়েছে।

চালু হল বংশানুক্রমিক শাসনের রেওয়াজ। প্রধান সামরিক অধিনায়কের কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং উত্তরাধিকার রীতি থেকে এই যুগেই রাজতন্ত্রেরও উদ্ভব হয়েছিল।

সমাজ-বিকাশের পরবর্তী স্তরে এল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। এখানেও সমাজ শ্রেণী বিভক্ত, তাই রয়েছে শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-শাসন। এর পরিবর্তিত নতুন রূপ হল—সামন্তপ্রভু শোষক ও ভূমিদাস শোষিত। "শোষণের ধারা বদলের ফলে দাস-মালিক রাষ্ট্র রূপ বদলে হল সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই ঘটনার গুরুত্ব কিন্তু বিপুল। দাসত্বের যুগে সমাজে দাসদের কোন অধিকারই ছিল না, তাদের মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। সামন্ততান্ত্রিক সমাজে কৃষক জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। ভূমিদাসত্বের মূল লক্ষণ ছিল এই যে, কৃষকদের (আর সে যুগে কৃষকই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শহরে লোক ছিল খুবই কম) মাটির সঙ্গে বাঁধা বলে মনে করা হত—ভূমিদাসত্বের ধারণাটাই এসেছে এর থেকে। সামন্তপ্রভু কৃষককে যে জমি

দিত, নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন সে সেখানে কাজ করতে পারত। বাকী দিনগুলি কৃষক-ভূমিদাসকে তার মালিকের জন্য খাটতে হত। শ্রেণী-সমাজের সারবস্তুটি রয়ে গেল—সমাজের ভিত্তি হল শ্রেণী শোষণ। একমাত্র সামন্তপ্রভুরাই ছিল পূর্ণ অধিকারসম্পন্ন শ্রেণী, কৃষকদের কোনও অধিকারই ছিল না। আসলে দাস-মালিক রাষ্ট্রে দাসদের অবস্থার সঙ্গে তাদের অবস্থার অতি অল্পই পার্থক্য ছিল। তবুও তাদের মুক্তির অর্থাৎ কৃষকদের মুক্তির পথ প্রশস্ততর হয়েছে, কারণ কৃষক ভূমি-দাসকে সরাসরি সামন্তপ্রভুদের সম্পত্তি বলে মনে করা হত না। কিছুটা সময় সে নিজের জমিতে কাজ করতে পারত। বলতে গেলে তার নিজের কিছুটা সত্তা ছিল। বিনিময় ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের সুযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে লাগল। আর তার ফলে কৃষকের মুক্তির পরিধি ক্রমাগতই বাড়তে লাগল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ বরাবরই দাস সমাজের চেয়ে বেশী জটিল। ব্যবসা ও শিল্পে বেশ উন্নতি হওয়ায় এই যুগেই পুঁজিবাদের সূচনা দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাধান্য ছিল। এখানেও রাষ্ট্রের ধরনের পার্থক্য দেখা যায়, এখানেও রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দুইই দেখা যায়, যদিও প্রজাতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকাশ ছিল খুবই দুর্বল। কিন্তু, সব ক্ষেত্রেই সামন্তপ্রভুদেরই একমাত্র শাসক বলে মনে করা হত। সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার থেকে কৃষক-ভূমিদাসদের সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হত।"[৫]

শ্রেণী বিভক্ত সামন্ত সমাজে সংখ্যাগুরু শোষিতশ্রেণীর উপর সংখ্যালঘু সামন্তপ্রভুদের শোষণ ও শাসন বজায় রাখার জন্য একটি বিশেষ সশস্ত্র শক্তির প্রয়োজন। তাই, এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র বর্তমান। দাস-যুগে সৃষ্ট রাষ্ট্রযন্ত্রটি দাস-মালিকদের হাত থেকে সামন্তপ্রভুরা দখল করে নেয়। আর তাকে নিজের প্রয়োজন মতো রদবদল করে কৃষক ভূমিদাসদের উপর শোষণ-পীড়ন বজায় রাখে। সে যুগে রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপ প্রধানতই ছিল রাজতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্র একজন লোকের শাসন। কোন কোন অঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত প্রজাতন্ত্রও দেখা যায়, তবে তাও ছিল মূলত সম্পদশালীশ্রেণীর প্রতিনিধিদের গণতন্ত্র, অর্থাৎ কার্যত অভিজাততন্ত্র। মোটকথা, সে আমলে ভূমিদাসদের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না।

এরপর এল পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। সমাজ সেই শ্রেণী-বিভক্তই রয়ে গেছে। তার পরিবর্তিত নতুন রূপ হল—পুঁজিপতি শোষক, সর্বহারা মজুরি-শ্রমিক শোষিত।

বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী সামন্তপ্রভুদের হাত থেকে রাষ্ট্র-যন্ত্রটি কেড়ে নিয়েছিল। সেই বিপ্লবে তার প্রধান সঙ্গী ছিল সামন্তশোষণে পিষ্ট

ভূমিদাস ও অন্যান্য শ্রেণী। রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে হাতে পেয়ে পুঁজিপতিরা তাকে ব্যবহার করে সর্বহারা শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের উপর পুঁজির শোষণের যন্ত্র হিসাবে। অথচ, "ব্যক্তিগত মালিকানা, পুঁজির আধিপত্য ও সর্বহারা শ্রমিক কৃষকদের সম্পূর্ণ পদানত রাখার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ ঘোষণা করে যে, স্বাধীনতাই হল তার শাসনের মূল নীতি। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এ লড়াই'এর ধ্বনি ছিল মালিকানায় স্বাধীনতা। এ রাষ্ট্র যেন এখন আর শ্রেণীরাষ্ট্র নয়,—এই হল তার বিশেষ লড়াই।"৬

"তবুও দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীকে দমন করার যন্ত্র হিসাবেই রাষ্ট্র পুঁজি-পতির দখলে রয়েছে। বাইরের খোলসটা দেখে মনে হয়, এই রাষ্ট্রে স্বাধীনতা রয়েছে। রাষ্ট্র ঘোষণা করল সার্বজনীন ভোটাধিকার। আর তার সমর্থক, প্রচারক, পণ্ডিত ও দার্শনিকগণের মুখ দিয়ে প্রচার চালাল—এ রাষ্ট্র শ্রেণী-রাষ্ট্র নয়।"৭

কিন্তু, তা কখনই হতে পারে না। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র সব সময়ই শ্রেণী-রাষ্ট্র। "যে রাষ্ট্রে জমি ও উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, সেখানে পুঁজির প্রভুত্ব থাকবেই। সে রাষ্ট্র যতই গণতান্ত্রিক হোক না কেন, সে রাষ্ট্র হল পুঁজিবাদী রাষ্ট্র; সে হল শ্রমিকশ্রেণী ও দরিদ্র চাষীকে পুঁজি-পতিদের বশে রাখার যন্ত্র। সার্বজনীন ভোটাধিকার, সংবিধান-সভা, পার্লামেণ্ট এ সব শুধুই ঠাট, এক ধরনের অঙ্গীকারপত্র। এতে আসল জিনিসটির কোন রদবদলই হয় না।

"রাষ্ট্রের প্রভুত্বের প্রকারভেদ অনুযায়ী পুঁজির আধিপত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হতে পারে। সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার থাকুক বা নাই থাকুক, কিংবা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হোক বা নাই হোক আসলে মূল ক্ষমতা কিন্তু পুঁজির হাতে থেকে যায়। মোটকথা প্রজাতন্ত্র যত বেশী গণতান্ত্রিক হয় পুঁজির শাসন ততই নগ্ন ও নির্লজ্জরূপে ফুটে ওঠে। ...পুঁজির অস্তিত্ব থাকলেই, তা সমাজের উপর তার আধিপত্য বিস্তার করবে। তখন কোন গণতন্ত্র বা কোন প্রকারের ভোটাধিকারেই আসল অবস্থাটি পালটাতে পারবে না।"৮

অবশ্য একথা ঠিক যে, "গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সার্বজনীন ভোটাধিকার সামন্ত-তন্ত্রের তুলনায় বিরাট অগ্রগতি, অনেক প্রগতিশীল। একমাত্র এর ফলেই সর্বহারা-শ্রেণীর বর্তমান ঐক্য ও সংহতি গড়া সম্ভব হয়েছে; আর সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে সর্বহারাশ্রেণীর এক দৃঢ়বদ্ধ সুশৃঙ্খল বাহিনী, যা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাচ্ছে।"৯

"পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের কাঠামোতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। সামন্ত-প্রথার বংশগত শাসনের পরিবর্তে এখন বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র চালু হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে মনে হয়, জনগণই ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। কিন্তু, কার্যতঃ শাসকশ্রেণীর কোন্ কোন্ সভ্য পার্লামেণ্টের মধ্য দিয়ে কয়েক বছর ধরে জনগণকে দমন ও পীড়ন করবে তা একবার করে ঠিক করা হয়। বুর্জোয়া রাজনীতির এই হল প্রকৃত সারবস্তু।"[১০]

পুঁজিপতিরা সামাজিক উৎপাদনে এক বিপ্লব নিয়ে আসে। তারা পত্তন করে বিরাট বিরাট কলকারখানা ও চাষের খামার। নানা প্রকার উন্নত যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয়। কৃষিতে নানা প্রকার উন্নত জাতের বীজ ও রাসায়নিক সার ব্যবহার হতে থাকে। ফলে, একদিকে উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে, অপরদিকে উৎপন্ন হতে থাকে নানা প্রকারের পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে জটিল থেকে জটিলতর শ্রম-বিভাগ প্রবর্তিত হয়। ফলে শ্রম ক্রমে হয়ে ওঠে সামাজিক শ্রম। কিন্তু উৎপাদন-সম্পর্কে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পর্কই রয়ে গেছে। তাই, উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশ বাধা পায় ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন সম্পর্কের গণ্ডিতে। এর ফলে প্রচলিত সমাজের মধ্য থেকেই সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবি সোচ্চার হয়ে ওঠে।

বুর্জোয়ারা কিন্তু, এই সত্যকে অস্বীকার করে। এমনকি বিকশিত উৎপাদন শক্তির কিছুটা অংশ সাময়িকভাবে ধ্বংস করেও তারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থা কায়েম রাখতে চেষ্টা করে। সমাজের প্রগতিশীল দাবিগুলি রাষ্ট্রশক্তির জোরে দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

এদিকে, "সামন্ত-সমাজ থেকে উদ্ভূত আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ কিন্তু শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়নি। কার্যত এটা নতুন শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, শোষণের নতুন ধারার পত্তন করেছে। আর সংঘর্ষের পুরাতন ধারার বদলে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। আমাদের এই যুগ, অর্থাৎ বুর্জোয়াযুগের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য হল—এটা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে সরলতর করেছে। গোটা সমাজ আরো বেশী মাত্রায় দু'টি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এখন যে দু'টি প্রধান শ্রেণী পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তারা হল—বুর্জোয়া ও সর্বহারা।"[১১]

মার্কসের শিক্ষায় শিক্ষিত সর্বহারাশ্রেণী জানে যে, জোর করে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে তবেই এই ব্যবস্থা পাল্টানো সম্ভব। বুর্জোয়াশ্রেণী রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেছিল; তবে তারা সামন্ততান্ত্রিক বাধা দূর করতে পেরেছিল।

সেই বুর্জোয়াশ্রেণীই কিন্তু এখন বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখে আঁতকে ওঠে। বুর্জোয়া পণ্ডিত ও লেখকগণও নানাভাবে বুঝাতে চেষ্টা করে যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ-পরিবর্তন সম্ভব।

মার্কসবাদের তত্ত্বে শিক্ষিত ও সংগঠিত সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু এই ভাওতায় ভোলে না। তারা "বিপ্লবের সাহায্যে নিজেরাই শাসক হয়ে ওঠে এবং এমনি-ভাবে পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে।"১২ অর্থাৎ সর্বহারাশ্রেণী সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে নেয়, এবং পত্তন করে সর্বহারা-শ্রেণীর একনায়কত্ব। তখন শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য।

কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় না। কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব তখনও থাকে, তবে তা নতুন মোড় নেয়। ক্ষমতাচ্যুত সংখ্যালঘু বুর্জোয়া-শ্রেণী প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। এই প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে দমন করার জন্য রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন তখনও থাকে। তাই, এই সময়ের রাষ্ট্র হল সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব।

সমাজের যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ তার অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করে এখন রাষ্ট্রশক্তি কেবলমাত্র তার বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়। আর সমাজের সর্ববৃহত্তম অংশের, অর্থাৎ বলতে গেলে, গোটা সমাজের অগ্রগতির প্রধান সহায়ক হিসাবে কাজ করে এই রাষ্ট্র। দেশরক্ষা ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব এখন গোটা সমাজের দায়িত্ব। মাইনে করা সৈন্যদের স্থান দখল করে সশস্ত্র গণফৌজ। সামরিক শিক্ষা গ্রহণ সর্বহারাশ্রেণীর বাধ্যতামূলক কর্তব্য বলে গণ্য হয়।

সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য হল—সাম্যবাদী ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সুতরাং তা সাম্যবাদে পৌঁছবার একটি ধাপ মাত্র। তাই সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব এখানেই থেমে থাকে না। "পুঁজিবাদী সমাজ সাম্যবাদী সমাজের মাঝখানে থাকবে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের বৈপ্লবিক যুগ। আর এরই পাশাপাশি থাকবে রাজনৈতিক বিকাশের যুগ, যখন রাষ্ট্র সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।"১৩

সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লব ধাপে ধাপে এগিয়ে চলে। সেই সঙ্গে এগিয়ে চলে সমাজ-তান্ত্রিক গঠনকার্য। উৎপাদন শক্তির উপর থেকে এখন পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কের জোয়াল সরে গেছে। সামাজিক মালিকানার উৎপাদন সম্পর্কের পত্তন হয়েছে। ফলে সামাজিক শ্রম এখন বাধাহীন বিকাশের সুযোগ পেয়েছে। সেই সঙ্গে সামাজিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে।

সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যের চূড়ান্ত পরিণতিতে উদ্ভব হবে সাম্যবাদী সমাজ-

ব্যবস্থা। সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণীভেদ থাকবে না, থাকবে না শ্রেণী-শোষণ। তাই, সেই সমাজে শ্রেণী-শোষণ বজায় রাখার যন্ত্র অর্থাৎ রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না। তখন রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। "মানুষের উপর মানুষের শাসন তখন পরিবর্তিত হবে বস্তুর উপর শাসনে, আর উৎপাদন ব্যবস্থার গতি নিয়ন্ত্রণে।"[১৪]

সংক্ষেপে এই হল রাষ্ট্র-বিকাশের ইতিহাস এবং তার ভবিষ্যৎ পরিণতির সংকেত। "দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্র অনন্তকাল ধরে ছিল না। এমন সমাজও ছিল যা রাষ্ট্র ছাড়াই চলেছে এবং যার রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। অর্থ-নৈতিক বিকাশের কোন এক স্তরে সমাজ শ্রেণীভেদের সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে জড়িয়ে পড়ে। সেই স্তরে এই শ্রেণীভেদের ফলেই রাষ্ট্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। আমরা এখন উৎপাদন বিকাশের এমন এক পর্যায়ের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছি যে অবিলম্বে এই সকল শ্রেণীভেদ থাকার প্রয়োজন শুধু ফুরিয়েই যাবে না, এইগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ বাধা হয়ে দাঁড়াবে। শ্রেণীভেদের উদয় যেমন একসময় অবধারিত ছিল, তেমনি পরবর্তী স্তরে শ্রেণীভেদের পতনও অবধারিত। আর এদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র অবশ্যই লোপ পাবে। সেই সময়ে সমাজ পরিচালিত হবে স্বাধীনতা ও সমতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদক-সমিতি দ্বারা। আর তখন গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে একটি চরকা ও ব্রোঞ্জের কুঠারের সঙ্গে পুরাতত্ত্বের যাদুঘরে রেখে দেওয়া হবে, আর এইটাই হবে তার উপযুক্ত স্থান।"[১৫]

সমাজ শ্রেণী-বিভক্ত হয়ে পড়ায় দেখা দিয়েছিল শ্রেণী-শোষণ। যার ফলে শুরু হয়েছিল শ্রেণী-দ্বন্দ্ব বা শ্রেণী সংঘর্ষ। "ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখন এবং যেখানেই সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দিয়েছে, অর্থাৎ সমাজ এমন কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, যাদের মধ্যে কোন একটি অংশ চিরকাল অন্যদের শ্রমের ফল ভোগ করার মতো অবস্থায় রয়েছে এবং যেখানে কিছু লোক অন্যদের শোষণ করছে, তখনই বল-প্রয়োগের যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে।"[১৬] আবার "যতদিন সমাজে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না, ততদিন এরকম কোন যন্ত্রও ছিল না। যখনই শ্রেণীর উদ্ভব হল এবং শ্রেণীভেদ বাড়তে ও কায়েম হতে লাগল, তখনই একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান দেখা দিল, দেখা দিল রাষ্ট্র।"[১৭]

রাষ্ট্র হল তারই স্বীকৃতি যে, সমাজ সাধারণের অযোগ্য অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ, সমাজ এমন এক মিটমাটের অযোগ্য দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েছে যা দূর করতে সে অক্ষম। তাই, তখন এমন একটি শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয় যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের ঊর্ধ্বে বলে মনে হয়। এই শক্তি লক্ষ্য রাখে যেন পরস্পর-

বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থে বিভক্ত শ্রেণীগুলি পরস্পরের মধ্যে নিষ্ফল সংঘর্ষে নিজেদের ধ্বংস করে না ফেলে এবং সেই সঙ্গে গোটা সমাজের ধ্বংস ডেকে না আনে। এই শক্তি শ্রেণীসংঘাতকে সংযত রাখে এবং তাকে শৃঙ্খলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। এই শক্তিই হল রাষ্ট্র। আর সমাজের মধ্যেই এর উদ্ভব হয়। অথচ, সে নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে রাখে এবং ক্রমেই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।"[১৮]

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের উপরি-উক্ত আলোচনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী-শাসন ও শ্রেণী শোষণ বজায় রাখার যন্ত্র। এই জ্ঞান সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীর একটি প্রয়োজনীয় মূলধন। এ থেকেই তারা বুঝতে পারে যে, "সর্বহারাশ্রেণীকে প্রথমেই রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে হবে এবং উৎপাদনের উপাদানগুলিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি করে কাজ সুরু করতে হবে।"[১৯]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় রাষ্ট্র হচ্ছে বুর্জোয়াদের অধিকারে। নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার দায়ে তারা কখনই রাষ্ট্রশক্তি হাতছাড়া করতে রাজী নয়। এর জন্য তারা মরণপণ লড়াই করতেও প্রস্তুত।

"দুনিয়ার কোন শাসকশ্রেণীই সংগ্রাম ছাড়া কোনদিন পরাজয় মেনে নেয়নি।"[২০] আবার "ইতিহাস বলে যে, গৃহযুদ্ধ ছাড়া কোন বড় বিপ্লব আজ পর্যন্ত ঘটেনি। তাই কোন আদর্শনিষ্ঠ মার্কসবাদীই একথা বিশ্বাস করতে পারে না যে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজবাদ গৃহযুদ্ধ ছাড়াই সম্ভব হবে।"[২১]

এইবার প্রশ্ন জাগে—সর্বহারাশ্রেণী কি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটি দখল করে তা দিয়েই সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য চালাবে?

না, কখনই তা হয় না। কারণ, বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিটি অংশ বুর্জোয়া-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য এমনভাবে তৈরি যে, তা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য চালনা কখনই সম্ভব নয়। "প্যারি কমিউন একটা জিনিস বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে যে, শ্রমিকশ্রেণী পূর্ব থেকে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি দখল করে তাকে নিজের কাজে ব্যবহার করবে না।"[২২]

"মার্কসের বক্তব্য হল যে, শ্রমিকশ্রেণী 'পূর্ব থেকে তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে' ভেঙে ফেলবে, গুড়িয়ে ফেলবে, এবং একে শুধু দখল করেই সন্তুষ্ট থাকবে না।"[২৩]

তবে কি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরই রাষ্ট্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে?

না, তাও নয়। কারণ, সমাজতান্ত্রিক-বিপ্লবের পরই শ্রেণীদ্বন্দ্ব শেষ হয়ে যায় না। বুর্জোয়াশ্রেণী প্রতিবিপ্লবের সাহায্যে তখনও আবার ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করে। সুতরাং, তা দমন করার জন্য তখনও একটি শক্তির প্রয়োজন থাকে। "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়ার সময়ে দমন করার প্রয়োজন 'এখনও' রয়ে

গেছে। কিন্তু এখন তা হল শোষিত সংখ্যাগুরু দ্বারা সংখ্যালঘু শোষককে দমন করা। দমনের একটি বিশেষ হাতিয়ার, একটি বিশেষ যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্রের এখনও প্রয়োজন। কিন্তু, এ হল পরিবর্তনকালের রাষ্ট্র। তাই, সার্থক অর্থে এ আর এখন রাষ্ট্র নয়। কারণ, গতকালকের সংখ্যাগুরু মজুরি-দাসদের দ্বারা শোষক সংখ্যালঘুকে দমন করার কাজটি তুলনামূলকভাবে এত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হয়ে যায় যে, উদীয়মান ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও মজুরি-শ্রমিকদের দমন করতে যে পরিমাণ রক্তপাত হয়েছে, এতে তার চেয়ে অনেক কম রক্তপাত হবে। মানবসমাজকে তাই এখন অনেক কম মূল্য দিতে হবে। এই ব্যবস্থা বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগুরু জনগণের মধ্যে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণের সঙ্গে এত সঙ্গতিপূর্ণ যে, এখানে দমনের জন্য 'বিশেষ যন্ত্রের' প্রয়োজন ক্রমেই ফুরিয়ে যেতে থাকে। স্বভাবতই খুব জটিল দমনের যন্ত্র ছাড়া শোষকশ্রেণী জনগণকে দমন করতে অক্ষম, অথচ, জনসাধারণ কেবলমাত্র সশস্ত্র জনগণের সাধারণ সংগঠন দ্বারাই শোষকদের দমন করতে পারে।"[২৪]

তাই, "পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে যাওয়ার মধ্যবর্তী সমাজতান্ত্রিক যুগেও রাষ্ট্র থেকে যায়। আর তখন তার রূপ হয় সর্বহারা একনায়কত্ব। এই অন্তবর্তী যুগের পরই আসবে সাম্যবাদী সমাজ। আর একমাত্র সাম্যবাদেই রাষ্ট্র পুরোপুরি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কারণ, তখন দমন করার মতো 'কেহই থাকে না'; অর্থাৎ শ্রেণী হিসাবে 'কেহই নয়।"[২৫]

একমাত্র তখনই রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর তখন "মানুষের উপর মানুষের শাসন পরিবর্তিত হয় বস্তুর উপর এবং শাসন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রণালী ও গতি নিয়ন্ত্রণে।"[২৬]

রাষ্ট্র সম্বন্ধে উপরি-উক্ত ধারণার অভাব থেকেই অতিবিপ্লবী, নয়ত সংশোধনবাদী মতবাদের উদয় হয়। উগ্রপন্থীদের মতে "রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে এক আঘাতে ভেঙে ফেলতে হবে। আর তা করতে হবে, যে সমাজব্যবস্থা এই রাজনৈতিক রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে তা উচ্ছেদ করার আগেই।"[২৭]

এ থেকে স্বভাবতই মনে হতে পারে যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটিকে রাতারাতি ভেঙে ফেলতে হবে। কিন্তু তা নয়। মার্কস ও এঙ্গেলস'এর শিক্ষা হল "রাষ্ট্রকে উচ্ছেদ করা হয় না। রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যায়।"[২৮]

বুর্জোয়া পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদগণ এ কথা মেনে নেন যে শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব থাকবে। তাঁরা এও স্বীকার করেন যে, শ্রেণী দ্বন্দ্ব থেকেই রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। কিন্তু, পরক্ষণেই তাঁরা দেখতে চান যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করাই রাষ্ট্রের কাজ। ভাববাদী দর্শনের সাহায্যে পণ্ডিতগণ বুঝাতে চান যে, রাষ্ট্র

একটি স্বর্গীয় দৈব ব্যাপার ; এটা শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে নিরপেক্ষ শাসনকার্য চালায়।

সেই পণ্ডিত ও রাজনীতিবিদরা আমাদের এও বুঝাতে চান যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কখনই শ্রেণী-রাষ্ট্র নয়। জনসাধারণ নিজেদের ভোটের মাধ্যমে এই প্রতিনিধিমূলক বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে নিজেদের স্বার্থে চলতে বাধ্য করতে পারে : ভোটের মাধ্যমে একে দখল পর্যন্ত করতে পারে। এর জন্য বিপ্লবের কোন প্রয়োজন নেই।

এই যুক্তি যে কত অসার ইতিহাস বারে বারে তা প্রমাণ করেছে। কারণ, প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া শ্রেণী ততক্ষণ পর্যন্তই সহ্য করে, যতক্ষণ তা বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করে। যখনই এই সংস্থাগুলি বুর্জোয়াদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং তারা জনসাধারণের ক্ষুদ্রতম স্বার্থ রক্ষা করতে চায়, তখনই বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তগুলি পর্যন্ত বাতিল করে দেয়। নানা অজুহাত দেখিয়ে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করে এদের ভেঙে দেয়। কায়েম করে ফ্যাসিবাদী শাসন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর উদাহরণের অন্ত নেই।

আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্র-শ্রেণী শাসন ও শ্রেণী-শোষণ বজায় রাখার জন্য যে দু টি সংস্থার ব্যবহার করে তার একটি হল 'আমলাতন্ত্র', অপরটি 'সশস্ত্র সৈন্য ও পুলিস বাহিনী'। বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের উপর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। কারন, "এঙ্গেলস-এর মতে, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে সম্পদ পরোক্ষভাবে অথচ সবচেয়ে নিশ্চিতভাবে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখে ; প্রথমতঃ 'আমলাতন্ত্রকে দুর্নীতিপরায়ণ করে', দ্বিতীয়তঃ 'গভর্নমেণ্ট ও ষ্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে বুঝাপড়ার সাহায্য নিয়ে।"[২৯]

যখন এই ব্যবস্থা বিফল হয় তখন তারা নিযুক্ত করে সশস্ত্র পুলিস ও মিলিটারী। মোটকথা রাষ্ট্র তাদের স্বার্থবিরোধী কাজ করবে, বুর্জোয়া শ্রেণী কখনই তা সহ্য করে না।

রাষ্ট্রের উপর বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রধানতঃ দু'ভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমতঃ—বুর্জোয়ারা পার্লামেণ্ট ও আমলাতন্ত্রকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘুষ দিয়ে তাদের বশে রাখে। যেমন পার্লামেণ্ট সদস্য ও মন্ত্রীদের নির্বাচনের খরচ যোগায়, বিভিন্ন সদস্যদের মোটা ঘুষ দিয়ে তাদের মনোমত সরকারকে সমর্থন করতে বা তাদের বিরোধী সরকারের পতন ঘটাতে বাধ্য করে, মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ আমলাদের জন্য অবসর গ্রহণের পর পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ব্যবস্থা

করে দেয়, মন্ত্রী ও আমলাদের ছেলে, মেয়ে ও আত্মীয়দের জন্য মোটা বেতনের চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেয়, লাইসেন্স ও পারমিটের জন্য মোটা নগদ অর্থ বা লভ্যাংশ দেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। তা ছাড়া, আধুনিক বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলি ব্যাঙ্ক-পুঁজির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রকে তাদের কথামত চলতে বাধ্য করে।

দ্বিতীয়তঃ—রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ ও সৈন্য বিভাগের উচ্চ পদ-পদগুলির জন্য নির্দিষ্ট উচ্চশিক্ষা ও সামাজিক যোগ্যতা ধার্য করা থাকে। এমন কি কিছু কিছু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি বুর্জোয়া শ্রেণী নিজ শ্রেণীর সভ্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখে। অর্থনৈতিক সামর্থ বেশী থাকায় বুর্জোয়াদের ছেলেমেয়েদের পক্ষেই শিক্ষাগত উচ্চতর যোগ্যতা লাভ করা সম্ভব হয়। তার উপর নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির মাধ্যমে এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীলদেরই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে বহাল করা হয়। আর এরা সবসময় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ, অর্থাৎ বুর্জোয়া স্বার্থ রক্ষা করে।

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মৌলিক সমস্যা দেখা না দেয়, ততক্ষণ মনে হয় যে, রাষ্ট্র-যন্ত্র ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কিন্তু যে মুহূর্তে বুর্জোয়াস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তখনই বিরোধ আত্মপ্রকাশ করে। তখন শ্রেণীস্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্রযন্ত্র পার্লামেন্টকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। রাষ্ট্রযন্ত্র তার সৈন্যবাহিনীকে কাজে লাগায়। বলপূর্বক প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ধ্বংস করে এবং জনগণের সামান্যতম গণতান্ত্রিক অধিকারও কেড়ে নিয়ে ফ্যাসিজম প্রতিষ্ঠা করে।

শোষিতশ্রেণীর উপর শাসকশ্রেণীর দমনপীড়ন বজায় রাখার যন্ত্র হিসাবে রাষ্ট্র সশস্ত্র পুলিস ও সৈন্যবাহিনী রাখে। আর তার বাস্তব আনুষঙ্গিক হিসাবে থাকে আইন-আদালত, জেল-হাজত প্রভৃতি দমনমূলক ব্যবস্থা। আইন-শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যে কোন বাধাকে কঠোর হস্তে দমন করে।

তাই আমরা দেখতে পাই, যখনই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিতশ্রেণীর প্রতিবাদ সোচ্চার হয়ে ওঠে, বা তাদের আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখনই বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা শান্তি শান্তি করে রাষ্ট্রযন্ত্রকে সক্রিয় করে তোলে। তারা দেখাতে চায়,—রাষ্ট্র শ্রেণী-স্বার্থের উর্ধ্বে, নিরপেক্ষ ও আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক মাত্র। রাষ্ট্র কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার নাম করে প্রচলিত শোষণ-ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবেই কাজ করে।

আইন শৃঙ্খলার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র জনগণের ন্যায্য প্রতিবাদ ও আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। 'দেশপ্রেম', 'জাতীয় ঐক্য', 'সংহতি' প্রভৃতি বড় বড় কথার আড়ালে তার শোষণের রূপকে ঢেকে রাখে। আর, শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জনগণের প্রচেষ্টাকে 'দেশদ্রোহ', আর শোষণের স্বরূপ প্রকাশ করে এমন সাহিত্যকে 'রাষ্ট্রবিরোধী', নাম দিয়ে কঠোর হস্তে দমন করে ; একই সময়ে রাষ্ট্রের প্রচারযন্ত্রগুলি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে,—বুর্জোয়া রাষ্ট্র হল ব্যক্তি স্বাধীনতা, ন্যায় ও সত্যের রক্ষক।

তারা জনগণের মনে এই মোহ বিস্তার করতে চেষ্টা করে যে 'শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব'। কিন্তু তাদের এই শান্তির মুখোস তখনই খুলে পড়ে, যখন মুক্তি আন্দোলন ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করে। তারা তখন সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র-পুলিস এমনকি সৈন্যবাহিনী পর্যন্ত লেলিয়ে দেয়। মোটকথা, রাষ্ট্র আইন-শৃঙ্খলার নাম করে সব সময়ই প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থার রক্ষক হিসাবেই কাজ করে। সুতরাং, একমাত্র এই বুর্জোয়া আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলার জন্যই সর্বহারাশ্রেণীকে রাষ্ট্রশক্তি দখল করে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এইবার, প্রশ্ন জাগে সর্বহারাশ্রেণী কি কোন পর্যায়েই এই প্রতিনিধিমূলক গণ-তান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশ নেবে না ?

মার্কস কিন্তু, সব সময়ই এই প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ, বৃহত্তম জন-সাধারণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে এগুলিকে দু'ভাবে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, নির্বাচনের সময় প্রচারের মধ্য দিয়ে বুর্জোয়া শাসন ও শোষণের রূপ তুলে ধরা যায়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র যে শোষকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করে, নানা উদাহরণসহ তা জনগণের সামনে তুলে ধরা যায়। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশ গ্রহণ করে এদের অসারতা ও মিথ্যাচার প্রমাণ করার সুযোগ পাওয়া যায়। প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে জনগণের মিথ্যা মোহ এমনিভাবেই দূর করা সম্ভব হয়।

কিন্তু, একথা একবারও ভুললে চলবে না যে সর্বহারাশ্রেণীর মূল লক্ষ্য হল রাষ্ট্রশক্তি দখল করা ; আর একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। সুতরাং, প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সর্বহারাশ্রেণীর অংশগ্রহণ তাদের মূল সংগ্রামের একটি কৌশল মাত্র, লক্ষ্য নয়। আরও মনে রাখতে হবে যে, দীর্ঘদিন নানা প্রকার প্রচারের মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণী সাধারণ মানুষের মনে একটি মিথ্যা ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে যে, নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব। এ

ব্যাপারে বুর্জোয়ারা সংস্কারপন্থী ও সংশোধনপন্থীদের সহযোগিতাও পেয়ে থাকে। এই বাস্তব অবস্থার কথা মনে রেখেই সর্বহারাশ্রেণী প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে তার মূল সংগ্রামের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবে।

প্রচলিত ইতিহাস আমাদের কি শেখায়? শেখায়,—রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনি ন্যায় ও ধর্মের অনুশাসন মতো প্রজাপালন করেন, অন্যায়ের বিচার করেন। তিনি নিরপেক্ষ এবং ন্যায় ও সত্যের একমাত্র রক্ষক। রাজাদের আশ্রিত ও প্রসাদপুষ্ট পণ্ডিতগণ সব সময় সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করে আসছেন, কখনও শাস্ত্রবাক্য আউড়ে, কখনও গল্প, উপাখ্যান, ধর্মোপদেশের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু, সত্যিই কি ঘটনা তাই? না, তা নয়। অগণিত সাধারণ মানুষ যুগে যুগে সুবিধাভোগীশ্রেণীর কাছ থেকে পেয়েছে কেবল শোষণ আর নির্যাতন। কিন্তু, রাজা বা শাসকশ্রেণী কোনও দিনই তার প্রতিকার করেনি। কারণ, রাজা কোনদিনই ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন না, ছিলেন সুবিধাভোগীশ্রেণীর স্বার্থের রক্ষক মাত্র।

"বুর্জোয়া বিজ্ঞানী, দার্শনিক, আইন শাস্ত্রবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সাংবাদিকগণ ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃতভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে যত গুলিয়ে তুলেছেন, তেমন বোধ হয় অন্য কোন প্রশ্নের বেলায় করেননি। এখনও প্রশ্নটিকে প্রায়ই ধর্মের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা হয়। কেবলমাত্র ধর্মমতের মুখপাত্রগণই নন (তাঁদের কাছ থেকে তো এটা স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায়), ধর্মসংস্কারমুক্ত বলে যাঁরা নিজেদের মনে করেন, তারাও প্রায়ই রাষ্ট্রের বিশেষ প্রশ্নটি ধর্মীয় প্রশ্নের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। তাঁরা যে মতবাদ দাঁড় করাতে চান তা বেশীর ভাগ সময়েই হয়ে উঠে,—তাত্ত্বিক দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির এক জটিল মতবাদ। সেই তত্ত্বটি হল,—রাষ্ট্র একটি স্বর্গীয় ব্যাপার; এটা এমন একটি শক্তি যা মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং মানুষের নাগালের বাইরের অলৌকিক একটা কিছু একমাত্র রাষ্ট্রই মানুষকে এনে দেয় বা দিতে পারে, অর্থাৎ রাষ্ট্র হল একটা দৈবশক্তি: একথা বলে রাখা উচিত যে, এই মতবাদের সঙ্গে শোষকশ্রেণী, অর্থাৎ জমিদার ও পুঁজিপতিদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর এই মতবাদ তাদের স্বার্থ রক্ষার কাজে এত বেশী সাহায্য করে এবং বুর্জোয়াদের মুখপাত্রদের বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও রীতিনীতির সঙ্গে এই মতবাদ এত গভীরভাবে যুক্ত

হয়ে গেছে যে, সমস্ত কিছুতেই এই মতবাদের জের দেখতে পাবেন।.........এই প্রশ্নটিকে (অর্থবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের কথা বাদ দিলে) এত বেশী জটিল ও ঘোরালো করে তোলার একমাত্র কারণ হল যে, অন্যান্য প্রশ্নের চেয়ে এই প্রশ্নটির সঙ্গেই শাসকশ্রেণীর স্বার্থ সবচেয়ে বেশী জড়িত। সমাজে যে তাদের বিশেষ সুবিধাভোগের সুযোগ রয়েছে তারই সাফাই হিসাবেই রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই মতবাদ তুলে ধরা হয়।"৩০

মার্কসই সর্বপ্রথম দেখান যে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী-শোষণ ও শ্রেণী-শাসন অব্যাহত রাখার যন্ত্রই হল রাষ্ট্র। কারণ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা-সম্পন্ন শ্রেণী অগণিত সম্পদহীন জনগণের উপর শোষণ চালায়। সেই শোষণের বিরুদ্ধে শোষিত জনগণের প্রতিরোধ দমন করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান অবশ্যই থাকতে হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানই হল রাষ্ট্র। মানব ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করে মার্কস দেখিয়েছেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে শ্রেণীভেদ ছিল না, ছিল না শ্রেণী-শোষণ, ছিল না রাষ্ট্র। পরবর্তী তিনটি স্তরে, অর্থাৎ দাসসমাজ, সামন্ততান্ত্রিকসমাজ ও পুঁজিবাদীসমাজে, সমাজ ছিল শ্রেণীবিভক্ত। তাই তাদের প্রত্যেকটিতে রাষ্ট্র বর্তমান। আবার ইতিহাসের ধারাকে বস্তুবাদী তত্ত্বের সাহায্যে অনুসরণ করে তিনি আরও দেখান যে, পুঁজিবাদের পতনের পর যে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে তাতে থাকবে না শ্রেণীভেদ, থাকবে না শ্রেণীশোষণ, আর থাকবে না শ্রেণী-শোষণ ও শাসন বজায় রাখার যন্ত্র—রাষ্ট্র।

সুতরাং রাষ্ট্রকে দৈবনির্দেশ বলে প্রচার করা এবং রাষ্ট্রকে ন্যায় ও সত্যের রক্ষক বলে অঙ্কিত করা নিছকই উদ্দেশ্যমূলক। "রাষ্ট্র কোন মতেই বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন শক্তি নয়। হেগেল রাষ্ট্রকে যে 'নৈতিক ধারণার বাস্তবরূপ' বা 'ন্যায় যুক্তির বাস্তব মূর্তপ্রতীক' বলে দেখাতে চেয়েছেন, রাষ্ট্র তা নয়। পরন্তু, রাষ্ট্র হচ্ছে সমাজ বিকাশের কোন এক বিশেষ স্তরের ফসল। সমাজ যে সমাধানের অযোগ্য অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে রাষ্ট্রের উদ্ভব-তারই স্বীকৃতি। অর্থাৎ, সমাজ এমন এক মিটমাটের অযোগ্য দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে যা দূর করতে সে অক্ষম। তাই এমন একটি শক্তির প্রয়োজন দেখা দেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে সমাজের উর্ধ্বে অবস্থিত বলে মনে হয়। এই শক্তির কাজ হল,—পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থে-বিভক্ত শ্রেণী-গুলি যেন নিজেদের মধ্যে নিষ্ফল সংঘর্ষে নিজেদের ও সেই সঙ্গে গোটা সমাজের ধ্বংস ডেকে না আনে তাই দেখা। এই শক্তি শ্রেণীসংঘাতকে সংযত রাখবে এবং তাকে 'শৃঙ্খলার' মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে। এই শক্তিই হল রাষ্ট্র, আর সমাজের মধ্য থেকেই এর জন্ম। অথচ, এটা নিজেকে সমাজের উর্ধ্বে স্থাপন করে এবং ক্রমেই সমাজ থেকে অধিকতর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।"৩১

আবার, "যেহেতু শ্রেণীদ্বন্দ্বকে সংহত রাখার জন্যই রাষ্ট্রের জন্ম; এবং যেহেতু শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই এর উদ্ভব, তাই, স্বাভাবিকভাবেই এটা সমাজের সবচেয়ে শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক প্রভাবশালী শ্রেণীর রাষ্ট্র। আর এই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়েই সেই শ্রেণী রাজনৈতিক প্রভাবশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর, এই ভাবেই সে শোষিতশ্রেণীকে পদানত রাখার ও শোষণ করার নতুন অস্ত্র সংগ্রহ করে। তাই আমরা দেখতে পাই, পুরাকালে রাষ্ট্র ছিল ক্রীতদাসদের বশে রাখার জন্য দাস মালিকদের রাষ্ট্র, সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল ভূমিদাস ও কৃষকদের বশে রাখার জন্য অভিজাত সম্প্রদায়ের রাষ্ট্র। আর বর্তমান প্রতিনিধিমূলক রাষ্ট্র হচ্ছে পুঁজি কর্তৃক মজুরী-শ্রমিকদের শোষণের অস্ত্র।"৩২ এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে রাষ্ট্র সব সময়ই সমাজের ক্ষমতাশীল শ্রেণীর একনায়কত্ব।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে স্বভাবতই দু'টি সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে,—

(১) যতদিন সমাজে শ্রেণীভেদ থাকবে ততদিন রাষ্ট্র থাকবে। শ্রেণীভেদ দূর হয়ে গেলে রাষ্ট্রের প্রয়োজনও ফুরিয়ে যাবে এবং তখন রাষ্ট্র ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। (২) শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে শোষিতশ্রেণীকে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রশক্তি দখল করতে হবে।

সুতরাং, পুজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ থেকে মুক্তি পেতে হলে সর্বহারাশ্রেণীকে পুজিবাদী রাষ্ট্রযন্ত্রটি প্রথম দখল করতে হবে। তারপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে শোষিত সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব। আর এই সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের সাহায্যে চালাতে হবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য। যার ফলে ক্রমে শ্রেণীহীন শোষণ-হীন সমাজব্যবস্থার অর্থাৎ, সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হবে। আর সেই সাম্য-বাদী সমাজে এই রাষ্ট্র ক্রমে তার প্রয়োজন হারিয়ে একসময় লোপ পেয়ে যাবে।

মার্কসবাদের এই শিক্ষাই হল শ্রেণীসংগ্রামের মূল কথা। কারণ "মার্কসবাদকে শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্বের তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হল তাকে বিকৃত করা; তাকে বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা। একমাত্র সেই ব্যক্তিকেই মার্কসবাদী বলা যায়, যে শ্রেণীদ্বন্দ্বকে **সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব** পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়।"৩৩

১—লেনিন, ২—এঙ্গেলস, ৩—ঐ, ৪—লেনিন,, ৫—ঐ, ৬—এঙ্গেলস, ৭—লেনিন, ৮—এঙ্গেলস, ৯—লেনিন, ১০—ঐ, ১১—ঐ, ১২—ঐ, ১৩—ঐ, ১৪—ঐ, ১৫—কমিউনিস্ট, মেনিফেস্টো, ১৬—ঐ, ১৭—কার্ল মার্কস,, ১৮—ঐ, ১৯—এঙ্গেলস, ২০—লেনিন, ২১—ঐ ২২—এঙ্গেলস, ২৩—ঐ, ২৪—লেনিন, ২৫—ঐ, ২৬—কার্ল মার্কস, ২৭—লেনিন, ২৮—ঐ, ২৯—ঐ, ৩০—এঙ্গেলস, ৩১-ঐ, ৩২—লেনিন, ৩৩—ঐ।

শ্রেণী-সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লব

সমাজ-বিকাশের আলোচনাকালে আমরা দেখেছি, আদিম সাম্যবাদী সমাজে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না, ছিল না শ্রেণী-শোষণ। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'কিছু লোক সম্পদশালী, আর বেশীর ভাগ লোক সম্পদহীন'—এইরূপ শ্রেণীভেদ ছিল না। কারণ, সমাজের সমস্ত সম্পদই তখন ছিল সমাজের সকল সভ্যের মিলিত সম্পত্তি। সভ্যগণ একসঙ্গে কাজ করে, উৎপন্ন সম্পদ ভাগ করে ভোগ করে। সুতরাং, সে যুগে সভ্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক সামর্থ্যের পার্থক্য, এবং তার ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত না থাকায়, ছিল না শ্রেণীদ্বন্দ্ব।

আদিম যৌথ সমাজের মধ্যেই উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে। ক্রমে আদিম সাম্যবাদী সমাজের যৌথ উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সেই শক্তির বিবাদ দেখা দেয়। সেই সময়েই চালু হয়েছিল সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রথা। যৌথ উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়ে। গড়ে ওঠে ক্রীতদাসদের দিয়ে উৎপাদন করিয়ে নেওয়ার রীতি। সমাজ মূলত বিভক্ত হয়ে পড়ে ক্রীতদাস ও দাস মালিক এই দু'টি শ্রেণীতে। ক্রীতদাসদের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্য আত্মসাৎ করে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন বিনিময় করে, প্রতিবেশী গোষ্ঠীর সম্পদ লুট করে ক্রমে মুক্ত মানুষের একটি ছোট অংশ সম্পদশালী হয়ে উঠতে লাগল। অপরদিকে সমাজের বৃহত্তম অংশ ক্রমেই অধিকতর সম্পদহীন হতে থাকে। ফলে এই দুই অংশ বা শ্রেণীর মধ্যে দেখা দেয় অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। এক শ্রেণী চায় তার শোষণের অধিকার চিরস্থায়ী করতে, অপর শ্রেণী চায় শোষণ ব্যবস্থার উচ্ছেদ করতে। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে সমাজের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে এক বিশেষ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ রাষ্ট্র। রাষ্ট্র এমন একটি শৃঙ্খলা সৃষ্টি করে যার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সংযতভাবে চলতে পারে। রাষ্ট্র শ্রেণীদ্বন্দ্বকে দূর না করে তাকে আইন-সম্মত রূপ দেয় মাত্র। আর তা ক'রে রাষ্ট্র প্রচলিত শোষণ ব্যবস্থারই রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং, রাষ্ট্র সব-সময়ই শোষণ-ব্যবস্থা কায়েম রাখার যন্ত্র। শোষকশ্রেণী এই রাষ্ট্রযন্ত্রটি দখলে রেখে তাদের শোষণ ও শাসন বজায় রাখে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই হল

সমাজ-বিকাশের তথা সমাজ-বিপ্লবের অর্থনৈতিক ভিত্তি। আর শোষিতশ্রেণী ও শোষকশ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণীদ্বন্দ্ব হল সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রেরণা। শ্রেণী-দ্বন্দ্বের এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড কেন্দ্রীভূত হয় রাষ্ট্রশক্তিকে ঘিরে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রশক্তি সমাজের শোষকশ্রেণীর দখলে থাকে। শোষকশ্রেণী এই যন্ত্রটির সাহায্যে তাদের শোষণ বজায় রাখে। সুতরাং, একমাত্র রাষ্ট্রশক্তি দখল করেই সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক অর্থাৎ, শোষণের ধারা পরিবর্তন সম্ভব।

দাস সমাজের ইতিহাস দাস-মালিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে বিরামহীন শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস। এই শ্রেণী-সংগ্রাম তখনই সমাজবিপ্লবে রাজনৈতিক শক্তি হয়, যখন দাসপ্রথায় উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সেই যুগের বিকশিত উৎপাদন শক্তির বিরোধ ঘটে। সেই পর্যায়ে সামন্ত-প্রভুরা দাস-মালিকদের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নেয়। ক্রীতদাসকে দাসত্ববন্ধন থেকে মুক্ত করে, তাদের পরিণত করে ভূমিদাসে। শুরু হয় নতুন প্রথায় শ্রেণী-শোষণ।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় শ্রেণীভেদের নতুন রূপ হয়, সামন্তপ্রভু শোষক, ভূমিদাস শোষিত। তাই সেই যুগের শ্রেণী-দ্বন্দ্বের রূপ হল—সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসের মধ্যে শ্রেণী-দ্বন্দ্ব। সামন্ত যুগের ইতিহাস, অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাস। পৃথিবীর প্রতিটি দেশের সেই যুগের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।

সামন্ত যুগের শেষভাগে বুর্জোয়া পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্ভব হয়। উৎপাদন শক্তির নতুন নতুন বিকাশ শুরু হয়। কিন্তু, সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের সঙ্গে। তাই, এ পরিস্থিতিতে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রামকে সংহত করে বুর্জোয়া-বিপ্লবের সাহায্যে বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি দখল করে নেয়। ভূমিদাসকে ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করে, তাকে পরিণত করে স্বাধীন মজুরী-দাসে।

পত্তন হয় পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থা। নতুন শ্রেণী বিন্যাস দাঁড়ায়, পুঁজিপতি শোষক, মজুরী শ্রমিক শোষিত। তাই শ্রেণী-দ্বন্দ্বের নতুন রূপ দাঁড়ায়, পুঁজিপতি ও সর্বহারা মজুরী-শ্রমিকের মধ্যকার শ্রেণী-সংগ্রাম।

পুঁজিপতিশ্রেণীর বল্গাহীন শোষণের ফলে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ক্রমেই তীব্রতর হতে থাকে। এই ব্যবস্থার বিশেষত্ব হল এখানে সমাজ ক্রমেই বুর্জোয়া ও সর্বহারা মজুরী-শ্রমিক এই দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম যেমন একদিকে

হয় সরলতর, তেমনি অপরদিকে হয় কঠিনতর। আর এই ব্যবস্থায় সর্বহারাশ্রেণীই হল উদীয়মান শ্রেণী।

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দায়ে পুঁজিপতিশ্রেণী উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। আর প্রবর্তন করে জটিলতর শ্রম-বিভাগ। ফলে, শ্রম ক্রমেই সামাজিক শ্রমে পরিণত হতে থাকে। কিন্তু উৎপাদন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী সম্পর্ক থাকায় তার সঙ্গে এই সামাজিক শ্রমের বিরোধ বেধে যায়। উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের স্বার্থে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ অপরিহার্য হয়ে উঠে।

এমনি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণী সমাজ-বিপ্লবের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করে। শুরু হয় রাষ্ট্রশক্তি দখল করার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। কারণ, একমাত্র রাষ্ট্রশক্তি দখল করেই সমাজব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সম্ভব। এই রাজনৈতিক সংগ্রাম ক্রমে সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। কারণ, বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রশক্তি দখলে রাখার জন্য তাদের অধীনস্থ সশস্ত্র বাহিনীকে নিযুক্ত করে সর্বহারাশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রটি দখল করে সর্বহারাশ্রেণী কিন্তু তাকে ভেঙে ফেলে তার জায়গায় তারা পত্তন করে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব। কারণ, এখনও রাষ্ট্রের প্রয়োজন রয়েছে। শ্রেণী-শোষণ দূর হলেও, অধিকারচ্যুত বুর্জোয়াশ্রেণী তখনও প্রতি-বিপ্লবের সাহায্যে তাদের অধিকার ফিরে পেতে চেষ্টা করে। এদের দমন করার জন্যই এখন রাষ্ট্রের প্রয়োজন, শোষণ-ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য নয়। "যখন শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগ্রাম বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করে, যখন শ্রমিকগণ বুর্জোয়াদের প্রতিরোধ ধ্বংস করার জন্য বুর্জোয়া একনায়কত্বের জায়গায় সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করে, তখন তারা রাষ্ট্রকে বৈপ্লবিক ও অস্থায়ী রূপ দেয়।"[১] সুতরাং, এই রাষ্ট্র এখন আর প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্র নয়, এ হল পরিবর্তন কালের রাষ্ট্র।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদন শক্তির বিকাশের পথ থেকে সকল প্রকার বাধা দূর করে। তখন সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের সাহায্যে চলতে থাকে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য। এইভাবে সমাজ এগিয়ে চলে সমাজবাদের দিকে, যেখানে থাকবে না শ্রেণীভেদ, থাকবে না শ্রেণী-শোষণ, থাকবে না শ্রেণীদ্বন্দ্ব। আর প্রয়োজন থাকবে না রাষ্ট্রশক্তির।

এই হল সংক্ষেপে শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস; আর তারই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের এই ধারা বিশ্লেষণ করে মার্কস ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পুঁজিবাদের পতন অবশ্যম্ভাবী, আর তার কবরের উপর

গড়ে উঠবে সাম্যবাদ। এই সত্য এখন আর বিবাদপূর্ণ নয়। কারণ ইতোমধ্যে পৃথিবীর ⅓ অংশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে চলছে সাম্য-বাদের প্রস্তুতি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্য। পৃথিবীর বাকি অংশেও পুঁজিবাদ আজ সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এ কথা সত্য যে, এইসব সমাজতান্ত্রিক দেশে এখনই শ্রেণীভেদ সম্পূর্ণ দূর হয়ে যায়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়নি শ্রেণীহীন সমাজ। তবে, এখন সেখানে যা নেই তা হ'ল শ্রেণীশোষণ। আর নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বুর্জোয়া-শোষণের ভিত্তি ধসে পড়ায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির উপরি-কাঠামোও ক্রমেই ভেঙে পড়ছে, আর গড়ে উঠছে সর্বহারাশ্রেণীর সংস্কৃতির বুনিয়াদ।

পুঁজিবাদী সম্পর্কের বন্ধনমুক্ত হয়ে উৎপাদন শক্তির বিকাশ ঘটছে বৈপ্লবিক দ্রুত গতিতে। শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, যন্ত্রপাতি ও উন্নত কলা-কৌশলের প্রয়োগ বাড়ছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির হারও বেড়ে গেছে। ক্রমে উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছবে, যখন সমস্ত জনগণের সকল প্রয়োজন মিটানো সম্ভব হবে।

এখন পর্যন্ত যে সকল শ্রম কষ্টসাধ্য, ঘৃণা উদ্রেককারী বা বিরক্তিকর বলে মনে হয়, ক্রমে তা আর সে রকম থাকবে না। উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে তা হয়ে উঠবে সহজসাধ্য ও সম্মানজনক। গ্রাম ও শহরের পার্থক্য দূর হয়ে যাবে। শহরের আলাদা কোন আকর্ষণ থাকবে না। কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা হবে উৎপাদন পরিকল্পনারই একটি বিশিষ্ট অংশ।

শিক্ষাক্ষেত্রে মানসিক ও কায়িক শিক্ষার পার্থক্য দূর হয়ে যাবে। প্রতিটি নাগরিকের জন্য সম্পূর্ণ জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। আর তা হবে এমন এক শিক্ষা যেন জাতীয় প্রয়োজন ও শ্রমিকের প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে যে কোন মুহূর্তে যে কোন শ্রমিককে উৎপাদনের এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে সরিয়ে নেওয়া যায়। সব মিলিয়ে অদূর ভবিষ্যতে এইসব দেশে এক উন্নততর জীবনের বিকাশ হবে।

উৎপাদনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে প্রতিটি লোক তার নিত্যপ্রয়োজনায় দ্রব্যসামগ্রী যথেষ্ট পরিমাণে পাবে। তখনই সমাজ ঘোষণা করবে—"প্রতিটি লোকের কাছ থেকে তার সামর্থ্যমতো আর প্রতিটি লোককে তার প্রয়োজনমতো"। এর অর্থ, প্রতিটি লোক তার সামর্থ্যমতো সামাজিক উৎপাদনে অংশ নেবে, আর সমাজের কাছ থেকে সে তার প্রয়োজনমতো সব কিছুই পাবে। এই হল সাম্যবাদ, যেখানে সমাজ হবে—শোষণহীন ও রাষ্ট্রহীন।

সমাজ বিকাশের এক বিশেষ স্তরে (আদিম সাম্যবাদী সমাজের শেষ যুগে) সমাজের প্রয়োজনেই শ্রেণীভেদের সৃষ্টি হয়েছিল। তখন উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের জন্য তার প্রয়োজন ছিল। আবার, আজ সেই উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশের জন্যই শ্রেণীভেদ দূর হওয়া প্রয়োজন। তাই ভেঙে পড়বে শ্রেণীভেদ প্রথা, পত্তন হবে সাম্যবাদী সমাজ। কিন্তু, এই সাম্যবাদী সমাজ অবশ্যই আদিম সাম্যবাদী সমাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ও উন্নত হবে।

তা হলেই দেখা যাচ্ছে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ বাদ দিলে সমাজ বিকাশের ইতিহাস হল—শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। "শ্রেণী-সংগ্রামই ইতিহাসের আশু চালিকাশক্তি। বিশেষ করে বুর্জোয়া ও সর্বহারা শ্রেণীর মধ্যকার শ্রেণী সংগ্রাম আধুনিক সমাজ-বিপ্লবের চালকদণ্ড স্বরূপ।"[২]

অনেক সময় একটা ভুল ধারণা হয় যে, সমাজে শ্রেণী-সংগ্রামের অস্তিত্বের কথা মার্কসই সর্বপ্রথম বলেছেন। কিন্তু, তা নয়। মার্কস নিজেই বলেছেন, "আমার কথা বলতে গেলে কি, আধুনিক সমাজে শ্রেণী-অস্তিত্ব ও তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব আমার প্রাপ্য নয়। আমার অনেক আগেই বুর্জোয়া ঐতিহাসিকগণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক বিকাশ সম্বন্ধে বলে গেছেন। এবং বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা শ্রেণীগুলির অর্থনৈতিক গঠন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে গেছেন। নতুন করে আমি যা দেখিয়েছি তা হল—(১) একমাত্র উৎপাদন বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরের সঙ্গেই শ্রেণীগুলির অস্তিত্ব সংযুক্ত হয়ে আছে। (২) শ্রেণী-সংগ্রাম নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই সর্বহারার একনায়কত্বের সূচনা করে, (৩) আর একমাত্র এই একনায়কত্বই শ্রেণীভেদ বিলোপ করে এবং শ্রেণীহীন সমাজ পত্তনের অন্তবর্তী গঠনকার্য করে থাকে।"[৩]

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা শ্রেণী সংগ্রামকে স্বীকার করে; কিন্তু, তার পরিণতিতে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে মানতে তারা নারাজ। সর্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রশক্তি দখল করে নেবে. এই চিন্তা বুর্জোয়া পণ্ডিত ও তাত্ত্বিকদের কাছে একটা বিভীষিকা। তারা জানে যে, এই রাষ্ট্রশক্তি তাদের দখলে আছে বলেই তারা জনগণের উপর তাদের শোষণ বজায় রাখতে পারছে। তাই, তারা শ্রেণীদ্বন্দ্বকে স্বীকার করেও বিপ্লবকে স্বীকার করে না। তারা এই মিথ্যা মোহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়েই শান্তিপূর্ণ উপায়ে শ্রেণীদ্বন্দ্বের অবসান সম্ভব।

তাই, তারা সমাজের শ্রেণী-দ্বন্দ্বকে সব সময় অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চেষ্টা করে। তারা সব সময় এই চেষ্টাই করে, যেন সর্বহারা-শ্রেণী শ্রেণী-

শোষণের রাজনৈতিক চরিত্র বুঝতে না পারে। আর, তাই সব সময় তাদের উপদেশ দেয় রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে।

বামপন্থী নামধারী কিছু কিছু সুবিধাবাদীও বুর্জোয়াশ্রেণীকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। "সুবিধাবাদ শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বীকৃতিকে তার চূড়ান্ত বিন্দু পর্যন্ত, অর্থাৎ, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদে পরিবর্তন পর্যন্ত নিয়ে যায় না। কার্যতঃ, এই সময়টা অবশ্যই প্রচণ্ড শ্রেণী-সংগ্রামের অভূতপূর্ব কঠোর রূপ হবে। ফলে, এই সময়ের রাষ্ট্র হবে অবধারিতভাবে এক নতুন ধরনের গণতন্ত্র (সর্বহারা ও সাধারণ সম্পদ-হীনদের) এবং এ হবে এক নতুন ধরনের একনায়কত্ব (বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে)।"[৪]

সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণীকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে "মার্কসবাদকে শুধু শ্রেণী-দ্বন্দ্বের তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার অর্থ হল মার্কসবাদকে বিকৃত করা এবং তাকে বুর্জোয়াদের গ্রহণযোগ্য করে তোলা। একমাত্র তাকেই মার্কসবাদী বলা যায়, যে শ্রেণী সংঘর্ষের স্বীকৃতিকে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়।"[৫]

ফরাসী বিপ্লবের পতাকায় বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল,—"সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"। তাই দেখে বুর্জোয়া নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই মিলিত শক্তির রক্তঝরা লড়াই-এর ফলে সামন্ততন্ত্রের পতন হল। রাষ্ট্রশক্তি হল বুর্জোয়াশ্রেণীর করতলগত। বুর্জোয়াশ্রেণী তার বিপ্লবের মিত্রদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শুরু করল পুঁজিবাদী-শোষণ।

পুঁজিবাদী যুগে বুর্জোয়াদের শোষণের ফলে সমাজে নেমে এল দারিদ্র্য, অভাব, অশিক্ষা ও অস্বাস্থ্যের অভিশাপ। নির্যাতিত নিষ্পেষিত জনগণের দুঃখদৈন্যে ভরা কুঁড়েঘরের পাশে গড়ে উঠল মুষ্টিমেয় শোষকের প্রাচুর্য ও বিলাসের কল্পরাজ্য। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হতে লাগল ক্ষোভ আর অসন্তোষ। বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁদের ভয়,— এই ক্ষোভ না একদিন প্রচলিত ব্যবস্থাকেই ভেঙে ফেলে। তাঁরা পুঁজিপতিদের সাবধান করে দিলেন। অনুরোধ জানালেন, শোষণের মাত্রা সংযত করতে। কিছু কিছু সংস্কারপন্থী দাতব্য ব্যবস্থার সাহায্যে বঞ্চিতদের ক্ষোভকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। মোটকথা, তাঁরা কেউ রোগের কারণগুলির দিকে নজর দিলেন না। শুধু রোগের লক্ষণগুলি দূর করতে চাইলেন। অন্যভাবে বললে এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা বঞ্চিত-শ্রেণীর দৃষ্টি বঞ্চনার মূল কারণ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য ইচ্ছে করেই ঐ পথ নিয়েছিলেন। এঁরা নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে দাবী করতেন। এঙ্গেলস্ এঁদের নাম দিয়েছেন "কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রী।"

"কল্পনাবিলাসী সমাজতন্ত্রীরা মূল সমাধান বাতলাতে পারেননি। পুঁজিবাদ মজুরী-দাসত্বের প্রকৃত চরিত্র কি তাও তাঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। তাঁরা নির্ণয় করতে পারেননি পুঁজিবাদের বিকাশের নিয়মগুলি। আবার, কোন্ সামাজিক শক্তি নতুন সমাজ সৃষ্টি করতে সক্ষম তাও তাঁরা বুঝতে পারেননি।"৬

তাদের পক্ষে এ ছিল খুবই স্বাভাবিক। কারণ, তাঁরা শুরু করেছিলেন এই স্বতঃসিদ্ধ থেকে যে, পুঁজিবাদ চিরস্থায়ী। তাই, তাঁরা পুঁজিবাদ বজায় রেখে কি করে সংস্কারের সাহায্যে শোষিতশ্রেণীর দুঃখ দুর্দশা দূর করা যায়, তার পথ খুঁজে মরছিলেন। শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্বন্ধে তাদের যে কোন জ্ঞান ছিল না তা নয়। কিন্তু, তা সত্বেও এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলেই পুঁজিবাদ ভেঙে পড়তে বাধ্য, এ কথাটা তাঁরা বুঝতে পারেননি।

"মার্কসের প্রতিভার বিশেষত্ব এই যে তিনিই সর্বপ্রথম এই সকল ঘটনা (ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিপ্লব—লেখক) থেকে পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। আর সেই শিক্ষা সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সেই শিক্ষা হল—শ্রেণী সংগ্রাম।"৭

শ্রেণী সংগ্রামের দুই তত্ত্বের প্রয়োগ করে মার্কস দেখিয়েছেন,—মজুরী শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের এই দ্বন্দ্বের ফলেই পুঁজিবাদ ধ্বংস হতে বাধ্য, তার জায়গায় উদ্ভব হবে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পরিণতিতে আসবে সাম্যবাদ, অর্থাৎ শ্রেণীহীন শোষণহীন সমাজ।

মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বে মানব সমাজের ক্রমবিকাশের বিচার করলে দেখা যায়, "(জমিতে আদিম যৌথ মালিকানা লোপ হওয়ার পর থেকেই) সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরের সমগ্র ইতিহাসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস,—অর্থাৎ শোষক ও শোষিত, প্রভুত্বকারী ও তাদের পদানতদের সংগ্রামের ইতিহাস।"৮

আর প্রতিটি যুগ-সন্ধিক্ষণে এই সংগ্রাম এক একটি সমাজ বিপ্লবের সূচনা করেছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই শ্রেণী-সংগ্রামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই ব্যবস্থা "শ্রেণী দ্বন্দ্বকে সরলতর করেছে। গোটা সমাজ অধিক মাত্রায় দু'টি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জোটে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর যে দু'টি প্রধান শ্রেণী পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে তারা হল—বুর্জোয়া ও সর্বহারা।"৯

"শোষিতশ্রেণী এতদিন আত্মিক দাসত্বের মধ্যে মোহগ্রস্ত হয়ে ছিল। একমাত্র

মার্কসের দার্শনিক বস্তুবাদই সর্বহারাশ্রেণীকে এই মোহ থেকে মুক্তির পথ দেখাতে পেরেছে। পুঁজিবাদে সর্বহারাশ্রেণীর বাস্তব অবস্থান কোথায়,—একমাত্র মার্কসীয় অর্থনৈতিক তত্ত্বই তা ব্যাখ্যা করতে পারে।"১০

১—মার্কস, ২—ঐ, ৩—ঐ, ৪—লেনিন, ৫—ঐ, ৬—ঐ, ৭—ঐ, ৮—এঙ্গেলস,]
৯—কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো ১০—লেনিন।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ

গাঁয়ের মাঠে চাষী, খেতমজুর সারাদিন একহাটু কাদায় চাষের কাজ করেন। দিনের শেষে কোনদিন একমুঠো খেতে পান, কোনদিন পান না। বর্ষার রাতে তাঁদের ভাঙা কুঁড়েঘরে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে নিয়ে সারারাত ধরে জলে ভিজতে হয়। অথচ, গাঁয়ের জোতদার কোন পরিশ্রম করেন না, কেবলমাত্র জমির মালিকানার জোরে ফসলের বেশীরভাগ অংশই দখল করেন। সুদখোর মহাজন সামান্য টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদ আদায় করে। টাকার দায়ে চাষী, খেত-মজুরদের বাড়ী জমি দখল করে নেয়, তাঁদের সর্বস্বান্ত করে। তাঁরা সব হারিয়ে শহরে গিয়ে কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান। কাজ না পেলে ভিক্ষে করে দিন কাটান। কল-কারখানার শ্রমিকদের সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে হয়। তবু তাঁরা স্ত্রী-পুত্রের জন্য দু'বেলা দু'মুঠোর সংস্থান করতে পারেন না। তার উপর রয়েছে বেকারীর ভয়। কারখানার মালিক নিজের স্বার্থে যে কোন মুহূর্তে তাঁদের ছাঁটাই করতে পারেন। তখন উপবাসই হয় তাঁদের একমাত্র সম্বল। তাঁরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারেন না। অথচ, তাঁদের মালিকদের ছেলে-মেয়ে পড়তে যায় ইংলণ্ডে নয়ত আমেরিকায়।

এমনি হাজারো অন্যায়, অবিচার, অসাম্যের উদাহরণ রয়েছে আমাদের চার-পাশে। অথচ, নিপীড়িত, নিষ্পেষিত লোকগুলি ভাগ্যের দোহাই দিয়ে সবকিছু নীরবে মেনে নেয়। ভগবানের বিধান বলে সব মেনে নিয়ে জোড়হাতে আকাশের দিকে চেয়ে নালিশ জানায়, তবু রুখে দাঁড়ায় না প্রতিকারের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। কেন এমন হয়?

হয় এই জন্য, যে জন্ম জন্ম ধরে তাঁদের ভাগ্য ও ভগবানকে মানতে শেখানো হয়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে ভাববাদী জীবনদর্শন তাঁদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। সেই শিক্ষা হল—এক সর্বশক্তিমান অধ্যাত্ম পিতা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভবা, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ ও চারপাশের প্রকৃতির জন্ম দিয়েছেন ও পরিচালনা করছেন। জন্মান্তরবাদ ভাববাদী জীবনদর্শনের একটি বিশিষ্ট অংশ। তার শিক্ষা হল—ইহজন্মে মানুষ যে সুখ বা দুঃখ ভোগ করে তা সবই পূর্বজন্মের কর্মফলের ফলভোগ। আর যেহেতু পূর্বজন্মের কৃতকর্মের দ্বারা এই সুখ বা দুঃখ নিয়তি-

নির্দিষ্ট, সুতরাং শত চেষ্টায়ও এর পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই ধর্মপ্রাণ মানুষকে নির্বিবাদে মানতে হবে যে, অগণিত খেটে খাওয়া মানুষের উপর মুষ্টিমেয় শাসক ও শোষক শ্রেণীর শোষণ পীড়নের অধিকার ভগবানের বিধান ও পূর্বজন্মের কৃত-কর্মের দ্বারা স্থিরীকৃত সত্য। যুগ যুগ ধরে শাসক ও শোষক শ্রেণীর প্রসাদপুষ্ট পণ্ডিত ও দার্শনিকগণ নানা যুক্তি তর্ক, গল্প উপাখ্যানের সাহায্যে এই ভাববাদী জীবন দর্শনকে সমৃদ্ধ করেছেন। আর হাজার হাজার বছর ধরে লোকশিক্ষার সমস্ত উপায়গুলিকে (পাঠ, কথকতা, যাত্রা, নাটক ইত্যাদি) ব্যবহার করে শোষকশ্রেণী এই দর্শন গোটা সমাজের মজ্জায় মজ্জায় এমনভাবে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছে যে, আজকে বিজ্ঞান যখন ভাববাদী জীবনদর্শন থেকে পাওয়া অনেক কুসংস্কারকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছে, তখনও আমরা সেই মিথ্যা সংস্কারগুলিকেই আঁকড়ে ধরে থাকি।

শাসক ও শোষকশ্রেণী যে গভীর ধর্মবিশ্বাস ও ন্যায়নিষ্ঠা থেকে ভাববাদী দর্শনকে তুলে ধরে তা কিন্তু নয়। তারা তা করে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। তাদের উদ্দেশ্য হল—শোষিত জনগণকে ভগবান এবং পূর্বজন্ম ও পরজন্মের নামে এমন-ভাবে মোহগ্রস্ত করে রাখতে হবে, যাতে এই নিষ্ঠুর শোষণ-পীড়নের পিছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা তারা জানতে না পারে। কারণ, তারা জানে, একবার এই বিশাল বঞ্চিত খেটে খাওয়া মানুষ যদি সেই সত্য জানতে পারে, তবে তারা তাদের মিলিত কঠিন আঘাতে সুবিধাভোগীদের সুখের প্রাসাদ গুঁড়িয়ে দেবে।

ভাববাদী বিশ্বদর্শনের মূল কথা হল—(১) এই বিশ্বপ্রকৃতির উপরে রয়েছে এক সর্বশক্তিমান. সর্বজ্ঞ আধ্যাত্মিক শক্তি। তারই নির্দেশে ঘটছে—জন্ম, স্থিতি, লয়। সমাজে ধনী দরিদ্রের প্রভেদ তারই নির্দেশে সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ এর প্রতিকার করতে অক্ষম। তাই, ধর্মপ্রাণ মানুষের কর্তব্য হবে—"সবই তাঁর ইচ্ছা" বলে সব অন্যায় মেনে নেওয়া--নির্বিবাদে সব সহ্য করা। (২) মানুষের মন ও আত্মা মুক্ত ও অবিনশ্বর। তার উপর পৃথিবীর কোন বস্তু বা ঘটনার কোন প্রভাব নেই। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হবে—এই মুক্ত আত্মাকে সংসারের দৈনন্দিন ক্ষুদ্র স্বার্থ-সংঘাত থেকে মুক্ত রাখা। (৩) আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ যা ঘটছে তাই সত্য নয়। অনাদি অনন্ত সত্য রয়েছে আরো গভীরে। সেই সত্য রহস্যময়, আর আমরা তা জানতে পারি না। আমাদের চোখের সামনে যা ঘটছে সে সবই মায়া। শ্রমিকের শিশুটি যখন বিনা চিকিৎসায় মারা যায়, তখন তা মায়ারই প্রকাশ। সুতরাং মায়ার পিছনে না ঘুরে অনন্ত সত্য জানতে হবে। তার জন্য চাই নির্লিপ্ত মন আর নিরাসক্ত কর্ম। সুতরাং, হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা

উৎপাদন করে যাও—কিন্তু খেতে চেয়ো না, জোতদার ও মালিকদের ধন দৌলতের দিকে ভুলেও চেয়ে দেখো না। কারণ ওসব মায়া, মায়া, মায়া।

স্বভাবতই এই জীবনদর্শন মানুষের দৃষ্টিকে বাস্তব সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। সে হয়ে পড়ে ভাগ্যের উপর নির্ভরশীল; হারিয়ে ফেলে আত্মবিশ্বাস এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি।

এই পুস্তকের পূর্ববর্তী চারটি অধ্যায়ে মানবের বিকাশ এবং মানব সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাতে স্পষ্ট দেখা যায় যে, এদের বিকাশের কোন স্তরেই কোন অতিপ্রাকৃত অধ্যাত্ম-শক্তির কোন হাত ছিল না। সুতরাং, ভাববাদী জীবনদর্শনের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

মানবের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান ছিল খুবই কম। তাই, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যেমন, ঝড় জল, বজ্রপাত, ভূমিকম্প, দাবানল প্রভৃতি তাদের মনে ভয় ও বিস্ময় জাগাত। সেই ভয় থেকে মানুষ প্রকৃতি ও তার শক্তিগুলিকে সন্তুষ্ট করার জন্য পূজা করতে শুরু করেছিল। তখন তারা মনে করত এদের পেছনে রয়েছে এক অদৃশ্য শক্তি। কালক্রমে সেই কাল্পনিক শক্তিই ভগবান রূপে পূজা পেতে লাগল।

মানব বিকাশের এক স্তরে সমাজ শ্রেণী বিভক্ত হয়ে পড়ল। সৃষ্টি হল প্রধানতঃ দুটি শ্রেণী—একদল কাজ করে, উৎপাদন করে; আর একদল কাজ না করে প্রথম দলকে শোষণ করে বেঁচে থাকে এবং তারা তা করতে পারে উৎপাদনের উপাদান অর্থাৎ, জমি, যন্ত্রপাতি এমনকি শ্রমকারী মানুষ ইত্যাদির উপর তাদের মালিকানার জোরে। কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল নিতান্ত নগণ্য। তাই শোষণ বজায় রাখতে তাদের ছল চাতুরীর আশ্রয় নিতে হয়। প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলির প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ভয়মিশ্রিত বিস্ময়কে মূলধন করে শোষক শ্রেণীর আশ্রিত পণ্ডিতগণ এক ভাববাদী দর্শন গড়ে তোলেন। এইসব আশ্রিত পণ্ডিত ও দার্শনিকরা নানা গল্প উপাখ্যান ও নীতি বাক্যের মাধ্যমে গড়ে তোলে এক বিশাল ভাববাদী দর্শনের পরিমণ্ডল। তারা প্রচার করে—সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার বিধান মতই শোষকরা শোষণের অধিকার পেয়েছে। এর বিরুদ্ধাচরণ সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণের সামিল। এবং তা করলে সৃষ্টিকর্তার বজ্ররোষ নেমে আসব বিরুদ্ধবাদীদের মাথায়। তারা লোকের মনে এই ধারণাও ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে—'মন'ই সব কাজের পরিকল্পনা করে, আর শ্রমিক কায়িক শ্রম দ্বারা তা কার্যে পরিণত করে মাত্র। সুতরাং, পরিকল্পনাকারী মনই সমস্ত উৎপাদনের উৎস; সমস্ত উন্নতির জন্য দায়ী।

শোষকদের প্রয়োজন অনুযায়ী এরা যুগে যুগে ধর্মকে নতুন নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করে। আর এর মধ্যেই মানুষ বাস করছে হাজার হাজার বছর ধরে। ফলে তাদের মন সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভাববাদী জীবনদর্শনের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আছে। এমনকি আধুনিক কালের অনেক উচ্চশিক্ষিত বৈজ্ঞানিকগণও এর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন না। ইতিহাস বলে, বিভিন্ন সময়ে কিছু কিছু স্বাধীনচেতা চিন্তাবিদ অবশ্য এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, এর জন্য শাসক ও শোষকশ্রেণীর হাতে তাঁদের বরণ করতে হয়েছে চূড়ান্ত লাঞ্ছনা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত।

মার্কস তাঁর সারা জীবন এই ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, আমাদের জীবনে প্রতিদিনের ঘটনার পিছনে কোন অতি-প্রাকৃত শক্তি কাজ করে না। 'মন' বা 'আত্মা' নয়, বস্তুই সবকিছু নির্ণয় করে। এই প্রকৃতি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বস্তু ও ঘটনার সমষ্টি নয়। এদের প্রত্যেকটি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তিনি যে বিশ্বদর্শন প্রচার করেন তা হল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মতে (১) প্রকৃতি ও তার ঘটনাবলীর মূল ভিত্তি হল বস্তু (২) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতেই এই সত্য ব্যাখ্যা করা যায়।

মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ শুধু একটি বিশ্বদর্শন নয়, এ একটি জীবনদর্শন—তার চেয়েও বেশী, একটি বাস্তব কর্মনির্দেশ। তাই, মার্কসবাদ সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর জীবনদর্শন—তাদের সংগ্রামের দিগ্‌দর্শন,—পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বাস্তব পথ-প্রদর্শক।

বস্তুবাদের মূলতত্ত্ব ঃ

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল তত্ত্বগুলি হল—

(১) আমাদের জগৎ নিজেই (প্রকৃতিগতভাবে) বস্তু বা পদার্থ। জগতের বিভিন্ন বস্তুগুলি গতিশীল (অর্থাৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল) পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। জগতের প্রতিটি বস্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। এই সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার নিয়ম মেনেই জগতের বিকাশ ঘটে। একে ব্যাখ্যা করতে কোন অতিপ্রাকৃত "সর্বশক্তিমান অধ্যাত্মশক্তির" আমদানি করার প্রয়োজন হয় না। ভাববাদী দার্শনিকগণ কিন্তু, উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাই করে থাকে। কারণ, তবেই তাঁর নাম করে শোষিত জনগণকে মোহগ্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রাখা সহজ হয়।

দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের এই তত্ত্বের শিক্ষা হল—সমাজের প্রতিটি ঘটনা পরস্পর

সম্পর্কযুক্ত। কোন ঘটনাই বিচ্ছিন্নভাবে বা হঠাৎ ঘটে না। ঘটনাবলীর গতি একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে। এককভাবে কোন কিছুকে বিচার করলে চলবে না। সমাজের বিভিন্ন শক্তি ও বস্তুর অবস্থান ও প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে তবে তাকে বিচার করতে হবে।

যেমন, কোন একটি কারখানার মালিক দয়ালু, সে তার শ্রমিকদের শোষণ করে না—একথা মার্কসবাদসম্মত নয়। কারণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মূল ভিত্তিই হল শোষণ। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত মালিকই শ্রমিকদের শোষণ করতে বাধ্য। আর শ্রমিকদের শোষণ করেই সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ছাড়া কখনই শোষণের শেষ হতে পারে না। অর্থাৎ, যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং মালিক হিসাবে পুঁজিপতিদের কোন অস্তিত্ব থাকবে না, তখনই শোষণের অবসান হবে।

(২) সমস্ত জগতের সমস্ত বস্তু, প্রাণী ও প্রকৃতির অস্তিত্ব কখনই মানুষের 'চেতনা' বা 'মনের' উপর নির্ভরশীল নয়। যখন মানুষ ছিল না, মানুষের 'মন' ছিল না, তখনও তারা ছিল, এখনও রয়েছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। বস্তুই হল মৌলিক জিনিস। মানুষের অনুভূতি, চেতনা ও কল্পনা বস্তুকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠে। সুতরাং অনুভূতি, চেতনা ও কল্পনা গৌণ, কারণ, এইগুলি বস্তুরই প্রতিফলন মাত্র। আবার, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি যে মস্তিষ্কের কাজের ফল সেই মস্তিষ্ক নিজেই একটি বস্তু, কারণ, বস্তুর চূড়ান্ত পরিণতিতেই মানুষের মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং চিন্তা ও কল্পনাকে কোন ভাবেই বস্তু থেকে আলাদা করা যায় না। "মানুষের চৈতন্য তার অস্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রিত করে।"[১]

বস্তু জগৎই চেতনার উৎস এবং বস্তুকে কেন্দ্র করেই চিন্তা ও কল্পনার উদ্ভব হয়। আবার, কল্পনা ও চিন্তার সাহায্যেই গড়ে উঠে সামাজিক ধ্যান-ধারণা, মতবাদ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। সুতরাং, এইগুলিতে বস্তুর প্রতিফলন হতে বাধ্য। আবার, তাদের উদ্ভব ও বিকাশ উভয়ই সমাজের মধ্যেই ঘটে। সুতরাং, যে সমাজের মধ্যে এইগুলি রয়েছে সেই সমাজের প্রকৃত বস্তুগত অবস্থার প্রতিফলন তাদের উপর পড়তে বাধ্য। তাই সমাজের বস্তুগত জীবন-অবস্থা অনুসারেই সমাজের ধ্যান-ধারণা, মতবাদ, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠে। আর এদের কাঠামোও হয় সেই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।

এই তত্ত্ব থেকে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর শিক্ষা হবে—শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে

বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা পুঁজিবাদী সমাজের বস্তুগত অবস্থারই প্রতিফলন। বুর্জোয়া সমাজের বিবাহ, উত্তরাধিকারী, বিচার ব্যবস্থা, রাষ্ট্র কাঠামো এ সবই ব্যক্তিগত মালিকানার অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে। সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেই এদের পরিবর্তন সম্ভব। সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীকে আরো বুঝতে হবে যে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক-হীন "বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি" বা কোন "মহামানবের" সদিচ্ছার দ্বারা এই পরিবর্তন সম্ভব নয়।

মার্কসবাদ আরও বলে যে, সমাজের বস্তুগত অবস্থা যেমন সামাজিক ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ইত্যাদিকে প্রভাবিত করে, তেমনি এর বিপরীতটাও সত্য। অর্থাৎ, প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ইত্যাদি সমাজের বৈষয়িক পরিবর্তনের প্রেরণার উৎস। অবশ্য এইসব প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা, মতবাদ ইত্যাদি তখনই আত্মপ্রকাশ করে, যখন সমাজের ক্রমবিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজের বস্তুগত অবস্থার পরিবর্তন একটি আবশ্যিক সামাজিক প্রয়োজন হিসাবে দেখা দেয়। সেই সময়, এই মতবাদে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয় দাবীগুলিই প্রতিফলিত হয়। আর একবার এইরূপ মতবাদের উদ্ভব হলে, তখন তা সমাজ-বিপ্লবের অপ্রতিহত শক্তিরূপে কাজ করে। কারণ "যে মুহূর্তে একটি মতবাদ জনগণকে আকৃষ্ট করে, তখন থেকেই তা একটি বাস্তব শক্তিতে পরিণত হয়।"[২]

সুতরাং সমাজ বিপ্লবের গতিবেগকে দ্রুত ও নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীকে একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ গ্রহণ করতে হবে। আর সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ধ্বংস করে, সমাজের বস্তুগত অবস্থার উন্নতির জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে এই মতবাদের পিছনে সংগঠিত করতে হবে। মার্কসবাদ সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীকে এই শিক্ষাই দেয়।

(৩) জগৎ ও তার বিকাশের নিয়ম সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞানই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ কার্যকরভাবে প্রমাণ করেছে যে, আমরা প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে যে জ্ঞান আজ পর্যন্ত আয়ত্ত করেছি তা সঠিক ও নির্ভুল। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান এখনও আমরা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করতে পারিনি। তবে, ক্রমে ক্রমেই মানুষের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা বেড়েই চলেছে।

উপরের ৩টি থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আমরা সমাজ বিকাশের নিয়ম জানতে পারি। পর্যবেক্ষণ দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শক্তিগুলির গতি-প্রকৃতিও আমরা সঠিকভাবে জানতে সক্ষম। সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর কাজ হবে, সেই

জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কর্মপন্থা স্থির করা। মোট কথা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, মতবাদ ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে সংযোগ ও সঙ্গতি সাধন করাই হবে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর প্রধান কাজ।

দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি ঃ

মার্কসবাদ যে বিচার-পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা হল দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রকৃতি ও তার বস্তুগুলি সর্বদা পরিবর্তনশীল ও গতিময়। আর তাদের মধ্যে রয়েছে এক স্ববিরোধ বা অন্তর্দ্বন্দ্ব। এর ফলেই বস্তুর পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটছে।

এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(১) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মতে,—প্রকৃতির কোন বস্তু বা ঘটনাকে তার পারিপার্শিক অবস্থা থেকে আলাদা করে দেখলে তাকে সঠিক বোঝা যায় না। তখন তাকে আপাত মূল্যহীন বলে মনে হয়। কারণ, প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি ঘটনা তার আশে পাশের বস্তু ও ঘটনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে যুক্ত। এদের প্রতিটি অপরগুলি দ্বারা সব সময়ই প্রভাবিত হয়। সুতরাং সমাজের কোন ঘটনাকে বিচার করতে হলে তাকে তার পরিবেশের মধ্যে রেখে বিচার করতে হবে।

এই সূত্র থেকে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীকে এই শিক্ষাই নিতে হবে যে সমাজ বিকাশের ইতিহাস ও সমাজবিপ্লবের ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি নয়। সমাজের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে, আবার, যে যে বাস্তব অবস্থা এদের বিকাশে সাহায্য করছে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে এদের বিচার করতে হবে। 'অনাদি অনন্ত ন্যায়-বিচার' বা অনুরূপ পূর্বধারণা দ্বারা বিচার করলে চলবে না।

যেমন দাস ব্যবস্থার উদ্ভব বুঝতে হলে বুঝতে হবে আদিম যৌথ সমাজের সেই সময়কার অবস্থা। ঐ সময়ে উৎপাদন শক্তির বিকাশের ফলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে, দাস-ব্যবস্থার সমাজই তখন তার সঙ্গে খাপ খেত। আবার একই কারণে, উৎপাদনশক্তির আজকের এই উন্নততর অবস্থায় দাস-ব্যবস্থা আবার ফিরে আসতে পারে না। তাই, পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে যেতে হলে, পুঁজিবাদী সমাজের আজকের বাস্তব অবস্থা বিচার করেই কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

(২) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মতে,—বস্তুকে শুধু তার পারস্পরিক সম্পর্ক দিয়ে বিচার করলে চলবে না,—তাকে বিচার করতে হবে তার গতির অর্থাৎ, পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে। কারণ, প্রতিটি বস্তুর স্বাভাবিক ধর্মই হল গতি। বস্তু নিয়ত

গতিশীল, পরিবর্তনশীল। প্রকৃতিতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বস্তু জন্ম নিচ্ছে, বর্তমান বস্তুগুলি বিকাশ লাভ করছে, আবার কিছু কিছু বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। সুতরাং, দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতিতে বস্তুর উদ্ভব, বিকাশ ও লয় সব কয়টিই আলোচনা করতে হবে। সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে সেই সব বস্তু ও শক্তির উপর যা নতুন করে উদয় হচ্ছে বা বিকাশ লাভ করছে।

এই সূত্র থেকে সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণী এই শিক্ষাই গ্রহণ করে যে,—পৃথিবীতে কোন সমাজব্যবস্থাই অপরিবর্তনীয় নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'অনাদি অনন্ত ধারণা' বা শোষণের 'অপরিবর্তনীয় বিধান' কখনই সত্য হতে পারে না। এমন এক সময় ছিল যখন মনে করা হত - সামন্তপ্রথাই চিরকাল চলবে। তখন প্রচার করা হত যে, ভূমিদাসদের শোষণ করার অধিকার ভগবানই জমিদারদের দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ বিকাশের ফলে তা আজ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার বর্তমানে বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে পুঁজিবাদী চিরস্থায়ী হতে বাধ্য। তারা নানা যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চান যে, শ্রমিকদের নিংড়ে পুঁজিপতিরা ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়িয়ে চলবে—এর ব্যতিক্রম কখনই হতে পারে না। কিন্তু ১৯১৭ সালের রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব এই ভুল তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ থেকে পুঁজিবাদ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সুতরাং, সমাজবাদ যে একদিন গোটা পৃথিবী থেকে পুঁজিবাদকে স্থানচ্যুত করবে,—এখন তা আর অলস-কল্পনা নয়। আর একটি শিক্ষা হল—বর্তমান যুগে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীই এখন একমাত্র উদীয়মান শ্রেণী। বুর্জোয়া ও অন্যান্য শ্রেণী ক্রমেই ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং, সমাজ পরিবর্তনের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর উপরই নির্ভর করতে হবে।

(৩) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মতে,—বিকাশের অর্থ শুধু একই চক্রাকারে ক্রমাবর্তন নয়, একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নয়। ক্রমবিকাশের অর্থ হল উন্নত থেকে উন্নততর স্তরে বিকাশ। এ হল পূর্ববর্তী গুণগত অবস্থা থেকে নতুনতর ও উন্নততর গুণগত অবস্থায় পরিবর্তন। এই সূত্রমতে—কোন একটি বস্তুতে তার অন্তর্নিহিত বা বাইরে থেকে প্রযুক্ত শক্তি বা গতির পরিমাণ ক্রমাগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বাড়তে বা কমতে থাকলে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয়, যখন বস্তুটির অবস্থাগত এবং গুণগত পরিবর্তন হয়। একেই বলে পরিমাণগত পরিবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তন। যেমন ক্রমাগত উত্তাপ বাড়তে থাকলে জল এক সময় বাষ্পে পরিণত হয়—আবার একই জল ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে এক সময় জমে বরফ হয়ে যায়। বাষ্প ও বরফের অবস্থাগত ও গুণগত ধর্ম জল থেকে ভিন্ন। আবার, এই গুণগত পরিবর্তন কিন্তু আস্তে আস্তে হয় না। পরিবর্তনের নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে তার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে।

এই সূত্রের আরো একটি বক্তব্য হল—পুরাতনকে অস্বীকার করে, পুরাতনকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে তবে নতুনের আবির্ভাব ঘটে। "কোন ক্ষেত্রেই পুরাতন অবস্থাকে বাতিল না করে কোন বিকাশ ঘটতে পারে না।"৩ আবার বিপ্লব শুধু ধ্বংস নয়, বিপ্লব হল উন্নততর নতুনের বিকাশ। অবশ্য, পরবর্তী বিকাশের ফলে এই নতুনও ক্রমে পুরাতন হয়ে পড়ে। তখন তারও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

আবার অনেক সময় এমনও হয় যে, কোন একটি প্রথা বাতিল হয়ে গেল। পরে আবার সেই বাতিলকারী ব্যবস্থাও ক্রমবিকাশের ফলে নিজেই বাতিল হয়ে গেল এবং পুরাতন প্রথাই ফিরে এল। এমতাবস্থায় নূতন প্রথাটি পূর্বতন প্রথা থেকে অবশ্যই অনেক উন্নততর স্তরের হতে বাধ্য। একেই বলে বাতিলকারীকে বাতিল করার নীতি।

যেমন, আদিম যৌথ সমাজ ব্যবস্থায় সমাজে কোন শ্রেণীভেদ ছিল না। দাস-ব্যবস্থায় সমাজ শ্রেণীবিভক্ত হয়ে পড়ল। আবার, বিকাশের বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে পুঁজিবাদী সমাজের অবসানে সমাজে শ্রেণীভেদ দূর হয়ে যাবে ; পত্তন হবে সাম্যবাদী সমাজ, শ্রেণীহীন সমাজ, কিন্তু এই সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজ নিশ্চয়ই অনুন্নত আদিম সাম্যবাদী শ্রেণীহীন সমাজের চাইতে অনেক উন্নত স্তরের সমাজ হবে।

এই সূত্র থেকে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর শিক্ষা হবে, পুঁজিবাদ থেকে সমাজ-তন্ত্রে উত্তরণ হল গুণগত পরিবর্তন। আর এই গুণগত পরিবর্তন একমাত্র বৈপ্লবিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। সংস্কারের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণী কখনই পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারবে না। সুতরাং, সুসংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর পথ কখনই সংস্কারের পথ নয়, বিপ্লবের পথই তাদের পথ।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটে। এই পরিমাণগত পরিবর্তন এক সময়ে গুণগত পরিবর্তনের বিন্দুতে পৌঁছবে। সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর কাজ হবে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের ক্ষণটিকে ত্বরান্বিত করা।

(৪) দ্বন্দ্বমূলক পদ্ধতির মতে,—প্রতিটি বস্তু ও ঘটনার মধ্যে পরস্পর বিরোধী ধর্ম বর্তমান। এই পরস্পরবিরোধী ধর্ম আছে বলেই বস্তু ও ঘটনার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকে। তাই অন্তর্দ্বন্দ্বই সমস্ত পরিবর্তনের জন্য দায়ী। অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলেই পরিমাণগত পরিবর্তন গুণগত পরিবর্তনের রূপ নেয়। সুতরাং, মূল কথা হল—বস্তুর অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বই বস্তুর নিম্নতর অবস্থা থেকে উচ্চতর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য দায়ী।

এই সূত্র থেকে সংগঠিত সর্বহারাশ্রেণী শিক্ষা গ্রহণ করবে যে, সমাজ বিকাশের প্রতি স্তরে (আদিম যৌথ সমাজ ছাড়া) শ্রেণীদ্বন্দ্ব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব খুবই স্বাভাবিক। আর এই দ্বন্দ্বের ফলেই পুঁজিবাদের অবসান হবে, আর তার কবরের উপর গড়ে উঠবে সমাজতন্ত্র এবং অবশেষে সাম্যবাদ।

সুতরাং, সর্বহারাশ্রেণী নিজের স্বার্থেই এই দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাবে। একে কমিয়ে না এনে বরং বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করবে, যেন বৈপ্লবিক গুণগত পরিবর্তন এগিয়ে আসে। সংস্কারপন্থী ও সংশোধনবাদীদের শ্রেণী-সমন্বয়ের মতবাদ কখনই মার্কসবাদসম্মত নয়। তাই, শ্রেণী সমন্বয়ের নীতি কখনই সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর নীতি হতে পারে না। তাদের নীতি হবে শ্রেণী বিরোধিতার নীতি, শ্রেণী সংগ্রামের নীতি।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ঃ

মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে একটি বিশ্বদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি একে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানবের বিকাশের ইতিহাস ও সেই সঙ্গে মানব সমাজের বিকাশের ইতিহাসও এই দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তত্ত্ব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা যায়। মানবের বিকাশ ও সেই সঙ্গে সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির বিকাশের ইতিহাস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই বলা হয়—**ঐতিহাসিক বস্তুবাদ**।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ শুধু সমাজ ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির অতীত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করেই তার কর্তব্য শেষ করে না। এই তত্ত্ব ভবিষ্যৎ সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো সম্বন্ধেও নির্দেশ দেয়। ঐতিহাসিক বস্তুবাদের ধারা প্রয়োগ করে মার্কস বলেছিলেন যে, পুঁজিবাদ ভেঙে পড়তে বাধ্য এবং তার জায়গায় দেখা দেবে সমাজতন্ত্র। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় তার সূচনা হয়। আজ পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ পুঁজিবাদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। অন্যান্য অনেক দেশেই এখন সর্বহারা ও পুঁজিপতিদের দ্বন্দ্ব বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের মুখে।

ইতিহাস সম্বন্ধে বুর্জোয়া ঐতিহাসিকদের সঙ্গে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গির মূল পার্থক্য হল—বুর্জোয়াদের মতে ইতিহাস হল কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার বিবরণ। তাদের একমাত্র যোগসূত্র হল সময়, অর্থাৎ সময়ের হিসাবে এদের একটা আর একটার পরে ঘটেছে। কিন্তু, মার্কসের মতে, ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এমনকি অতীতের ঘটনার সঙ্গে বর্তমান ঘটনার যেমন সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি

ভবিষ্যতের ঘটনার উপরও বর্তমানের ঘটনার প্রভাব পড়বে। বুর্জোয়া ইতিহাস প্রধানত হল বিভিন্ন রাজার রাজত্বকালের ঘটনাবলীর বিবরণ। তাতে আছে কি করে রাজা রাজ্য পেল,—দিগ্বিজয়ের নাম করে অন্য কত রাজার রাজ্য দখল করল —তার ক'টা রানী ছিল, রাজা কোন্ রানীকে বেশী ভালবাসতেন—রাজা কোন্ ঋষির শিষ্য ছিলেন বা কোন্ ধর্মমতে বিশ্বাস করতেন—সেই ধর্মমত বিস্তারের নাম করে কত লক্ষ লোক খুন করে বিখ্যাত হয়েছেন—কোন রাজপরিবার কতদিন রাজত্ব করল, তারপরই বা কোন্ রাজপরিবার সেই রাজ্য দখল করল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। রাজার সঙ্গে সঙ্গে তার আমির. ওমরাহ্ ও সেনাপতিগণও মাঝে মাঝে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু, যে অগণিত সাধারণ মানুষ প্রতিদিন সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রেখেছে, রাজা উজিরদের বিলাসের সামগ্রী জুগিয়েছে, তাদের কোন কথা নেই সে ইতিহাসে। এ কথা সত্য যে জনগণ রাজা বদলের কোন ঘটনা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায়নি। কারণ, তারা জানে যে রাজা পাল্টালেই সমাজের শোষণ ব্যবস্থা পাল্টায় না। কিন্তু দাস-ব্যবস্থার সময় থেকে আজ পর্যন্ত শোষিত সাধারণ মানুষ বার বার শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। সময় সময় সশস্ত্র বিদ্রোহ পর্যন্ত করেছে—অনেক রক্ত ঝরিয়েছে। বুর্জোয়া ইতিহাস লেখকদের মতে এগুলি হল ক্ষমতাবান রাজার বিদ্রোহী প্রজাদের ঢিট করার ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মার্কসই সর্বপ্রথম এই সব ঘটনাকে একটি বৈজ্ঞানিক যোগসূত্রে গেঁথেছিলেন। আর তা করেছিলেন ঐতিহাসিক বস্তুবাদের তত্ত্বের ভিত্তিতে।

প্রশ্ন হল, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল আলোচ্য বিষয় কি ?

মানুষকে নিয়েই সমাজ এবং মানুষের জন্যই সমাজ। তাই, মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে সমাজের অস্তিত্ব অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে চাই খাদ্য. বস্ত্র আশ্রয় ও উৎপাদনের যন্ত্রপাতি। মানুষই সমাজবদ্ধ হয়ে এই সব সংগ্রহ করে বা উৎপাদন করে; সমাজবদ্ধভাবে এইসব ভোগ করে। আবার উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধতির উপর সমাজের বৈষয়িক জীবনযাত্রা নির্ভর করে। যেমন আদিম, যৌথ সমাজ ব্যবস্থার যুগে উৎপাদন শক্তি ও পদ্ধতি ছিল অনুন্নত তাই সমাজের বৈষয়িক জীবন ছিল খুবই নিম্নমানের। তবে, তখন যৌথ উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল। ফলে সমাজের প্রতিটি সভ্যের জীবন যাত্রার মানের মধ্যে অনেকখানি সমতা ছিল। কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও পদ্ধতির অভূতপূর্ব বিকাশ হয়েছে। সমাজের বৈষয়িক জীবনও হয়েছে খুবই উন্নত। অথচ, কতিপয় সম্পদশালী ব্যক্তিগত মালিকানার দৌলতে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একাধিপত্য

করছে। ফলে, তাদের জীবনযাত্রার মান খুবই উন্নত। অথচ, যারা সামাজিক সম্পদ উৎপন্ন করছে, সেই অগণিত সম্পদহীন সর্বহারা নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারছে না।

সমাজের প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের উপর সমাজের বৈষয়িক জীবন অর্থাৎ সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার প্রতিফলন হয়। সুতরাং, সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিহাস আলোচনা করার অর্থ হল—সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করা। সুতরাং ঐতিহাসিক বস্তুবাদের মূল আলোচ্য বিষয় দাঁড়াল—"সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস" আলোচনা করা।

এখন প্রশ্ন হল—উৎপাদন কি?

জীবন ধারণের জন্য, অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষের চাই বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী। যেমন, খাদ্যের জন্য চাই ফল-মূল, শস্য, মাংস ইত্যাদি, আশ্রয়ের জন্য চাই ঘর-বাড়ি ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্রকৃতিতে রয়েছে বিভিন্ন বস্তু ও শক্তি। আর মানুষের রয়েছে শ্রম করার শক্তি অর্থাৎ শ্রমশক্তি। আলাদা আলাদা ভাবে এর কোনটাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না। প্রকৃতির বস্তু এবং শক্তি এবং মানুষের শ্রমশক্তি এই দু'এর মিলন হলে তবেই দ্রব্যসামগ্রী তৈরি হতে পারে। প্রকৃতির বস্তু ও শক্তির উপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করার প্রক্রিয়ার নামই **উৎপাদন**। সুতরাং উৎপাদনের মূল উপাদান হল দু'টি—**প্রকৃতি ও শ্রমশক্তি**।

প্রকৃতির গাছে রয়েছে ফল। মানুষ শ্রম করে গাছে উঠে সেই ফল নিয়ে আসে; তবে সেই ফল মানুষের ক্ষুধা মিটাতে পারে। অভিজ্ঞতায় মানুষ জেনেছে—প্রকৃতির মাটিতে বীজ থেকে চারা গাছ জন্মানোর শক্তি আছে; জল ও সূর্যের উত্তাপে সেই চারা গাছকে বাড়িয়ে তোলার শক্তি আছে। গাছ বড় হলে তাতে ফসল হয়। আর সেই ফসলে আছে মানুষের ক্ষুধা মিটানোর ক্ষমতা। তাই, মানুষ প্রকৃতির জমি চাষ করে, তাতে শস্যবীজ লাগায়, তবে শস্য গাছের চারা হয়। জল দিয়ে মানুষ তাকে বাঁচিয়ে রাখে, তবে তা থেকে শস্য হয়। মানুষ সেই শস্য খাদ্য হিসাবে ভোগ করে।

সুতরাং, উৎপাদন করতে হলে প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের কিছু প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে। আর মানুষকে আয়ত্ত করতে হবে প্রকৃতির উপর নিজের শ্রম প্রয়োগ করার কৌশল। তাই, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 'মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা সংযোগ বা সম্পর্ক' অবশ্যই থাকবে।

আবার "মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে এবং প্রকৃতির শক্তিকে নিজের বাস্তব প্রয়োজনে লাগায়। কিন্তু, এই সংগ্রাম মানুষ একা একা করে না, ব্যক্তিগতভাবে করে না, করে একসঙ্গে, দলবদ্ধভাবে, সমাজবদ্ধভাবে।"[৪] "উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষ শুধু প্রকৃতির উপরই কাজ করে না, একে অপরের উপরও কাজ করে। কোন না কোন প্রকারের সহযোগিতা করেই এবং পরস্পরের কাজের ফল আদানপ্রদান করেই তারা উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদন করতে হলে একের সঙ্গে অপরের নির্দিষ্ট সংযোগ ও সম্পর্ক বজায় রেখেই প্রকৃতির উপর তাদের কাজ অর্থাৎ উৎপাদন পরিচালিত হতে পারে।"[৫] "তাই, সর্বকালে, সর্বসময়ে উৎপাদন বলতে সামাজিক উৎপাদনই বুঝায়।"[৬] সুতরাং, উৎপাদন প্রক্রিয়ায় "মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ ও সম্পর্কেরও" প্রয়োজন হয়।

তাই, আমরা দেখতে পাচ্ছি উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষ দু'টি বিশেষ সংযোগ রক্ষা করে কাজ করে—প্রথমটি হল,—"প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগ", আর দ্বিতীয়টি হল —"মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ"।

(১) মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ :—উৎপাদন করতে হলে চাই প্রাকৃতিক সম্পদ, আর সেই সম্পদের উপর শ্রম প্রয়োগকারী মানুষ। মানুষ সার্থকভাবে প্রকৃতির উপর শ্রম প্রয়োগ করতে পারে তখনই, যখন প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকে। আবার, সেই জ্ঞান ঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে চাই কলা-কৌশল। এর অর্থ হল, প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, আর থাকতে হবে সেই কাজে লাগানোর নৈপুণ্য ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি।

এখন প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শ্রমকারী মানুষ ও তার নৈপুণ্য ও তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি—এদের মিলিত রূপকেই আমরা বলি **উৎপাদন শক্তি**।

প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান যত বাড়বে, উৎপাদন শক্তিরও ততই বিকাশ হবে। আবার, কলা-কৌশল ও যন্ত্রপাতির উন্নত হলেও উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশ হয়। সুতরাং, উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তর দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংযোগের স্তর ঠিক হয়।

যেমন, খাদ্য সংগ্রহকারী বন্য মানুষের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল খুবই কম। উৎপাদনের যন্ত্রপাতিও ছিল খুবই মামুলি ধরনের। কলা-কৌশল ছিল উল্লেখের অনুপযুক্ত। ফলে, সেই আমলে উৎপাদন শক্তির বিকাশের স্তর ছিল খুবই নিম্ন-মানের। তাই, প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্বও ছিল নগণ্য।

তারপর হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে

অনেক অনেক জ্ঞান অর্জন করেছে। মানুষ আয়ত্ত করেছে নতুন নতুন কলা-কৌশল। সুতরাং, উৎপাদন শক্তি এখন বিকাশের উচ্চস্তরে রয়েছে। তাই, প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব এখন প্রায় অপরাজেয়,—মানুষ আজ মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে, চাঁদের মাটিতে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

(২) মানুষে মানুষে সংযোগ :—উৎপাদন বলতেই সামাজিক উৎপাদন বুঝায়। কারণ, মানুষ সমাজবদ্ধভাবে একে অপরের উপর নির্ভর করে পরস্পরের সহযোগিতায় উৎপাদনের কাজ করে থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে এই পারস্পরিক সংযোগকেই বলা হয়—**উৎপাদন সম্পর্ক**।

উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদনের মালিকানার ভিত্তিতে। দেখতে হবে বাড়ি, জমি, খনি, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা, কাঁচামালের মালিক কে, আর যারা শ্রম করে তাদের সঙ্গে এই মালিকদের সম্বন্ধ কি? সুতরাং, সামাজিক সম্পদের মালিকানার রূপ অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্কের রূপ স্থির হয়।

যেমন, আদিম যৌথ সমাজে উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক ছিল গোটা সমাজ। সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল সমান সমান ভিত্তিতে। সবাইকে উৎপাদনে শ্রম প্রয়োগ করতে হত, উৎপন্ন সামগ্রী সবাই ভাগ করে ভোগ করত। সমাজের এক অংশ উৎপাদনের উপাদানের মালিক হয়ে বসে বসে খাবে, আর অপর অংশ প্রাণান্ত শ্রম করেও খেতে পাবে না—এইরূপ শ্রেণীভেদ ছিল না। তাই ছিল না শোষণ।

এল দাস সমাজ। দাস সমাজে দাস মালিক উৎপাদনের উপাদানের মালিক। সে ক্রীতদাসেরও মালিক। তাদের সম্পর্ক হল,—দাস-মালিক শোষক, ক্রীতদাস শোষিত।

এল সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। সামন্ত জমিদার জমি ও উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানের মালিক। ভূমিদাস সামন্ত জমিদারের জন্য শ্রম করতে বাধ্য। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হল,—জমিদার শোষক, ভূমিদাস শোষিত।

তারপর এল পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিপতি উৎপাদনে সমস্ত উপাদান, যথা, বাড়ি, জমি, কারখানা, খনি, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের মালিক। মজুরী শ্রমিক সর্বহারা। তার একমাত্র সম্পদ হল নিজের শ্রমশক্তি। পুঁজিপতির নিকট এই শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে পারলে তবে সে খেতে পায়। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক হল,—পুঁজিপতি শোষক, মজুরী-শ্রমিক শোষিত।

১৯১৭ সালে অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ। এখন পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে এই ব্যবস্থা চলেছে। এখানে উৎপাদনের

উপাদনের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সামাজিক মালিকানা। এখানে মানুষ আর মানুষকে শোষণ করতে পারে না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক হল সমান সমান ভিত্তিতে।

তাই দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন ব্যবস্থার মূল অংশ হল দু'টি—(১) উৎপাদন শক্তি, (২) উৎপাদন সম্পর্ক। মার্কসের মতে এই দু'টি অংশের মধ্যে সঙ্গতি রক্ষা করেই উৎপাদন কার্য চলতে পারে। এর অর্থ হল—কোন একটি প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে সঙ্গতি থাকে। ক্রমে বিকাশের ফলে উৎপাদন শক্তির উন্নতি হয়ে এক সময় উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তার সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে—অর্থাৎ, সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ, উৎপাদন সম্পর্ক উন্নততর পর্যায়ে উঠে যদি উন্নত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন না করে, তবে উৎপাদন ব্যাহত হবে। তাই দেখা যায় যে, উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ দু'টির মধ্যকার দ্বন্দ্বই উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য দায়ী, আর এইটিই হল সমাজ বিকাশের অর্থাৎ সমাজ-বিপ্লবের মার্কসীয় মূলতত্ত্ব।

উৎপাদনের নিজস্ব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলিই উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের জন্য দায়ী।

(১) উৎপাদনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের গতিশীলতা। উৎপাদন কখনও বহুদিন একই অবস্থায় পড়ে থাকে না। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা ক্রমাগত উন্নততর পর্যায়ে উঠতে থাকে। আর তার ফলে সমাজিক ব্যবস্থা, সামাজিক ধ্যান-ধারণা, রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানগুলিরও পরিবর্তন হয়। কারণ উৎপাদন রীতিই ঐগুলির রূপ নির্ণয় করে।

সুতরাং, সমাজ বিকাশের ইতিহাস প্রধানতঃ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস।

আবার উৎপাদনকারী মানুষই উৎপাদন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। সুতরাং, উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের ইতিহাস। অতএব ইতিহাসকে যদি বিজ্ঞানসম্মত হতে হয়, তবে তা হতে হবে উৎপাদনের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত জনসাধারণের ইতিহাস। ব্যক্তি বিশেষের 'উচ্চাকাঙ্ক্ষা' ও 'দিগ্বিজয়' বা গোষ্ঠী বিশেষের স্বার্থ রক্ষার জন্য 'যুদ্ধ' বা 'ধর্ম-বিজয়ের' কাহিনী কখনই ইতিহাস হতে পারে না।

আবার, ইতিহাসের নিয়ম বা ধারা বুঝতে হলে মানুষের মন, তার চিন্তা বা সমাজ সম্বন্ধে তার ধ্যান-ধারণার মধ্যে তা খুঁজলে চলবে না। তা খুঁজতে হবে বিভিন্ন যুগের অর্থনৈতিক জীবনের মধ্যে।

তাই বিজ্ঞান হিসাবে ইতিহাসের প্রধান কাজ হল—উৎপাদনের নিয়ম, উৎপাদন শক্তির বিকাশের নিয়ম, উৎপাদন সম্পর্ক ও সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাগুলি আলোচনা করা; এবং এই আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করা।

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকেই সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর কর্তব্য স্পষ্ট হয়। তা হল—উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের নিয়মগুলি জানতে হবে, তার ইতিহাস আলোচনা করে ক্রমবিকাশকে বুঝতে হবে। সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ধারাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে এবং তারপর নিজেদের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী তৈরি করতে হবে।

(২) উৎপাদনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল—উৎপাদন শক্তির সচল ও বৈপ্লবিক চরিত্র। প্রথমে উৎপাদন শক্তির পরিবর্তন ও বিকাশ সুরু হয় যন্ত্রপাতির পরিবর্তন ও উন্নতির ফলে। কিন্তু, ' বিকাশের বিশেষ বিশেষ স্তরে সমাজের বস্তুগত উৎপাদন শক্তির সঙ্গে চলতি উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ ঘটে। এই একই জিনিসকে আইনের ভাষায় বলতে গেলে—উৎপাদন শক্তি এতদিন যে সম্পদ সম্পর্কের (property relation) মধ্যে কাজ করছিল তার সঙ্গে তার (উৎপাদন শক্তির—লেখক) বিরোধ বেধে যায়। এই সম্পর্ক এখন উৎপাদন শক্তির বিকাশের সহায়ক না হয়ে তার শৃঙ্খলে পরিণত হয়। তখনই একটি সমাজ-বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়।"[৭]

বিরোধের প্রথম দিকে উৎপাদন সম্পর্ক বিকশিত উৎপাদন শক্তির কিছু অংশ সাময়িকভাবে ধ্বংস করেও নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু, ক্রমে উৎপাদন শক্তির পরিমাণগত বৃদ্ধির চাপে উৎপাদন সম্পর্কের গুণগত বৈপ্লবিক পরিবর্তন হতে বাধ্য। উৎপাদন উন্নততর স্তরে উঠে যায়।

সুতরাং, উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তি শুধু গতিশীল ও বিপ্লবী অংশই নয়, এটাই উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দায়ী।

এই বৈশিষ্ট্য থেকে সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর শিক্ষা হবে—বুর্জোয়া উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতির অভাবনীয় উন্নতির ফলে উৎপাদন শক্তির অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। অথচ, উৎপাদন সম্পর্ক সেই ব্যক্তিগত মালিকানার বুর্জোয়া সম্পর্কই রয়ে গেছে। এর ফলে উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ দু'টির মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয়। যার প্রমাণ আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় অতি-উৎপাদনের সংকটের মধ্যেই দেখতে পাই। এ অবস্থাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালানোর উপযুক্ত সময়। তাই, সর্বহারা শ্রেণীকে সংগঠিত ভাবে নিজের কর্মসূচী অনুযায়ী এই বিরোধকে কাজে লাগিয়ে সমাজ-বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে আসতে হবে।

(৩) উৎপাদন ব্যবস্থার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল—পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্য থেকেই মানুষের উদ্দেশ্যমূলক ও সচেতন চেষ্টা ছাড়াই উৎপাদনশক্তির বিকাশ ঘটে এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তনের ক্ষেত্র তৈরি হয়। আর তা হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই।

প্রধানতঃ দু'টি কারণের জন্য এই জিনিস ঘটে। প্রথমত—কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ তার খেয়াল-খুশী মতো উৎপাদন যন্ত্র ও উৎপাদন সম্পর্কের কাঠামো ঠিক করতে পারে না। সে তার পূর্ববর্তী যুগের উৎপাদন ব্যবস্থাকে উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করে মাত্র। সুতরাং, প্রথম দিকে তাকে পুরাতন ব্যবস্থার মধ্যেই কাজ সুরু করতে হয়।

যেমন, যখন মাত্র লোহার ফলাযুক্ত কাঠের লাঙল আবিষ্কার হয়েছে, তখন কোন চাষী যেমন শুধু কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে চাষ করার কথা ভাবতে পারে না; তেমনি ট্রাকটর দিয়ে চাষ করার কথাও তাদের পক্ষে সেই যুগে কল্পনা করা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনকারী মানুষ সব সময়ই বর্তমান লাভ-অলাভের কথাই ভাবে। যখনই সে নতুন যন্ত্র ব্যবহার করতে সুরু করে তখন সে ভাবে যে, এর ফলে তার শ্রম লাঘব হবে এবং উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে। কিন্তু, সে একবারও চিন্তা করে না যে, নতুন যন্ত্রের ব্যবহার বা নতুন পদ্ধতিতে উৎপাদনের ফলে ভবিষ্যতে কি বিরাট সামাজিক পরিবর্তন হতে পারে।

যেমন, যৌথ সমাজ-ব্যবস্থা যুগের মানুষ ভাবতেও পারেনি সেইদিন তারা যে লোহার যন্ত্র ও অস্ত্র ব্যবহার করতে সুরু করেছিল, তার ফলেই দাস-সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব হবে। তেমনি বুর্জোয়ারা যখন সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা ধ্বংস করে কারখানা প্রথায় উৎপাদন সুরু করেছিল, তখন তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল কম খরচে অধিক উৎপাদন। তারা ভাবতেও পারেনি যে এটাই ছিল শ্রেণী হিসাবে তাদের ধ্বংসের পরোয়ানা।

তাই বলে এই সূত্রের অর্থ এই নয় যে,—উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন আস্তে আস্তে, কোন সংঘর্ষ ছাড়াই নির্ঝঞ্ঝাটে সম্পন্ন হবে। পরন্তু, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন সব সময়ই হয় বিপ্লবের সাহায্যে পুরাতন উৎপাদন ব্যবস্থাকে জোর করে উচ্ছেদ করে। অবশ্য, একটা স্তর পর্যন্ত উৎপাদন শক্তির বিকাশ বর্তমান উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যেই নির্ঝঞ্ঝাটে হতে পারে। কিন্তু উৎপাদন শক্তির বিকাশ যখন সেই স্তর পেরিয়ে যায়, তখন প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক তার আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

আবার, প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্কের ধারক শাসক শ্রেণী উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। কারণ, তারা জানে এই ব্যবস্থা পাল্টে গেলে তাদের আর অস্তিত্ব থাকবে না। ঠিক এই সময়ই প্রয়োজন হয় একটি শ্রেণীর যাদের স্বার্থ সম্ভাব্য পরিবর্তনের সঙ্গে জড়িত। তখন তারা এগিয়ে এসে শাসক শ্রেণীর বাধা বলপূর্বক দূর করে উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথ খুলে দেয়।

এইখানেই প্রয়োজন হয় নতুন প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণা ও মতবাদের। এই রাজনৈতিক মতবাদ সমাজ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় দাবিগুলিকে সামনে তুলে ধরে। সুতরাং, সংগঠিত সর্বহারা শ্রেণীর অবশ্যই একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক মতবাদ থাকতে হবে। আর এই রাজনৈতিক মতবাদে প্রতিফলিত হতে হবে সমাজবিকাশের প্রয়োজনীয় দাবিগুলি। তবেই তাকে কেন্দ্র করে সংগঠিত হবে সমাজের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি। তবেই তাদের গতি হবে অপ্রতিহত। আর থাকবে একটি বৈপ্লবিক কর্মসূচী। কারণ, প্রচলিত ব্যবস্থার রক্ষক শাসকশ্রেণী কখনই বিনা বাধায় তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না। তাই, তখন স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পরিবর্তে একমাত্র প্রগতিশীল শ্রেণীর বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টাই সমাজপরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে পারবে।

১—কার্ল মার্কস　২—কার্ল মার্কস　৩—কার্ল মার্কস
৪—স্তালিন　৫—কার্ল মার্কস　৬—স্তালিন
৭—কার্ল মার্কস

দ্বিতীয় খণ্ড

ভূমিকা

সমাজ বিকাশের ধারায় আমরা দেখেছি যে সামন্ত যুগের শেষ দিকে উৎপাদন শক্তির আরো বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক, অর্থাৎ যে উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাদনের সমস্ত উপাদানের মালিক সামন্ত জমিদার শ্রেণী। সেই যুগে বুর্জোয়াশ্রেণীই ছিল উদীয়মান প্রগতিশীল শ্রেণী, আর সামন্ত সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের সঙ্গে বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থই বিশেষভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই সেই বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে ভূমিদাস কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ও মধ্যবিত্তশ্রেণীকে সংগঠিত করে, আর সেই মিলিত শক্তির সাহায্যে সামন্ত প্রভুদের হাত থেকে কেড়ে নেয় রাষ্ট্রশক্তি। উচ্ছেদ করে সামন্ত সমাজব্যবস্থা। ভূমিদাসকে ভূমি-দাসত্ব থেকে মুক্ত করে। সর্বহারা মজুরী-শ্রমিক সৃষ্টির পথ প্রস্তুত হয়। শুরু হয় পুঁজিবাদী উৎপাদন।

"শুরু থেকেই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়—(১) পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদন করে। অবশ্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পণ্য উৎপাদন করে শুধু এ কথা বললেই অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তার পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা যায় না। এই ব্যবস্থায় উৎপন্ন দ্রব্যের কার্যকরী ও নির্দেশক চরিত্র হলো পণ্য, আর এইটিই হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। প্রধানতঃ এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক নিজেই পণ্য-বিক্রেতার ভূমিকা গ্রহণ করে, আর তা করে নিজেই মজুরী-শ্রমিক হয়ে। এর ফলে মজুরী শ্রম শ্রমের এক বিশেষ রূপ গ্রহণ করে।

"(২) পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অপর বৈশিষ্ট্যটি—উৎপাদনের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য ও মূল প্রেরণার উৎস হলো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করা। এখানে পুঁজি মূলতঃ পুঁজিই উৎপাদন করে। আর যে পরিমাণ উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয়, কেবল সেই পরিমাণ পুঁজিই উৎপন্ন হয়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল)।

সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হলো, 'মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন'। তাই পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্রমবিকাশ অর্থাৎ পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশ বুঝতে হলে জানতে হবে, পণ্য কি? মুনাফা কি? কি করে পণ্যোৎপাদনের মধ্য দিয়ে মুনাফার সৃষ্টি হয়?

পণ্য কি ?

প্রথমেই দেখা যাক পণ্য কি ?

মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য নানা প্রকার জিনিসের প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আশ্রয়স্থল ইত্যাদি। আদিম মানুষের প্রয়োজনের সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাদের উৎপাদন করার শক্তিও ছিল অনুন্নত। তারা মূলতঃ ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী। প্রকৃতির গাছে আছে ফল-মূল, কচিপাতা। মানুষ শ্রম করে তাই সংগ্রহ করে। আর তা খেয়ে বেঁচে থাকে। নদী ও ঝরণায় আছে জল। তাই সংগ্রহ করে পান করে। গুহা খুঁজে বার করে তার মধ্যে রাত কাটায়। পরে তারা শিকার করতে শিখলো ; মাংস খেতে শিখলো। লতা-পাতা দিয়ে ঘর করতে শিখলো। গোষ্ঠীর সকল সভ্য এক সঙ্গে কাজ করে। উৎপন্ন জিনিস ভাগ করে ভোগ করে। স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার শ্রমবিভাগ ছিল না। উৎপাদন শক্তি ছিল অনুন্নত। সুতরাং তা দিয়ে যা উৎপন্ন হয়, সকলে মিলে ভোগ করতেই তা ফুরিয়ে যায়। ভোগের পর আর কিছুই বাড়তি বা উদ্বৃত্ত থাকে না। উৎপন্ন জিনিসের একটি মাত্র গুণই ছিল। তা হলো উৎপাদনকারীর ভোগে লাগা। তাই সেই আমলে উৎপাদন ছিল মূলতঃ ভোগের জন্য উৎপাদন।

ক্রমে কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষ পশুপালন শিখলো। অথচ অন্যান্য অঞ্চলের মানুষ তখনও শুধুই ফল মূল সংগ্রহ করে, শিকার করে। তাই, "আমরা দেখতে পাই, পশুপালক উপজাতি ও পশুপালহীন অনুন্নত শিকারী উপজাতিগুলির মধ্যে শ্রমবিভাগ। ফলে দুটি ভিন্ন স্তরের উৎপাদন ব্যবস্থা পাশাপাশি চলতে থাকে।" (এঙ্গেলস, পরিবার ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি)।

এর ফলেই দেখা দিল প্রথম কৃত্রিম শ্রমবিভাগ। অর্থাৎ কিছু লোক এই সব জিনিস তৈরি করে বা করবে এবং অন্যেরা অন্য সব জিনিস তৈরি করে বা করবে।

ইতোমধ্যে প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলি সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান কিছুটা বেড়েছে। ফলে উৎপাদন শক্তির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। পশুপালক উপজাতিগুলি এখন নিজেদের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি উৎপাদন করতে পারে। তাই নিজেদের অভাব মিটিয়েও এখন তাদের কিছু জিনিস উদ্বৃত্ত থাকে। নানা প্রকার জিনিসও তারা তৈরি করতে শিখেছে। তারা তৈরী করে দুধ, দুধের তৈরী খাবার, চামড়া ও লোমের পোশাক, পাথর ও মাটির পাত্র ইত্যাদি। পরে তারা চাষ করতেও শিখলো।

শিকারী উপজাতিগুলির উৎপাদনও এখন কিছুটা বেড়েছে। কারণ, তাদের উৎপাদন শক্তিও কিছুটা উন্নত হয়েছে। এখন তারা পাথরের নানা প্রকার অস্ত্র তৈরী করতে পারে। বনের কোন্ অঞ্চলে কোন্ ঋতুতে কোন্ প্রাণী বেশি পাওয়া যায়, এখন তারা তা জানে। তবে পশুপালক উপজাতিগুলির মতো অনেক রকমের জিনিস তাদের নেই। তাদের আছে কাঁচা মাংস, কাঁচা চামড়া, বন্য পশুর জ্যান্ত শাবক ইত্যাদি।

এই ঐতিহাসিক অবস্থায় উভয় উপজাতির মধ্যে একটা অবস্থা স্বভাবতই চালু হয়। তা হলো, এক উপজাতি নিজেদের উদ্বৃত্ত জিনিসের বদলে অন্য উপজাতির উদ্বৃত্ত জিনিস সংগ্রহ করে এবং তা ভোগ করে। শিকারী উপজাতি দেয় কাঁচা মাংস, কাঁচা চামড়া, জ্যান্ত পশু শাবক আর পশুপালক উপজাতির কাছ থেকে সে পায় দুধ, দুধের তৈরী খাবার, পোশাক, পাত্র ইত্যাদি। এই ব্যবস্থার নামই বিনিময়, অর্থাৎ, জিনিসের বদলে জিনিসের আদানপ্রদান।

বিনিময় ব্যবস্থার প্রচলন হওয়ায় মানুষের উৎপন্ন জিনিসের একটি অংশ একটি নতুন কাজে ব্যবহৃত হতে লাগলো। আগে উৎপন্ন জিনিসের সবটাই উৎপাদনকারী নিজেই ভোগ করতো। এখন উৎপাদনকারী তার উৎপন্ন জিনিসের একটি অংশ নিজে ভোগ করে, বাকী অংশ অন্য উৎপাদনকারীর জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করে। সুতরাং উৎপন্ন জিনিসের সেই অংশটিতে একটি নতুন গুণ দেখা দিল। সে গুণটি হলো, অন্য জিনিসের সঙ্গে তাকে বিনিময় করা যায়। উৎপন্ন জিনিসের যে-অংশ বিনিময়ের কাজে ব্যবহার করা হয়, তা এখন আর উৎপাদনকারীর সাক্ষাৎ ভোগে লাগে না। কিন্তু যেহেতু জিনিসটিতে অভাব মিটানোর ক্ষমতা আছে, সুতরাং তা গ্রহণকারীর সাক্ষাৎ ভোগে লাগে। তাই তা এখন উৎপাদনকারীর নিকট আর ভোগ্যপণ্য নয়, এখন তা **বিনিময় পণ্য,** সাধারণভাবে **পণ্য।** এমনিভাবে মানুষের উৎপন্ন জিনিসেরএকটি অংশ বিনিময়ে ব্যবহৃত হয়ে পণ্যে পরিণত হলো।

সুতরাং "পণ্য হলো প্রথমতঃ এমন একটি জিনিস—যা মানুষের কোনো না কোন অভাব মেটায়; আর দ্বিতীয়ত তা এমন একটি জিনিস—যা অন্য কোনো জিনিসের সঙ্গে বিনিময় করা যায়।" (লেনিন, মার্কস এঙ্গেলস—মার্কসবাদ)। তাই কোনো জিনিসকে পণ্য হতে হলে তার দুটি গুণ থাকতে হবে (১) **উপযোগিতা** (২) **বিনিময় যোগ্যতা।**

গোড়া থেকেই মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করে এবং তা ভোগ করে। কিন্তু ক্রমে শ্রমবিভাগের ফলে

এবং উৎপাদনের উন্নততর বিকাশ ও তার ফলে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতে থাকায় ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেই সব দ্রব্যসামগ্রীর একটি অংশ পণ্যে পরিণত হলো।

বিনিময় হয় কেন ?

আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিনিময় ব্যবস্থাই মানুষের উৎপন্ন দ্রব্যকে পণ্যে পরিণত করে। তাই প্রশ্ন জাগে, বিনিময় হয় কেন ?

আমরা জানি, প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলির উপর শ্রম প্রয়োগ করে মানুষ তার প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করে। এর অর্থ হলো, মানুষের শ্রম প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিগুলিতে মানুষের অভাব মিটানোর ক্ষমতা, অর্থাৎ উপযোগিতা সৃষ্টি করে। এই উপযোগিতাই হলো জিনিসের ব্যবহার মূল্য।

যতদিন পর্যন্ত কোনো শ্রমবিভাগ ছিল না, ততদিন প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই নিজেরা তৈরী করতো। আবার সবটা নিজেরাই ভোগ করতো। শ্রম বিভাগের ফলে ক গোষ্ঠী এক প্রকার জিনিস তৈরী করে, খ-গোষ্ঠী করে অন্য প্রকার। তাদের তৈরী জিনিসের উপযোগিতাও হয় ভিন্ন ভিন্ন। আবার উভয়েরই উদ্বৃত্ত উৎপাদন হতে থাকে।

এই অবস্থায় 'ক' যদি 'খ'-এর তৈরী জিনিসের উপযোগিতা উপভোগ করতে চায়, তবে 'খ'-এর উদ্বৃত্ত অংশ তাকে সংগ্রহ করতে হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে 'খ'-কে 'ক'-এর উদ্বৃত্ত অংশ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু 'ক' বা 'খ' দু'জনের কেউই নিজের জিনিস বিলিয়ে দেবে না। সুতরাং এমন একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয় যাতে করে 'ক' নিজের উৎপন্ন জিনিসের উদ্বৃত্ত অংশ 'খ'-কে দিয়ে 'খ'-এর উৎপন্ন জিনিসের উদ্বৃত্ত অংশ সংগ্রহ করতে পারে। এর ফলে যে-ব্যবস্থার উদ্ভব হল তাকে বলা হয় বিনিময়। আর এই বিনিময়ের মাধ্যমেই একজন নিজের উৎপন্ন জিনিসের ব্যবহার-মূল্য অপরকে দিয়ে অপরের উৎপন্ন জিনিসের ব্যবহার মূল্য ভোগ করতে পারে। তাই দেখা যাচ্ছে, শ্রমবিভাগ, উদ্বৃত্ত উৎপাদন এবং অপরের উৎপন্ন জিনিসের ব্যবহার-মূল্য ভোগ করার ইচ্ছা থেকেই বিনিময়ের সূচনা হয়েছে।

বিনিময় পদ্ধতির কয়েকটি দিক

বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার-মূল্যের প্রকৃতি বিভিন্ন প্রকার। যেমন চালের ব্যবহার-মূল্য মানুষের ক্ষুধাজনিত অভাব মেটায়; কোদালের ব্যবহার-মূল্য মাটি

কোপানোর প্রয়োজনীয়তারূপ অভাব মেটায়; পোশাকের ব্যবহার-মূল্য শীত নিবারণ বা লজ্জা নিবারণ করার অভাব মেটায় ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিনিময়ের সময় এক প্রকারের ব্যবহার-মূল্য দিয়ে দেওয়া হয়, আর গ্রহণ করা হয় অন্য প্রকারের ব্যবহার-মূল্য। আবার এ কথাও সত্য যে, কোনো প্রকৃতিস্থ ব্যক্তিই বেশি পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য দিয়ে তার বদলে কম পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য নিতে রাজি হতে পারে না। তাই বিনিময়ের সময় নিশ্চয়ই বিভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের মধ্যে সমতা স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ, যে পণ্যটি দিয়ে দেওয়া হয় তার ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণের সঙ্গে, যে পণ্যটি পাওয়া যায় তার ব্যবহার-মূল্যের পরিমাণের সমতা স্থাপন করা হয়। আর নিশ্চয়ই তা করা হয় একটি বিশেষ পদ্ধতিতে। দেখা যাক, সে পদ্ধতিটি কি?

মনে করি, একজন কর্মকার ৫ কেজি চালের বিনিময়ে ১টি কোদাল দেয়। ১টি কোদাল দিলে কর্মকার যতটুকু মূল্য দিয়ে দেয়, ৫ কেজি চাল থেকে ততটুকু মূল্য ফিরে পাবে বলেই তা করে। অনুরূপভাবে, কৃষকও সন্তুষ্ট হয় বলেই ৫ কেজি চালের সঙ্গে ১টি কোদালের বিনিময় হয়। এ অবস্থায় ৫ কেজি চালের মূল্য = ১টি কোদালের মূল্য। কিন্তু, একজন তাঁতি ১টি কোদালের পরিবর্তে ১টির বেশী ধুতি দিতে রাজি হয় না। আবার কর্মকারও যদি ১টি কোদালের পরিবর্তে ১টি ধুতি পেলেই সন্তুষ্ট হয় তবে বিনিময় সম্ভব হয়। সে অবস্থায় ১টি কোদালের মূল্য = ১টি ধুতির মূল্য।

এমনিভাবে আমরা প্রত্যহ অসংখ্য বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন পণ্যের বিভিন্ন মূল্যের মধ্যে সমতা বিধান করছি; আর তা করছি ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিয়ে বিনিময় করে। যেমন, এখানে কোদালের পরিমাণ যখন ১টি, তখন তার সঙ্গে বিনিময় করছি ৫ কেজি চাল অথবা ১টি ধুতি। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিয়ে তাদের মূল্যে সমতা বিধান করা হয়, সেই পরিমাণের অনুপাতকেই বলা হয় বিনিময়ের হার বা বিনিময় মূল্য, অর্থাৎ সাধারণভাবে মূল্য। যেমন এখানে কোদাল ও চালের বিনিময়ের হার ১ : ৫ এবং ধুতি ও কোদালের বিনিময় হার ১ : ১।

"বিনিময়-মূল্য (বা সাধারণভাবে মূল্য) মূলতঃ একটি অনুপাত। অর্থাৎ একপ্রকার ব্যবহার-মূল্যের কিছু পরিমাণের সঙ্গে অন্য আর একপ্রকার ব্যবহার-মূল্যের যে-পরিমাণের বিনিময় হয়, তারই তুলনামূলক অনুপাত। আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই যে, লক্ষ লক্ষ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরস্পর ভিন্ন প্রকৃতির এবং পরস্পরের মধ্যে তুলনার সম্পূর্ণ অযোগ্য 'ব্যবহার-মূল্যের

মধ্যে অনবরত সমতা স্থাপন করা হয়। আর তা করা হয় একটি নির্দিষ্ট সামাজিক সম্বন্ধের সাহায্যে। এখন প্রশ্ন হলো বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মধ্যে সেই সাধারণ সম্বন্ধটি কি? তাদের সেই সাধারণ চরিত্রটি হলো, সেগুলি মানুষের শ্রমে তৈরী। মানুষের শ্রমে তৈরী এই সব জিনিস বিনিময় করার মধ্য দিয়ে মানুষ বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রমের মধ্যে সমতা স্থাপন করে।" (লেনিন, কার্ল মার্কস)। কারণ, "আমরা যদি পণ্যের ব্যবহার-মূল্যকে হিসাবের মধ্যে না ধরি, তবে পণ্যের একটি মাত্র সাধারণ গুণই দেখতে পাবো, আর তা হলো, প্রতিটি পণ্যই মানুষের শ্রমে তৈরী।" (মার্কস, ক্যাপিটাল)। সুতরাং পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা মানুষের সেই সাধারণ শ্রমেরই বিনিময় করে থাকি।

কিন্তু বিভিন্ন উৎপাদনকারীর শ্রমের বিনিময় করতে গিয়ে একটি সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, কর্মকারের শ্রম তৈরী করে কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে; তাঁতির শ্রম তৈরী করে ধুতি, শাড়ি, গামছা; কৃষকের শ্রম উৎপন্ন করে ধান, গম, পাট, ইত্যাদি। তাই দেখা যাচ্ছে যে, উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের শ্রম ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। সুতরাং তাদের শ্রমের চরিত্র নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন। আর ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের এই সব শ্রম বিশেষ বিশেষ ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। তাই এই সকল শ্রমকে বলা হয় **বিশেষ শ্রম**। যেমন, তাঁতির বিশেষ-শ্রম ধুতির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, অথচ মুচির বিশেষ-শ্রম সৃষ্টি করে জুতোর ব্যবহার-মূল্য। যেহেতু ধুতি ও জুতোর ব্যবহার-মূল্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণ আলাদা, সুতরাং তাঁতি ও মুচির বিশেষ-শ্রমের প্রকৃতিও আলাদা, এ অবস্থায় বিনিময়ের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে সমতা স্থাপন কি করে সম্ভব হতে পারে?

অবশ্য একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করলেই আমরা দেখতে পাব যে, "শারীর-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করলে সমস্ত শ্রমই মানুষের শ্রমশক্তির ব্যয়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল)। বিভিন্ন জিনিসের ব্যবহার-মূল্যে বিভিন্নতা থাকা সত্বেও সাধারণভাবে একমাত্র শ্রমই প্রতিটি জিনিসের মূল্য সৃষ্টি করে। তাই এই শ্রমকে বলা হয় **নির্বিশেষ শ্রম**। তাঁতি ও মুচি যখন ধুতি ও জুতো তৈরী করে, তখন তারা তাদের শ্রমশক্তিরই প্রয়োগ করে। প্রত্যেকের প্রয়োগ কৌশল আলাদা হলেও শারীরিক গুণ হিসাবে তাদের শ্রমশক্তির রূপ কখনই আলাদা নয়। আর বিনিময়ের সময় তাদের এই নির্বিশেষ শ্রমেরই সমতা স্থাপন করা হয়। আর তা পরিমাপ করা হয় শ্রমশক্তি প্রয়োগের সময়ের পরিমাণ দ্বারা।

যেমন, মনে করি, একটি কোদাল তৈরী করতে কর্মকারের ১০ ঘণ্টা নির্বিশেষ-শ্রম খরচ হয়। আর প্রতি কেজি চাল উৎপাদন করতে চাষীর ২ ঘণ্টা করে

নির্বিশেষ-শ্রম খরচ হয়। এ অবস্থায় একটি কোদালের সঙ্গে ৫ কেজি চালের বিনিময় হবে। কারণ, ১টি কোদাল=১০ ঘণ্টার নির্বিশেষ শ্রম এবং ৫ কেজি চাল=২×৫=১০ ঘণ্টার নির্বিশেষ-শ্রম। সুতরাং ১টি কোদাল=১০ ঘণ্টা নির্বিশেষ-শ্রম=৫ কেজি চাল। এমনি করে পণ্যের পরিমাণের তারতম্য করে তাদের মধ্যকার নির্বিশেষ শ্রমের সমতা স্থাপন করা হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, একই শ্রম এক হিসাবে বিশেষ-শ্রম, আবার অন্য হিসাবে নির্বিশেষ-শ্রম। **বিশেষ-শ্রম হিসাবে শ্রম উৎপন্ন জিনিসে ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে, আর নির্বিশেষ-শ্রম হিসাবে সৃষ্টি করে বিনিময় মূল্য, অর্থাৎ মূল্য।** বিনিময় শুরু হওয়ায় বিশেষ ও নির্বিশেষ-শ্রমের এই পার্থক্য ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে বিরোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যতদিন পর্যন্ত বিনিময় ছিল না, অর্থাৎ যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস নিজেরাই উৎপাদন করে ভোগ করত, ততদিন বিশেষ-শ্রম ও নির্বিশেষ-শ্রমের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজন ছিল না। পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাতেই মানুষের শ্রম বিশেষ ও নির্বিশেষ-শ্রম বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর শ্রমের এই বিভাগই পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্বরূপে দেখা দেয়। যে মুহূর্তে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিলোপ ঘটবে, সেই মুহূর্তেই এই বিরোধ দূর হয়ে যাবে।

পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো একজন উৎপাদনকারীর শ্রম একদিকে যেমন তার ব্যক্তিগত বিশেষ শ্রম, অপরদিকে তা মোট সামাজিক নির্বিশেষ-শ্রমের অংশ। তাই পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদনকারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। "যে ব্যক্তি নিজের প্রত্যক্ষ ব্যবহারের অর্থাৎ ভোগের জন্য তৈরী করে, সে সৃষ্টি করে উৎপন্ন দ্রব্য, সে পণ্য উৎপাদন করে না। আত্মনির্ভর উৎপাদক হিসাবে সমাজের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ নেই। কিন্তু পণ্য উৎপাদন করতে গিয়ে উৎপাদনকারীকে শুধু সামাজিক অভাব মেটায় এমন জিনিস তৈরী করলেই চলবে না, উপরন্তু তার শ্রমকে গোটা সমাজে ব্যয়িত মোট শ্রমের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে হবে। আর তাকে হতে হবে সমাজের মধ্যকার শ্রমবিভাগের অধীন।" (মার্কস মজুরি-দাম মুনাফা)।

কর্মকার, তাঁতি ও কৃষকের মধ্যে বিনিময়ের যে উদাহরণটি আমরা উপরে উল্লেখ করেছি, তাতে মনে হতে পারে যে উৎপাদকের মানসিক তৃপ্তি-অতৃপ্তির উপর পণ্যের বিনিময়মূল্য নির্ভর করে। কিন্তু, তা কখনই সত্য নয়। নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নিয়ম দ্বারাই পণ্যের বিনিময় মূল্য স্থির হয়। পণ্য বিনিময়ের সময় যে

জিনিসটি বিবেচনা করা হয় তা হলো পণ্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ। আর, উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ তার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা দ্বারা বিনিময়ের অনুপাত সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে। তাইতো আমরা দেখি "মধ্যযুগের কৃষক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যে সকল পণ্য পায় তা তৈরি করতে কি পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয়েছে, তা সে ভালোভাবে ও সঠিকভাবেই জানে। দরজি, মুচি ও কর্মকার এরা সবাই কৃষকের চোখের সামনেই কাজ করতো।...যাদের কাছ থেকে কৃষক পণ্য ক্রয় করে তারা এবং সে নিজে উভয়েই শ্রমজীবী। আর যে সকল জিনিস বিনিময় হয়, তা তাদেরই শ্রমে তৈরী। এই সকল জিনিস তৈরি করতে তারা কি ব্যয় করতো? তারা ব্যয় করতো তাদের শ্রম, কেবলমাত্র শ্রম। কাজের যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করা, কাঁচামাল উৎপাদন করা এবং সেগুলি দিয়ে কাজ করার সময় তারা নিজেদের শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য কিছুই ব্যয় করতো না। এ অবস্থায় অন্যান্য শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্যের সঙ্গে নিজেদের বিনিময় পণ্য বিনিময়ের সময় তারা নিজেদের পণ্য উৎপাদনে যে শ্রম ব্যয় করতো, তার সঙ্গে সেই সব শ্রমিকের পণ্যে ব্যয়িত শ্রমের সমানুপাত করা ছাড়া অন্য কিভাবে তা হতে পারতো? বিনিময়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণ মাপার জন্য সেই পণ্য উৎপাদন করতে যে শ্রম-সময় ব্যয় হয়েছে, তাই একমাত্র সঙ্গত মাপদণ্ড হতে পারে। শুধু তাই নয়। এ ছাড়া অন্য কোনো মাপদণ্ড কল্পনাও করা যায় না। তা ছাড়া এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে, কৃষক ও কারিগরগণ এতই বোকা যে, যে-জিনিস তৈরি করতে দশ ঘণ্টা সময় লেগেছে, তার সঙ্গে তারা এক ঘণ্টার তৈরী জিনিস বিনিময় করবে? স্বাভাবিক কৃষি-অর্থনীতির গোটা যুগে বিনিময়ের সময় বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণ পণ্যে নিয়োজিত শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্থির হয়ে এসেছে। এ ছাড়া আর অন্য কোনো প্রকারে বিনিময় সম্ভব ছিল না।......

"শহরের কারিগরদের তৈরী জিনিস ও কৃষকদের তৈরী জিনিসের মধ্যে বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এ কথা খাটে। প্রথমদিকে হাটের দিনে বণিকদের মধ্যস্থতা ছাড়াই সরাসরি বিনিময় হতো। এখানে কৃষক নিজের উৎপন্ন জিনিস বিক্রয় করে এবং নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করে। এ ক্ষেত্রে কৃষকগণই যে শুধু কারিগরদের কাজের অবস্থা জানতো—তা নয়, কারিগরগণও কৃষকদের কাজের অবস্থা জানতো। কারণ তখন পর্যন্ত কারিগরগণ নিজেরাও কিছুটা পরিমাণে কৃষক ছিল। তাদের যে শুধু একটি করে শাক-সব্জির বাগান ও ফলের বাগান আছে তাই নয়, তাদের অনেকেরই এক ফালি চাষের জমি, দু একটি গরু, শূকর, মোরগ প্রভৃতিও রয়েছে।" (এঙ্গেলস, ক্যাপিটাল সম্পর্কে)

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পণ্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়, পণ্যের বিনিময় মূল্য, সাধারণভাবে পণ্য-মূল্য তারই উপর নির্ভর করে। আর একেই আমরা বলতে পারি পণ্যের প্রকৃত-মূল্য।

এখন প্রশ্ন জাগে, শ্রমের পরিমাণ কিভাবে মাপা যায়? শ্রমের পরিমাণ মাপা হয় শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ্য দিয়ে। অর্থাৎ কতদিন বা কত ঘণ্টা বা কত মিনিট শ্রম করা হয়েছে তাই দিয়ে শ্রমের পরিমাণ ঠিক হয়। মনে করি, একটি জিনিস তৈরি করতে ৪ ঘণ্টা সময় লেগেছে, অন্য আর একটি জিনিস তৈরি করতে লেগেছে ২ ঘণ্টা। এ অবস্থায় প্রথম জিনিসটির মূল্য দ্বিতীয় জিনিসটির মূল্যের দ্বিগুণ হবে।

এই সূত্র মতে হিসাব করতে গিয়ে কিন্তু একটি সমস্যা দেখা দেয়। যেমন, পাশাপাশি দু'জন তাঁতি কাজ করে একজন খুব চটপটে, অন্যজন একটু ঢিলে। প্রথম জন ৩ ঘণ্টায় একটি ধুতি বুনতে পারে। অথচ একই রকম একটি ধুতি বুনতে দ্বিতীয় জনের ৫ ঘণ্টা সময় লাগে। এ অবস্থায় ধুতি দুটি একই মানের হওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় তাঁতির ধুতিটির মূল্য বেশী হতে হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কখনোই হতে পারে না। আর তা হয়ও না। কারণ "পণ্যে পরিণত বা রূপায়িত শ্রমের পরিমাণ দ্বারা পণ্যের মূল্য স্থির হয় বলতে আমরা বুঝি—কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ সামাজিক অবস্থায়, শ্রমের সাধারণ সামাজিক গড়পড়তা তীব্রতা ও নৈপুণ্যসহ কোনো একটি পণ্য তৈরী হতে আবশ্যক শ্রমের পরিমাণ দ্বারা পণ্যের মূল্য স্থির হয়।" (মার্কস, মজুরি-দাম-মুনাফা)। আর এই আবশ্যক শ্রমকেই আমরা বলব — সামাজিক-আবশ্যিক-শ্রম। অভিজ্ঞতা থেকে সবাই জানে, প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মানের একটি ধুতি বুনতে গড়পড়তা কতটুকু সামাজিক-আবশ্যিক শ্রম প্রয়োজন হয়। তাই ঢিলে তাঁতি বেশি সময় নিয়ে ধুতি বুনলেও মূল্য পাওয়ার সময় সামাজিক-আবশ্যিক-শ্রমের মূল্যই মাত্র সে পাবে।

বিনিময়ের বিকাশ

এতক্ষণ আমরা এক প্রকার পণ্যের সঙ্গে অন্যপ্রকার পণ্যের বিনিময়ের পদ্ধতির কথা আলোচনা করেছি। কিন্তু বর্তমান যুগে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সাক্ষাৎ বিনিময় আমরা কদাচিৎ দেখতে পাই। সাধারণতই দেখা যায়, উৎপাদনকারী পণ্যের পরিবর্তে মুদ্রা পায়, পরে সেই মুদ্রার পরিবর্তে নিজের প্রয়োজন মতো পণ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে, কি করে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সাক্ষাৎ

বিনিময়ের পরিবর্তে, বর্তমানকালের প্রচলিত পদ্ধতির প্রবর্তন হলো; আর এর অর্থনৈতিক তাৎপর্যই বা কি?

অতি আদিম যুগে কোন প্রকার বিনিময় ছিল না। শ্রম বিভাগ ও উদ্বৃত্ত উৎপাদন না থাকায় তখন বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাও ছিল না। প্রতিটি গোষ্ঠী নিজেদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই (যার সংখ্যা ছিল খুবই কম) সংগ্রহ করতো, নিজেরাই সবটা ভোগ করতো। পরে শ্রমবিভাগ ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনের পথ ধরে বিনিময়ের সূচনা হয়। কিন্তু প্রথম দিকে বিনিময় ছিল খুবই অনিয়মিত। আর বিনিময়যোগ্য পণ্যের সংখ্যা ও পরিমাণ দুই ই ছিল খুব কম। সাধারণতঃ এমনি ঘটনা ঘটতো। হঠাৎ একদিন একদল শিকারী এক পশুপালক-গোষ্ঠীর আস্তানায় এসে হাজির হলো। তাদের সঙ্গে রয়েছে কিছু কাঁচা মাংস। পশুপালক-গোষ্ঠীর প্রধানের সঙ্গে দেখা করে তারা মাংসের বিনিময়ে দুধ পেতে চাইলো। মনে করি, চার ঝুড়ি মাংসের পরিবর্তে তারা দশ ভাঁড় দুধ পেলো। সুতরাং বিনিময়ের হার দাঁড়াল:

৪ ঝুড়ি মাংস = ১০ ভাঁড় দুধ।

সে যুগে বিনিময় সাধারণতঃ হতো আকস্মিকভাবে। তাই বিনিময়ের হার কোনো বিশেষ নিয়ম মেনে ঠিক না হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার-মূল্যের চিন্তাই বোধ হয় প্রাধান্য পেত। ঐ যুগের বিনিময়-হার প্রকাশের পদ্ধতিকে বলা যায়—**পণ্য-মূল্য প্রকাশের সহজ রূপ**।

কিন্তু এই প্রথম মানুষের উৎপন্ন জিনিস পণ্যে পরিণত হলো, আর তা হলো বিনিময়েরই ফলে। ব্যবহার-মূল্য ছাড়াও পণ্যে আর একটি নতুন গুণ দেখা দিল। তা হলো তার বিনিময়-মূল্য।

এখানে চার ঝুড়ি মাংস—দশ ভাঁড় দুধ—এই সম্বন্ধটি দিয়ে এই বুঝায় যে, চার ঝুড়ি মাংসে যে ব্যবহার-মূল্য আছে তার বিনিময়-মূল্য, অর্থাৎ মূল্য হলো দশ ভাঁড় দুধ। দুধের নিজস্ব ব্যবহার-মূল্য থাকা সত্ত্বেও এখানে দশ ভাঁড় দুধ চার ঝুড়ি মাংসের মূল্য হিসাবে কাজ করছে। আবার দশ ভাঁড় দুধ—চার ঝুড়ি মাংস—এই সম্বন্ধটিতে মাংসের নিজস্ব ব্যবহার-মূল্য থাকা সত্ত্বেও তা দুধের মূল্য হিসাবে কাজ করছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিনিময় প্রক্রিয়ার ফলে একই জিনিসের ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। আর এই অন্তর্বিরোধের রূপটিই বিনিময়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।

কালক্রমে বিনিময় আরো ঘন ঘন হতে লাগলো। আর তাতে নানা বৈচিত্র্যও দেখা দিলো। এখন শিকারীরা নিয়ে আসে কাঁচা মাংস, কাঁচা চামড়া, জ্যান্ত

হরিণ-শাবক ইত্যাদি। তারা নিয়ে যায় দুধ, দুধের তৈরী খাবার, পোশাক, ধান, বর্শা প্রভৃতি বিভিন্ন জিনিস। এ অবস্থায় বিনিময়ের হার সাধারণতঃ ঠিক হয় প্রতি দুটি জিনিসের মধ্যে, জোড়ায় জোড়ায়। আর তাদের মধ্যে সমতা আনা হয় বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণের তারতম্য করে। যেমন :

১টি কাঁচা চামড়া = ১টি ধাতু নির্মিত বর্শা
১টি হরিণ শাবক = ২টি ধাতু নির্মিত বর্শা
২টি কাঁচা চামড়া = ১টি পোশাক
১ ঝুড়ি মাংস = ২ ধামা ধান
১টি হরিণ শাবক = ৪ ভাঁড় দুধ
১টি কাঁচা চামড়া = ২ ধামা ধান
১ ঝুড়ি মাংস = ২ ভাঁড় দুধ
১টি কাঁচা চামড়া = ৩টি মাটির পাত্র

এ অবস্থাতেও বিনিময় অনিয়মিতই ছিল। তাই বিনিময়ের হার যে সব সময় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতো, তা না-ও হতে পারে। তবুও বিনিময়ের সময় বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণ ঠিক করতে গিয়ে বিনিময়কারীরা নিশ্চয়ই কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতো। আর বিনিময়কারীদের জানতই হোক, আর অজান্তেই হোক, জিনিস-গুলি তৈরি করতে বা সংগ্রহ করতে যে-শ্রম খরচ হয়েছে, তার প্রভাব বিনিময়ের হারের উপর পড়তো, আর তা পড়াই ছিল স্বাভাবিক। প্রতি জোড়া পণ্যের মধ্যে আলাদা আলাদা বিনিময় হার ঠিক হওয়াও যেমন এই যুগে খুবই স্বাভাবিক ছিল, তেমনি আবার বিনিময় হার প্রকাশের এই পদ্ধতিতে মূল্যের আরো বিস্তৃত রূপ বিকাশের সূচনা দেখা যায়।

সমাজের উৎপাদন শক্তি ক্রমাগতই উন্নত হচ্ছিল। সেই সঙ্গে উদ্বৃত্ত উৎপাদনও বাড়তে লাগলো, তার ফলে বিনিময়েরও উন্নততর বিকাশ হতে লাগলো। প্রথম দিকে সমাজের সমস্ত সম্পদের মালিক ছিল গোটা সমাজ। তখন বিনিময় হতো গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে এবং গোষ্ঠী প্রধানদের মারফত। পরে যখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির রীতি চালু হয় তখন ব্যক্তিগত বিনিময় শুরু হয়। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিনিময় ছাড়াও, একই গোষ্ঠীর বিভিন্ন পরিবার নিজেদের মধ্যে পরস্পরের পণ্য বিনিময় করতে লাগলো।

মনে করি, এমনি সময় একদিন একজন শিকারী এক পশুপালক-গোষ্ঠীর আস্তানায় এলো। তার কাছে রয়েছে কয়েকটি কাঁচা চামড়া। কয়েকদিন পর অন্য একজন শিকারী ঐ আস্তানায় গেলো। সে নিয়ে গেলো কয়েকটি হরিণ-শাবক

তারা দুজনেই নিজেদের পণ্য বিনিময় করেছিল দুধ, ধান, পোশাক, মাটির পাত্র ও বর্শা ইত্যাদির সঙ্গে। এ অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, প্রথমবার কাঁচা চামড়ার সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের বিনিময় হার ঠিক হয়েছিল; এবং দ্বিতীয়বার হরিণ-শাবকের সঙ্গে অন্য সব পণ্যের বিনিময় হার ঠিক হয়েছিল। এ অবস্থায় বিনিময়ের হার জোড়ায় জোড়ায় না হয়ে একটি পণ্যের সঙ্গে অনেকগুলি পণ্যের হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। বিনিময় হার প্রকাশের এই পদ্ধতি কিন্তু পূর্বের পদ্ধতির চেয়ে অনেক উন্নত, সরল ও যুক্তিসম্মত ছিল। মনে করি, সেই হার ছিল:

১টি চামড়া = { ১টি বর্শা, ২ ধামা ধান, ২ ভাঁড় দুধ, ৩টি পাত্র, ১টি পোশাক }

১টি হরিণ শাবক = { ২টি বর্শা, ৪ ধামা ধান, ৪ ভাঁড় দুধ, ৬টি পাত্র, ১টি পোশাক }

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, এখানেও বিভিন্ন পণ্যের মূল্যের তুলনা-মূলক হার প্রায় আগের মতোই রয়েছে, অথচ বিনিময়ের হার প্রকাশ করার পদ্ধতিতে পরিবর্তন হওয়ায় মূল্য সম্বন্ধে ধারণা আরো স্পষ্ট হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় পণ্যের বিনিময় হার দেখে মনে হতে পারে যে, বিনিময় হার ঠিক হয় আকস্মিকভাবে। পণ্যগুলির মধ্যে যে একটি সাধারণ বস্তু রয়েছে এবং সেই সাধারণ বস্তুর পরিমাণের মধ্যে সমতা বিধান করে যে বিনিময় হার স্থির হয়,—এই সত্যটি সেখানে স্পষ্ট নয়। কিন্তু এখানে সাধারণ বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশই আর থাকে না। আমরা এখানে ১টি কাঁচা চামড়ার সঙ্গে অনেকগুলি পণ্যের বিনিময়ের সম্বন্ধ দেখতে পাই। আর তা তখনই সম্ভব যখন চামড়া ও অন্যান্য পণ্যের মধ্যে একটি সাধারণ বস্তু রয়েছে। ১টি চামড়ার মধ্যে যে পরিমাণ সাধারণ বস্তু রয়েছে, অন্যান্য পণ্যের পরিমাণের তারতম্য করে তাদের মধ্যকার সাধারণ বস্তুর পরিমাণ তার সঙ্গে সমান করে তবে বিনিময় সম্ভব হয়েছে। আর এই সাধারণ বস্তুটিই হলো—সামাজিক নির্বিশেষ-শ্রম।

বিনিময় হার প্রকাশ করার এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে একটি মাত্র পণ্যের নির্দিষ্ট পরিমাণের সঙ্গে অন্যান্য পণ্যের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিয়ে সমতা স্থাপন করা হয়েছে। যেমন ১টি চামড়া = ১টি বর্শা অথবা ২ ধামা ধান অথবা ২ ভাঁড় দুধ ইত্যাদি। তাই এখানে একটি পণ্যের মূল্য অন্যান্য পণ্যের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। একে বলা হয় "মূল্যের বিস্তৃত রূপ"।

বিনিময় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যে

যে বিরোধ শুরু হয়েছিল, এখানে তা আরো প্রকট হয়েছে। জোড়ায় জোড়ায় বিনিময় হারে ব্যবহার-মূল্যের বেশ খানিকটা গুরুত্ব ছিল। কিন্তু এখানে নির্বিশেষ-শ্রমে সৃষ্ট বিনিময়-মূল্যই বেশী প্রাধান্য পায়।

আদিম যুগের বিনিময়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল (১) উৎপাদনকারীরা উৎপন্ন জিনিসের প্রায় সবটাই নিজেরা ভোগ করতো। উৎপন্ন জিনিসের একটি নগণ্য অংশই মাত্র বিনিময়ের জন্য ব্যবহার করতো। তাই উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্যোৎ-পাদনের বিশেষ কোনো গুরুত্বই ছিল না। (২) বিনিময় হতো উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর সাক্ষাৎ যোগাযোগে। প্রথম দিকে তা হতো গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী প্রধানদের মারফত। পরে হতে থাকে বিভিন্ন গোষ্ঠী বা একই গোষ্ঠীর পরিবারে পরিবারে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। (৩) বিনিময় হতো প্রতিটি বাস্তব পণ্যের বদলে অন্য বাস্তব পণ্য সাক্ষাৎভাবে আদানপ্রদান করে। পণ্য প্রবাহের ধারা ছিল পণ্য 'ক'⇌পণ্য 'খ'। (৪) বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ সামাজিক নির্বিশেষ শ্রম ব্যয় হয়েছে সাধারণতঃ তারই উপর ভিত্তি করে বিনিময়ের হার ঠিক হতো। (৫) বিনিময়ের মূল প্রেরণা ছিল ভোগ। একজন উৎপাদনকারী অপর উৎপাদনকারীর উৎপন্ন জিনিসের ব্যবহার মূল্য ভোগ করার জন্যই নিজের উৎপন্ন জিনিস পণ্য হিসাবে তার সঙ্গে বিনিময় করতো।

এর পরই যে বিরাট শ্রমবিভাগ হয় তা হলো : কৃষিকাজ ও হস্ত শিল্পের মধ্যে শ্রমবিভাগ। এর অর্থ এই নয় যে, হস্তশিল্পীরা এখন আর কোনো প্রকার কৃষি-কাজই করে না, আর কৃষকরা কোনো প্রকার হস্তশিল্পের কাজ করে না। বরং হস্তশিল্পীদের প্রত্যেকেরই তরি-তরকারী ও ফলের বাগান আছে। তাদের কারো কারো কিছু কিছু চাষের জমিও রয়েছে। আর প্রায় প্রতিটি কৃষক পরিবারেই একটি ক'রে তাঁত রয়েছে। পরিবারের সভ্যরা অবসর সময়ে তাঁতে গামছা, চাদর ইত্যাদি বোনে। কৃষক তার চাষের যন্ত্রপাতি সারাইয়ের কাজ অনেকাংশে নিজেই করে নেয়। মোট কথা, উভয়েই উভয়ের কাজের কলাকৌশল বেশ কিছুটা জানে।

কিন্তু এখন মানুষের অভাবের সংখ্যা ও পরিমাণ দুইই বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি করা একজনের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। তাই মূল পেশা হিসাবে কৃষি ও শিল্পের আলাদা হয়ে পড়াই ছিল স্বাভাবিক। আর তার ফলে তাদের মধ্যে বিনিময় হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য। কারণ, এখন খাদ্য ও কাঁচামালের জন্য হস্তশিল্পীদের কৃষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার কৃষকগণ পোশাক, চাষের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের জন্য হস্ত-শিল্পীদের উপর নির্ভর করে।

এই পরিস্থিতিতে বিনিময় ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ হতে লাগলো। প্রতিটি পরিবারকে দিনে একাধিক বিনিময় করতে হয়। তাই বিনিময়ে নানা জটিলতাও দেখা দেয়। যেমন, একজন কৃষকের রয়েছে কিছু উদ্বৃত্ত ধান আর তা দিয়ে সে একটি কোদাল পেতে চায়। কিন্তু কর্মকারের আপাতত ধানের প্রয়োজন নেই; তার প্রয়োজন একটি ধুতির। অথচ কৃষকের এখন ধুতি না হলেও চলবে। এ অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে বিনিময় কিভাবে সম্ভব? একমাত্র তাঁতি যদি ধান নিতে রাজী হয়, তবে তিনজন মিলে পরস্পরের পণ্য একাধিকবার বিনিময় করে নিজেদের অভাব মেটাতে পারে। অর্থাৎ, কৃষক ধান দিয়ে তাঁতির কাছ থেকে ধুতি নিয়ে সেই ধুতি কর্মকারকে দিয়ে কোদাল পেতে পারে।

কি করে এই সমস্যা দূর করা যায়? সবাই সব সময় নিতে রাজী থাকবে এমন একটি সাধারণ পণ্য থাকলেই আর এই সমস্যা থাকে না। তখন প্রত্যেক লোকই প্রথমে নিজের জিনিসের বিনিময়ে সেই সাধারণ পণ্য সংগ্রহ করবে এবং পরে সেই সাধারণ পণ্য দিয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করবে। অর্থাৎ, সাধারণ পণ্যটি তখন বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করবে। মনে করি, কোনো এক সময়ে ধান হলো সেই মাধ্যম। কর্মকার এখন ধানের বিনিময়ে কৃষককে কোদাল দিতে আপত্তি করবে না। কারণ, সে জানে এই ধান নিয়ে তাঁতিও তাকে ধুতি দিতে আপত্তি করবে না। তাঁতিও আবার ধান দিয়ে জেলের কাছ থেকে মাছ পেতে পারবে। ফলে এখন সমস্ত পণ্যের মূল্যই ধানে প্রকাশিত হবে। যেমন—

১টি ধুতি
৭টি কোদাল
১৫টি হাঁড়ি
৩ বস্তা আলু } = ১ বস্তা ধান
২টি লাঙল
১৫ চুপড়ি মাছ
ইত্যাদি

এমনিভাবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন এক সময়ে গরু বিনিময়ের মাধ্যমের স্থান দখল করেছিল।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, বিনিময় হার প্রকাশ করার এই পদ্ধতিটি পূর্বের পদ্ধতিগুলি থেকে আলাদা। এই প্রথম বিভিন্ন পণ্যের মূল্য একটি মাত্র পণ্যে প্রকাশ করা হলো। আর এই রূপটি অনেক বেশি ব্যাপক। একে "মূল্যের সর্বজনীন রূপ" বলা যায়।

বিনিময়ের এই রূপটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে—প্রতিটি পণ্যে যে একটি সাধারণ বস্তু রয়েছে তা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না। বিভিন্ন পণ্যের পরিমাণের তারতম্য করে তাদের মধ্যকার সাধারণ বস্তুটির সমতা স্থাপন করা হচ্ছে। আমরা আগেই দেখেছি যে, এই সাধারণ বস্তুটি হল—পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত নির্বিশেষ-শ্রম। আবার আমরা এও দেখেছি যে, নির্বিশেষ-শ্রম পণ্যে বিনিময়-মূল্য সৃষ্টি করে। সুতরাং বিনিময়ের সময় এখন সেই বিনিময়-মূল্যের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায়, ব্যবহার-মূল্য ও বিনিময়-মূল্যের মধ্যকার বিরোধ আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। ব্যবহার-মূল্যের উপর নির্ভরশীল নয় এমন বিনিময়-মূল্য অগ্রাধিকার পায়।

বিনিময়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার অনেক-গুলিই এখানে বর্তমান। কিন্তু পণ্য প্রবাহে এখন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আগে একটি বাস্তব পণ্যের সঙ্গে অন্য আর একটি বাস্তব পণ্যের সোজাসুজি বিনিময় হতো। এখন তা হয় একটি সাধারণ পণ্যকে মাঝে রেখে। তাই তার রূপ হয়—পণ্য 'ক'→সাধারণ পণ্য→পণ্য 'খ'। দুটি বাস্তব পণ্যের বিনিময় ঘটানোর ব্যাপারে একটি সাধারণ পণ্য ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করতে থাকে। আর এই পথ ধরেই চূড়ান্ত পর্যায়ে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমের স্থানটি দখল করে নেয়।

এই যুগে সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু আবিষ্কৃত হয়। আর অল্পদিনের মধ্যেই তারা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ক্রমে এইসব মূল্য-বান ধাতু দিয়ে বিভিন্ন ওজন ও আকৃতির মুদ্রা তৈরী হতে লাগলো। আর সেই-সব মুদ্রার সাহায্যে বিনিময়ই হয়ে পড়লো বিনিময়ের সর্বজনীন রীতি। মানুষ বাস্তব পণ্য-বিনিময়ের যুগ পেরিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের যুগে প্রবেশ করলো। এখন উৎপাদনকারী মুদ্রা নিয়ে তার পণ্য বিক্রয় করে। পরে প্রয়োজন মতো সেই মুদ্রা দিয়ে অন্য পণ্য ক্রয় করে। তাই পণ্য প্রবাহের নতুন রূপটি দাঁড়ায়—পণ্য 'ক'→মুদ্রা→পণ্য 'খ'। দেখা দেয় মূল্যের মুদ্রারূপ। মূল্যের মুদ্রারূপ মূল্যের সর্বজনীন রূপেরই পরিণত রূপ। আর এই দুটি রূপের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম।

কোনো একটি জিনিস তখনই একটি পণ্যের সঙ্গে বিনিময় হতে পারে যখন সে নিজে একটি পণ্য। সুতরাং বিনিময়ে ব্যবহৃত হওয়ার আগেই সোনা ও রূপাকে পণ্য হতে হয়েছিল। প্রথম দিকে সোনা ও রূপা ধাতু হিসাবে তাদের প্রকৃত-মূল্য (উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ) অনুযায়ী অন্যান্য পণ্যের সঙ্গে বিনিময় হতো। কিন্তু তাদের দিয়ে মুদ্রা তৈরী হওয়ার পর সেই সব মুদ্রা কয়েকটি বিশেষ নতুন গুণ অর্জন করে। মুদ্রা এখন আর পণ্যের প্রকৃত-মূল্য নয়, সে তার বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্যের মূল্যের অভিব্যক্তি বা নিদর্শন মাত্র।

মুদ্রার প্রচলন হওয়ার পূর্বে অনেক সময় বিনিময়ে নানা জটিল সমস্যা দেখা দিতো। যার ফলে বিনিময়ের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হচ্ছিল না। যেমন মনে করি, গরু যখন বিনিময়ের প্রচলিত মাধ্যম, তখন একজন কৃষকের একটি মাত্র কোদাল প্রয়োজন। তার রয়েছে একটি গরু—যা দিয়ে সে অনেক কোদাল পেতে পারে। অথচ তার এতগুলি কোদালের প্রয়োজন নেই। গরুটিকে টুকরো টুকরো করে একটি টুকরো দিয়ে একটি কোদাল সংগ্রহ করে বাকি টুকরোগুলি রেখে দেবে,—এই ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাই কৃষককে অন্য উপায় খুঁজতে হতো, নয়তো কোদাল ছাড়াই কাজ চালাতে হতো।

এমনও হতো যে একজন তাঁতি একটা নতুন তাঁত সংগ্রহ করতে চায়। তার জন্য তিনটি গরু চাই। কারণ, একটি তাঁতের বিনিময়-মূল্য তিনটি গরু। তাই তাঁতি ধুতির বিনিময়ে একটার পর একটা গরু সংগ্রহ করছে। সে যেদিন তৃতীয় গরুটি সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করছে, তার আগের দিন হঠাৎ আগে সংগ্রহ-করা গরু দুটির একটি মরে গেলো। এতে তার প্রভূত ক্ষতি তো হবেই, উপরন্তু নতুন তাঁত সংগ্রহ করা পিছিয়ে যাবে। এমন কি নতুন তাঁত কেনা তার পক্ষে অসম্ভব হয়েও পড়তে পারে।

এমনি আরো নানা অসুবিধা দেখা যেতো। মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় কিন্তু এই-সব অসুবিধা দূর হয়ে গেলো। এখন কৃষক গরু বিক্রয় করে মুদ্রা পায়। সেই মুদ্রা থেকে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে কোদাল ক্রয় করে। আবার তাঁতি ধুতি বিক্রয় করে মুদ্রা পায়। সেই মুদ্রা জমিয়ে রেখে তা দিয়ে নতুন তাঁত কিনতে পারে। এখন বিনিময় হয়ে গেছে অনেক সরল। তাই মুদ্রার প্রচলন বিনিময় ব্যবস্থায় এক বৈপ্লবিক বিকাশ নিয়ে এলো। বর্তমানে আমরা তারই চূড়ান্ত বিকাশের যুগে বাস করছি।

বিনিময়ের দ্রুত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিনিময়যোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়তে লাগলো। ফলে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভূত বিকাশ ঘটে। তবে এখনও উৎপাদন-কারীরা, বিশেষতঃ কৃষক উৎপাদনকারীরা (সে যুগে এদের সংখ্যাই ছিল বেশী) তাদের উৎপন্ন জিনসের বেশীরভাগ অংশই নিজেরা ভোগ করে। তাই পণ্যোৎপাদন বিকাশ লাভ করলেও গোটা উৎপাদন ব্যবস্থায় তার স্থান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

যতদিন পর্যন্ত কৃষক ও বিভিন্ন হস্তশিল্পীরা নিজেদের গ্রামে পরস্পর পণ্য বিনিময় করছিল, ততদিন পণ্য বিনিময় ব্যবস্থায় জটিলতা অনেক কম ছিল। গ্রামের কর্মকার জানতো বছরে তাকে কতগুলি কোদাল, কুড়োল, কাস্তে, বঁটি তৈরি করতে হবে। গ্রামের কুমোর জানতো তার হাঁড়ি-কলসির বাৎসরিক চাহিদা। ছুতোর জানতো

গাঁয়ে ক'টি লাঙল আছে, কার লাঙল কবে সারাতে হবে; আবার কার কখন নতুন লাঙল প্রয়োজন হবে। গাঁয়ে কার কাছে গেলে ধান পাওয়া যাবে, কার কাছে গেলে বাঁশ পাওয়া যাবে, কার ঘরের বাড়তি বলদটা হাল টানার মতো বড়ো হয়েছে—এ সব খবর গাঁয়ের প্রায় সবারই জানা থাকতো। সুতরাং তারা সহজেই তাদের উৎপাদন ও চাহিদার মধ্যে সঙ্গতি আনতে পারতো।

ক্রমে শহর ও নগরের পত্তন হলো। সেখানে গড়ে উঠলো ছোট ছোট হস্ত-শিল্পের কর্মশালা। তাতে তৈরি হতে লাগলো নানা প্রকারের শিল্পদ্রব্য। গ্রাম-গুলির আয়তনও ইতোমধ্যে অনেক বেড়ে গেছে। গ্রামের বর্ধিত চাহিদার সঙ্গে যুক্ত হলো শহর ও নগরের চাহিদা। নতুন নতুন শিল্পদ্রব্যের প্রচলন হওয়ায় মানুষের অভাবের সংখ্যা ও বৈচিত্র্যও বেড়ে গেলো। আর সেই সঙ্গে বেড়ে গেলো উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যকার ব্যবধান। পরস্পরের উৎপাদন ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞান ক্রমেই কমতে লাগলো।

এমনি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় পত্তন হলো হাট। হাট হলো এমন একটি কেন্দ্রীয় জায়গা—যেখানে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদনকারীরা নিজ নিজ পণ্য নিয়ে সমবেত হয়। তারা নিজ নিজ পণ্য বিক্রয় করে এবং নিজেদের প্রয়োজনমতো অন্যান্য পণ্য ক্রয় করে। কৃষক নিয়ে আসে ধান, চাল, পাট, তুলা, তরিতরকারি, কলু নিয়ে আসে তেল, খইল; কর্মকার আনে দা কুড়োল, কাস্তে; কুমোর নিয়ে আসে হাঁড়ি-কলসি; ছুতোর আনে লাঙল, জোয়াল, ইশ। শহরের হস্তশিল্পীরা নিয়ে আসে নানা শিল্পদ্রব্য। তারপর শুরু হয় বিকিকিনি। হাটের প্রচলন হওয়ার প্রথম যুগে উৎপাদনকারী সোজাসুজি ভোগকারীর নিকট পণ্য বিক্রয় করতো। কোনো তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব তখন ছিল না।

আমরা একটু আগে দেখেছি যে, আত্মনির্ভর গ্রামের প্রতিটি উৎপাদক তার পণ্যের চাহিদা সম্বন্ধে প্রায় সঠিক ধারণা করতে পারতো। সেই মতো সে তার উৎপাদনের পরিমাণ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারতো। কিন্তু এখন তাকে উৎপাদন চালাতে হয় আন্দাজের উপর নির্ভর করে। একমাত্র হাটে পৌঁছেই সে জানতে পারে তার পণ্যের চাহিদা কত। কিন্তু তখন সে নাচার। তার পণ্যের চাহিদা বেশী থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে তার যোগান বাড়াতে পারে না। আবার তার পণ্যের চাহিদা কম থাকলেও সেই মুহূর্তে তার করার কিছুই থাকে না। হাটের অন্ধ শক্তির কাছেই তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এমনিভাবে বিনিময়ের ক্ষেত্রে হাটের গুরুত্ব বেড়ে চলে। মনে হয়, হাটের চাহিদা ও যোগানই যেন পণ্যের ভাগ্য নির্ণয় করে!

মনে করি, তাঁতিরা হাটে আশিটি ধুতি নিয়ে এসেছে। হাটে এসে তারা বুঝতে পারে সেদিন একশ'টি ধুতির চাহিদা রয়েছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁতিদের যোগান বাড়ানো আর সম্ভব হয় না। ফলে ক্রেতাদের মধ্যে ধুতির জন্য কাড়া-কাড়ি পড়ে যায়। তাঁতিরাও সুযোগ বুঝে বেশী দাম দাবি করে। এ অবস্থায় প্রতিটি ধুতি অবশ্যই তার প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে বেশী দামে বিক্রয় হবে। আর সেদিনের জন্য ধুতির সেই দামকে বলা হবে ধুতির বাজার-দাম বা দাম। এই দামের সমান মুদ্রা দিয়ে তবে একজন ক্রেতা একটি ধুতি পেতে পারবে। সুতরাং, **দাম হলো মুদ্রায় প্রকাশিত পণ্যের মূল্য।** এ অবস্থায় তাঁতিরা একটি ধুতি তৈরি করতে যে-পরিমাণ শ্রম ব্যয় করেছে, তার মূল্যের সমান মূল্য তো পেয়ে যাবেই; উপরন্তু কিছু বাড়তি বা উদ্বৃত্ত মূল্যও পেয়ে যাবে; এই উদ্বৃত্ত মূল্য তাঁতিদের লাভ হবে।

আবার একই হাটে কর্মকাররা ৫০টি কোদাল নিয়ে এসে দেখলো মাত্র ৩০টি কোদালের খদ্দের আছে। তখন কর্মকারদের প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে নিজের সব কয়টি কোদাল বিক্রয় করার জন্য খদ্দেরকে ডাকাডাকি করবে। কোদালের প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে কিছু কম দাম পেলেও তা বিক্রয় করতে রাজী হবে। এ অবস্থায় যে বাজার-দাম বা দামে কোদাল বিক্রয় হবে, তা স্বভাবতঃই কোদালের প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে কম হবে। ফলে কর্মকারদের ব্যয়িত শ্রমের পুরা মূল্য আদায় হবে না, অর্থাৎ কর্মকারদের ক্ষতি হবে।

আমরা জানি যে, মানুষের শ্রমই পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে। সরল পণ্য বিনিময়ের যুগে তাই পণ্যের বিনিময়-মূল্য প্রধানতঃ পণ্যে নিযুক্ত সামাজিক আবশ্যিক-শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই ঠিক হয়েছে। এখন হাটের মাধ্যমে পণ্য বিকিকিনি হয় বাজার দামে, আর সেই দাম ঠিক হয় হাটের চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাতের ফলে। আমরা এইমাত্র দেখলাম যে, হাটের দাম কখনও প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বেশী, আবার কখনও বা কম হয়। তাঁতি ও কর্মকার দুজনেই হাটে এসেছিল প্রকৃত-মূল্যে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করে প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য প্রকৃত-মূল্যে কিনে নিয়ে বাড়ি যাবে বলে। লাভ করার ইচ্ছা তাদের ছিল না। অথচ হাটের চাহিদা ও যোগানের অবস্থার জন্য তাঁতির লাভ হয়ে গেল, আবার কর্মকারের হলো ক্ষতি। অথচ হাটের চাহিদা ও যোগানের কোনটাকেই সেই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ করার সাধ্য তাদের ছিল না। বাধ্য হয়ে সেই অদৃশ্য জোর কাছে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। তাদের মনে হয়েছে, এ যেন এক সর্বশক্তিমান নিয়তি। তাদের অজ্ঞাতসারে সে তাদের ভাগ্য নিয়ে খেলা করছে।

কোন একটি হাটে একই অবস্থা কি চিরকাল চলতে থাকে? তাঁতিরা কি বরাবরই প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে বেশি দামে ধুতি বেচতে থাকে, আর কর্মকারেরা কি বরাবরই প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে কম দামে কোদাল বেচতে থাকে? না, তা কখনোই হতে পারে না। এ অবস্থায় যে পণ্যের চাহিদা বেশি রয়েছে, উৎপাদনকারীরা সেই পণ্যের উৎপাদন বাড়িয়ে দেবে। আর যে পণ্যের চাহিদা কম রয়েছে তার উৎপাদন কমিয়ে দেবে। এমনি করে ধুতির যোগান বেড়ে যাবে। ফলে তার দাম কমে গিয়ে প্রকৃত মূল্যের কাছাকাছি এসে যাবে, এমন কি নিচেও নেমে যেতে পারে। বিপরীত পক্ষে, কোদালের যোগান কমে যাওয়ায় তার দাম বাড়তে বাড়তে প্রকৃত-মূল্যের কাছাকাছি চলে আসবে, হয়তো বা উপরেও উঠে যেতে পারে। এমনি করে অনবরত হ্রাস বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মূল্যবিধি কার্যকরী হয়। একমাত্র চাহিদা ও যোগান সমান হলেই পণ্য তার প্রকৃত-মূল্যে বিক্রয় হয়। অর্থাৎ তখন পণ্যের দাম=পণ্যের প্রকৃত-মূল্য হয়। অন্য সময় দাম কখনো প্রকৃত-মূল্যের উপরে আবার কখনোও বা নিচে থাকে।

পণ্যোৎপাদনের সময় প্রত্যেক উৎপাদনকারী পরের জন্য জিনিস তৈরি করে। তার পণ্যের ব্যবহার মূল্য তখন আর তার নিজের কাছে ব্যবহার মূল্য নয়, তখন তা তার কাছে শুধুই বিনিময় মূল্য। আর এই বিনিময়-মূল্য দ্বারা সে অন্যের উৎপন্ন জিনিসের ব্যবহার-মূল্য সংগ্রহ করে। তার নিজের পণ্যের ব্যবহার-মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় তার পণ্যের ভোগকারীদের পছন্দ-অপছন্দ দ্বারা। আবার প্রতিটি উৎপাদনকারী অন্যান্য উৎপাদনকারীর দৃষ্টিতে ভোগকারী। এমনিভাবে উৎপাদনকারীরা পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই পণ্যোৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ হাটের চাহিদা ও যোগানের খেলা দেখে এই সম্পর্ককে পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্ক বলে ধারণা জন্মে।

মানুষ পণ্য তৈরি করে। অথচ তার তৈরী সেই পণ্যই এখন তার উপর কর্তৃত্ব করে। নিজের সৃষ্ট পণ্যকেই মানুষ তার ভাগ্য বিধাতা বলে পূজা করতে শুরু করে। একেই বলে পণ্যরতি বা পণ্যপূজা। তাঁতি তার পণ্য ধুতি বেচতে না পারলে নিজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে পারে না। অথবা, তার ধুতি যদি সে কম দামে বেচতে বাধ্য হয়, তবে তাকে প্রয়োজনের চেয়ে কম জিনিস কিনে সংসার চালাতে হয় এমনিভাবে উৎপাদন ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্পর্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকে। তাই সে তার দুঃখ-দুর্দশার কারণ ঠিক মতো বুঝতে পারে না। সমাজ ব্যবস্থার প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক যে তার প্রকৃত শত্রু, তা সে বুঝতে পারে না।

এ যুগেও পণ্যোৎপাদনের প্রেরণা ছিল ভোগ, লাভ নয়। হাটে চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতির ফলে তাঁতির লাভ হয় বটে। কিন্তু সেই লাভ তার পণ্যোৎপাদনের প্রেরণা কখনোই নয়। ধুতি বিক্রয় করে সেই অর্থে নিজের পরিবারের জন্য ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। আর এমনি এক ব্যবস্থায় প্রতিটি উৎপাদনকারীই একদিকে যেমন পণ্য বিক্রেতা, অন্যদিকে সে অন্যান্য উৎপাদনকারীর পণ্যের ক্রেতা। উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে যেহেতু কোনো তৃতীয় ব্যক্তি নেই, তাই বিক্রেতা হিসাবে একজনের লাভ হলেও পরক্ষণেই ক্রেতা হিসাবে তার ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় গোটা উৎপাদনকারী সমাজকে ধরে বিচার করলে সাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি হতে পারে না।

যতদিন উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে অন্য কোনো তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না ততদিন উপরিউক্ত অবস্থাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু ক্রমে একশ্রেণীর লোক উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারা উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের মধ্যকার সাক্ষাৎ বিনিময়ের ধারাটিকে ব্যাহত করতে লাগলো। তখন থেকেই দেখা দিলো নতুন জটিলতা। তারা না ছিল উৎপাদনকারী, না ভোগকারী। তারা ছিল বিনিময়ের মধ্যস্থতাকারী। সোজা কথায় বিনিময়ের দালাল। আমরা আগেই দেখেছি যে, বিনিময়ের পরিমাণ ও পরিধি বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতি দেখা দেয়। এই দালালশ্রেণী চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতির সুযোগ নিতে শুরু করল। চাহিদা ও যোগানের দিকে লক্ষ্য রেখে তারা উৎপাদনকারীর নিকট থেকে কম দামে পণ্য ক্রয় করে। পরে সেই পণ্য বেশি দামে ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে। সুতরাং গোটা সমাজের সম্পদ বৃদ্ধি না করেও উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়ের সম্পদে ভাগ বসিয়ে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে। কালক্রমে এদের থেকেই পরবর্তীকালের বণিকশ্রেণীর উদ্ভব হয়। অবশ্য এই যুগের প্রথম দিকে গোটা পণ্যোৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থায় এদের বিশেষ কোন প্রভাবই ছিল না। এই যুগে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যই কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আবার হাটের মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে আরো উন্নততর বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

কালক্রমে বিনিময়ের ক্রমবিকাশের ফলে স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে আঞ্চলিক চাহিদা যুক্ত হলো। পরে তার সঙ্গে যুক্ত হলো দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের চাহিদা। হাটের সংখ্যা, আয়তন ও পরিধি বাড়তে লাগলো। আর সেই সঙ্গে বাড়তে লাগলো পণ্যের সংখ্যা, পরিমাণ ও বৈচিত্র্য। নতুন শিল্পদ্রব্য তৈরি হতে লাগলো। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসতে লাগলো বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী। মানুষের অভাব

ও প্রয়োজনের সংখ্যাও সেই সঙ্গে বেড়ে চললো। গুরুত্বপূর্ণ পণ্যগুলির এক একটির জন্য গড়ে উঠলো আলাদা আলাদা বাজার। সেই সব বাজারে এক একটি বিশেষ পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতার যোগাযোগে সেই পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় চলতে থাকে।

এমনি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় বিনিময় ক্ষেত্রে বণিকশ্রেণী ক্রমেই বেশি বেশি করে অংশ নিতে শুরু করে। সীমিত পরিধির বিনিময় ক্ষেত্রে যারা কখনো সখনো সামান্য মধ্যস্থতার কাজ করতো, তারা এখন বিনিময় ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠলো। আর সেই সঙ্গে বিনিময়ের ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও ভোগকারীদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ক্রমেই কমে যেতে লাগলো। সেই স্থানটি দখল করতে লাগলো উদীয়মান বণিকশ্রেণী।

ক্রমে বিনিময়ের পরিধি বিদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে বণিকশ্রেণীর গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে তাদের পণ্য ক্রয় করে একত্র জড়ো করে। পরে তা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চালান দেয়, জাহাজ বোঝাই করে বিদেশে রপ্তানি করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বাজার থেকে বিভিন্ন পণ্য স্থানীয় বাজারের জন্য নিয়ে আসে। জাহাজে করে তারা বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে এবং ফিরতি জাহাজে বিদেশ থেকে আমদানি করে নানা রকমের পণ্য ও কাঁচামাল ইত্যাদি।

বণিকশ্রেণীর মাধ্যমে বিনিময়ের ক্ষেত্রে পণ্য সঞ্চালনের ধারায় এক আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। আমরা দেখেছি যে, মুদ্রার মাধ্যমে পণ্য সঞ্চালনের স্বাভাবিক ধারাটি হলো—পণ্য 'ক'→মুদ্রা→পণ্য 'খ'। পণ্য 'ক'-এর ব্যবহার-মূল্য পণ্য 'খ'-এর ব্যবহার মূল্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাই এই বিনিময়ের মূল উদ্দেশ্য হলো, এক প্রকার ব্যবহার মূল্য দিয়ে অন্য প্রকার ব্যবহার মূল্য সংগ্রহ করা। তাই এই বিনিময় ছিল খুবই স্বাভাবিক।

কিন্তু বণিকশ্রেণীর মাধ্যমে যে বিনিময় হয়, তার ধারা দাঁড়ায়—মুদ্রা→পণ্য→মুদ্রা, অর্থাৎ বণিক মুদ্রা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে এবং পরে সেই পণ্য বিক্রয় করে মুদ্রা ফিরে পায়। এই ধারার শুরুতে মুদ্রা এবং শেষেও মুদ্রা। আর মুদ্রার ব্যবহার-মূল্য সব সময়েই অভিন্ন। সুতরাং এক প্রকার ব্যবহার মূল্যের পরিবর্তে অন্য প্রকার ব্যবহার মূল্য পাওয়ার ইচ্ছা এই বিনিময়ের প্রেরণা হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন জাগে, তবে এই বিনিময়ের প্রেরণা কি? বণিকশ্রেণী কি এতই বোকা যে যে মুদ্রা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে, পণ্য বিক্রয় করে সেই মুদ্রাই মাত্র ফিরে পায়, অথচ ক্রয়-বিক্রয়ের ঝামেলা সহ্য করে? না, তা নয়। এই বিনিময়ের গুপ্ত রহস্যটি এই যে, এতে বণিকশ্রেণী প্রথম যে পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে, পণ্য

বিক্রয় কালে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মুদ্রা আদায় করে। অর্থাৎ ধারাটি দাঁড়ায় —মুদ্রা→পণ্য→(মুদ্রা + বাড়তি মুদ্রা)। একমাত্র এইভাবে দেখলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যায়: বণিকশ্রেণী এই বাড়তি মুদ্রার জন্যই বিকিকিনির ঝামেলা পোহায়। আর এই বাড়তি মুদ্রাই বণিকশ্রেণীর লাভের উৎস। সুতরাং বণিক-শ্রেণীর মাধ্যমে যে বিনিময় হয় তার মূল প্রেরণা হলো লাভ, ভোগ নয়।

আমরা আগেই দেখেছি যে, বিনিময়ের পরিধি ও বৈচিত্র্য বেড়ে যাওয়ায়, বাজারের প্রচলন হওয়ায় এবং পরিশেষে বিনিময় ক্ষেত্রে বণিকশ্রেণীর প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছেদ বাড়তে থাকে। ফলে উৎপাদনকারীরা এখন আর তাদের পণ্যের চাহিদা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে পারে না। তারা উৎপাদন চালায় আন্দাজের উপর নির্ভর করে। পণ্য নিয়ে বাজারে হাজির হয়ে তবে তারা জানতে পারে তাদের পণ্যের চাহিদা কত। তখন বস্তু যোগানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের হাতে থাকে না। সুতরাং এই অবস্থায় বাজারের অন্ধ শক্তির শিকার হতে তারা বাধ্য হয়।

প্রথম দিকে হাটের ক্ষেত্রেও আমরা এমনি অবস্থা দেখেছি। কিন্তু তখন উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকতো না। তাই চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতির জন্য যে সুবিধা বা অসুবিধা হতো, তা উৎপাদন-কারী ও ভোগকারী উভয়েই সমানভাবে ভোগ করতো। কিন্তু এখন তৃতীয় পক্ষ হিসাবে বণিকশ্রেণী চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতির জন্য যে সুবিধাটুকু হয়, তা নিজেরা গ্রহণ করে, আর অসুবিধাটুকু উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। তারা সুযোগ মতো কম দামে পণ্য ক্রয় করে এবং বেশি দামে তা বিক্রয় করে। এইরূপে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে বণিকশ্রেণী অর্থসম্পদ সংগ্রহ করে।

যেমন, ফসল ওঠার মুখে বাজারে ধানের যোগান স্বভাবতই বেশি থাকে। ফলে ধান তখন তার প্রকৃত-মূল্য থেকে কম দামে বিক্রয় হয়। আবার বর্ষাকালে বা ফসল ওঠার ঠিক আগে বাজারে ধানের যোগান কম থাকে। তখন ধান তার প্রকৃত মূল্য থেকে বেশি দামে বিক্রয় হয়। বণিকশ্রেণী এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে ধানের দাম যখন কম থাকে তখন কম দামে ধান কিনে রেখে পরে তা বেশি দামে বিক্রয় করে লাভ করে। এমনি করেই বণিকশ্রেণী তাদের অর্থ-সম্পদ বাড়িয়ে চলে। তবে প্রত্যক্ষ বিনিময়ের ঘটনা যে একদম ছিল না, তা নয়। মোট কথা বণিক-শ্রেণীর প্রভাব ক্রমেই বাড়ছিল।

এই অবস্থায় বিনিময়ের বৈশিষ্ট্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে (১) কৃষক

উৎপাদনকারীরা এখন তাদের উৎপন্ন জিনিসের বেশিরভাগ অংশই নিজেরা ভোগ করে। তবে বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত অংশ এখন বেশ কিছুটা বেড়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় শিল্প পণ্যের যোগান বেড়েছে। বিনিময়ের পরিমাণ বৃদ্ধি ও উৎপাদন শক্তির উন্নতির ফলে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষ কিছুটা বিকাশ হয়েছে।

(২) বিনিময়ের বেশির ভাগই এখন আর উৎপাদনকারী ও ভোগকারীর সাক্ষাৎ যোগাযোগের ফলে হয় না। সেই বিনিময় হয় বণিকশ্রেণীর মাধ্যমে।

(৩) বাস্তব পণ্যের সঙ্গে বাস্তব পণ্যের বিনিময় এখন হয় না বললেই চলে। এখন পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় হয় মুদ্রার মাধ্যমে।

(৪) পণ্য এখন কদাচিৎ তার প্রকৃত মূল্যে বিক্রয় হয়। বাজারে চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে যে দাম স্থির হয়, সেই দামে পণ্য বিক্রি হয়। সেই দাম প্রকৃত-মূল্যের চেয়ে কখনও বেশি, কখনও বা কম হয়।

(৫) এখনও পণ্য উৎপাদনকারীর কাছে পণ্যোৎপাদনের মূল প্রেরণা ভোগ। পণ্যের যে অংশটি বণিকশ্রেণী উৎপাদনকারীর নিকট থেকে কিনে নিয়ে ভোগকারীর নিকট বিক্রয় করে, তা সে (বণিকশ্রেণী) করে মুনাফার উদ্দেশ্যে। সুতরাং উৎপাদনকারীর দিক থেকে বিচার করলে তখনও পণ্যোৎপাদনের মূল প্রেরণা ভোগ, মুনাফা নয়।

এমনি এক ঐতিহাসিক অবস্থায় বিশ্ব ইতিহাসে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। আমেরিকা ও আফ্রিকা মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়। ভারত ও চীনে আসার জলপথ আবিষ্কৃত হয়। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়। ফলে একদিকে যেমন বিনিময়ের পরিধি বেড়ে যায় ও বিনিময়যোগ্য পণ্যের চাহিদা বেড়ে যায়, তেমনি অন্যদিকে উৎপাদন শক্তির বিকাশের অভূতপূর্ব সুযোগ দেখা দেয়। আর এরই সুযোগ নিয়ে বণিকশ্রেণীর মধ্য থেকে উদ্ভব হয় বুর্জোয়া-শ্রেণীর। আর সেই বুর্জোয়াশ্রেণীই প্রবর্তন করে সর্বব্যাপী পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা। আর সেই উৎপাদন ব্যবস্থাই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা, যার মূল কথা হলো মুনাফার জন্য পণ্যোৎপাদন।

পুঁজিবাদের সূচনা

কি করে মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হয়

আগের অধ্যায়ের শেষদিকে আমরা দেখেছি যে, নতুন নতুন দেশ আবিষ্কৃত হলো, শুরু হলো তাদের সঙ্গে বিনিময়। বিনিময়ের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়তে লাগলো। আর এই ব্যবসা-বাণিজ্যই হলো পুঁজির ঐতিহাসিক ভিত্তি। ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য ও বাজারের প্রসার থেকেই পুঁজির আধুনিক ইতিহাসের সূচনা। আর পুঁজি প্রথম দেখা দেয় বাণিজ্যিক পুঁজি ও তেজারতি পুঁজি হিসাবে।

ঐতিহাসিক গতি অনুযায়ী পুঁজি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে মুদ্রা হিসাবে। আমরা প্রত্যহ দেখতে পাই মুদ্রা প্রথম পণ্য-বাজারে ও শ্রম-বাজারে হাজির হয়। তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা পুঁজিতে রূপান্তরিত হয়।

পণ্য সঞ্চালনই পুঁজির উৎপত্তি স্থল। কিন্তু তাই বলে সর্বপ্রকার পণ্য সঞ্চালন পুঁজি পুষ্টি করে না। পণ্য সঞ্চালনের দু'টি ধারা আমরা দেখেছি—প্রথমটি হল, পণ্য→মুদ্রা→পণ্য, আর দ্বিতীয়টি হল, মুদ্রা→পণ্য→মুদ্রা। পণ্য সঞ্চালনের এই ধারা দুটিকে বিস্তারিত আলোচনা করলেই আমরা বুঝতে পারব যে, প্রথমটিতে মুদ্রা শুধুই মুদ্রা, অর্থাৎ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করছে। অথচ, দ্বিতীয়টিতে মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হয়। মুদ্রা হিসাবে মুদ্রা এবং পুঁজি হিসাবে মুদ্রা—এই দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বুঝতে হলে বুঝতে হবে বিভিন্ন প্রকার পণ্য সঞ্চালনে মুদ্রা কি অংশ গ্রহণ করে।

পণ্য সঞ্চালনের সরল ধারাটি হলো—পণ্য 'ক'→মু→পণ্য 'খ'। এখানে পণ্য প্রথম মুদ্রায় পরিণত হয় এবং পরে মুদ্রাকে পুনরায় পণ্যে পরিণত করা হয়। এই সঞ্চালনে বিক্রয় করা হয় মুলতঃ ক্রয়ের জন্য। এখানে মুদ্রা ভিন্ন ব্যবহার-মূল্যের দুটি পণ্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

এই ধারার পাশাপাশি আমরা পণ্য সঞ্চালনের অন্য আর একটি ধারা দেখতে পাই। তা হলো, মু→প→মু। এখানে মুদ্রা প্রথম পণ্যে পরিণত হয় এবং পরে পণ্য আবার মুদ্রায় পরিবর্তিত হয়। এই প্রক্রিয়াটিতে প্রকৃতপক্ষে ক্রয় করা হয় বিক্রয়ের জন্য। আর এই দ্বিতীয় ধারাটির মধ্য দিয়েই মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হয়।

দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যেই ক্রয় ও বিক্রয়, পণ্য ও মুদ্রা এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা রয়েছে। কিন্তু ধারা দুটির ক্রম ও গতি আলাদা। প্রথমটি পণ্য থেকে শুরু হয়ে পণ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয়টি মুদ্রা থেকে শুরু হয়েছে আর ঠেকেছে গিয়ে মুদ্রায়।

এই ধারা দু'টির একটু বিস্তৃত আলোচনা করে দেখা যাক।

প্রথম ধারাটি হলো, পণ্য 'ক'→মু→পণ্য 'খ'। পণ্য 'ক'-এর ব্যবহার মূল্য পণ্য 'খ'-এর ব্যবহার মূল্য থেকে আলাদা। তাই এই প্রকার পণ্য সঞ্চালনের মূল প্রেরণাই হলো—এক প্রকার ব্যবহার-মূল্য ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রকার ব্যবহার-মূল্য সংগ্রহ করা। ভিন্নতর ব্যবহার-মূল্য সংগ্রহ করার এই ব্যবস্থার পিছনে ভোগ ছাড়া অন্য কোনো প্রকার প্রেরণাই কাজ করে না। আর প্রথম দৃষ্টিতেই এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারা যায়।

এই ব্যবস্থার অপর বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে বিনিময় হয় সমান সমান মূল্যের মধ্যে। সঞ্চালনের প্রথম অংশটি পণ্য 'ক'→মুদ্রা। এখানে পণ্য 'ক' ও তার বিনিময়ে প্রাপ্ত মুদ্রার মূল্য সমান, তাই তাদের মধ্যে বিনিময় হয়েছে। আবার দ্বিতীয় অংশ মুদ্রা→পণ্য 'খ'। এখানে মুদ্রা ও তার বিনিময়ে প্রাপ্ত পণ্য 'খ' এর মূল্য সমান হলেই বিনিময় হবে। মনে করি পণ্য 'ক'—১টি ধুতি এবং তার মূল্য ১০ টাকা। আবার পণ্য 'খ'—½ কুইনটাল ধান এবং তার মূল্য ১০ টাকা। এ অবস্থায় তাঁতি একটি ধুতি বিক্রয় করে পাবে ১০ টাকা। আবার সেই টাকা দিয়ে সে যদি ধান কিনতে যায়, তবে ½ কুইণ্টাল ধান পাবে। সুতরাং বিনিময়ের প্রতিটি অংশেই সমান সমান মূল্যের মধ্যে বিনিময় হয়েছে। আর মুদ্রা শুধু ধুতি ও ধানের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই কাজ করেছে।

দ্বিতীয় ধারাটি হলো, মু→প→মু। এই ধারার শুরুতে মুদ্রা আবার শেষেও মুদ্রা। গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রার ব্যবহার-মূল্য সব সময়ই এক ও অভিন্ন। সুতরাং এক প্রকার ব্যবহার-মূল্য দিয়ে অন্য প্রকার ব্যবহার মূল্য ফিরে পাওয়া কখনোই এই বিনিময়ের প্রেরণা হতে পারে না।

মু→প→মু এই ধারাটিকে আমরা দু'টি অংশে ভাগ করতে পারি—প্রথমটি হল মু→প, অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য ক্রয় করা হল। দ্বিতীয়টি হল, প→মু, অর্থাৎ সেই পণ্যকে বিক্রয় করে মুদ্রা পাওয়া গেল। আমরা জানি বিনিময় সব সময়ই হয় সমান সমান মূল্যের মধ্যে। সুতরাং, বাস্তবে এর অর্থ দাড়াবে—প্রথম ধাপে ১০০ টাকায় ৭৫ কেজি চাল ক্রয় করা হল এবং দ্বিতীয় ধাপে সেই ৭৫ কেজি চাল বিক্রয় করে আবার ১০০ টাকা ফিরে পাওয়া গেল। অর্থাৎ বিকিকিনির

ঝামেলা করে এবং ১০০ টাকা খাটিয়ে ১০০ টাকাই ফিরে পাওয়া গেল। এ যেন ডালে চালে মিশিয়ে নিয়ে, আবার বেছে বেছে ডাল ও চাল আলাদা করা। তাই প্রথম দৃষ্টিতে এই ধারাকে অর্থহীন বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু অর্থনৈতিক দুনিয়ায় এই প্রকার পণ্য সঞ্চালনের ধারা যখন চলছে, তখন এর পিছনে একটি রহস্য নিশ্চয়ই রয়েছে।

গুণের দিক দিয়ে বিচার করলে মুদ্রার ব্যবহার-মূল্যই এক; আর সেই ব্যবহার মূল্য হল—মুদ্রা দিয়ে পণ্য ক্রয় করা যায়। কিন্তু আবার বিভিন্ন পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য ক্রয় করা যায়। তাই বিভিন্ন পরিমাণ মুদ্রা থেকে বিভিন্ন পরিমাণ ব্যবহার-মূল্য পাওয়া যায়।

এই সত্যের মধ্যেই লুকিয়ে আছে এই ধারাটির রহস্য। এখানে ১০০ টাকা দিয়ে ৭৫ কেজি চাল ক্রয় করা হয় ঠিকই। কিন্তু বিক্রি করার সময় ৭৫ কেজি চাল ১১০ টাকায় বিক্রি করা হয়। আমরা আগেই দেখেছি যে, বিনিময়ের পরিমাণ ও পরিধি বেড়ে যাওয়ায় চাহিদা ও যোগানের যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল তার ফলেই বণিকশ্রেণীর পক্ষে কম দামে পণ্য ক্রয় করে বেশী দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়েছিল। এই ধারায় ক্রেতা যে পরিমাণ মুদ্রা দিয়ে পণ্য ক্রয় করে, পণ্য বিক্রয় করে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ মুদ্রা আদায় করে।

তাই সঞ্চালনের ধারাটি দাঁড়ায়—মু→প→মু´ (মুদ্রা+বাড়তি মুদ্রা)

অর্থাৎ ক্রেতা মুদ্রা হিসাবে যে পরিমাণ মূল্যকে পণ্য-মূল্যে রূপান্তরিত করে, পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করে সে পরিমাণ মূল্য তো ফিরে পায়ই, উপরন্তু কিছু বাড়তি মূল্যও পায়। এই বাড়তি-মূল্যকেই আমরা বলবো উদ্বৃত্ত-মূল্য। আর এই প্রক্রিয়াটিই মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করে। আর এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে যুক্ত থেকে মুদ্রার মালিক পুঁজিপতিতে পরিণত হয়। পুঁজিপতির পকেট থেকেই মুদ্রা তার যাত্রা শুরু করে। আবার প্রক্রিয়ার শেষে তার পকেটে ফিরে যায়; তবে ফিরে যায় পরিমাণে বেড়ে।

মু→প→মু´ এই ধারার বাস্তব ভিত্তি হলো মূল্যবৃদ্ধি। মূল্যবৃদ্ধির এই বাস্তব ভিত্তিকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাজে লাগিয়ে পুঁজিপতি অনবরত আরো বেশি বেশি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে, আরো বেশি বেশি করে সম্পদ জড়ো করে। উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করার প্রেরণাই তাকে একজন উদ্দেশ্যমূলক ও সচেতন পুঁজি-পতিতে পরিণত করে।

সে ক্রয় করে বিক্রয় করার জন্য। তাই পণ্যের ব্যবহার-মূল্যে তার উৎসাহ থাকতে পারে না। পণ্যের বিনিময়-মূল্যই তার একমাত্র লক্ষ্যবস্তু। আবার মাত্র

একবার বিকিকিনির মাধ্যমে মুনাফা কমিয়েই পুঁজিপতি সন্তুষ্ট হয় না। সে চায় অন্তহীন মুনাফার স্রোত। অর্থের প্রতি পুঁজিপতির এই লোভ কৃপণের লোভের মতো হলেও, পুঁজিপতি কৃপণের চেয়ে অনেক বাস্তববাদী। সে অর্থকে অকর্মণ্য করে ফেলে রাখে না, অর্থকে ব্যবহার করে আরো অর্থ সংগ্রহ করে।

মূল্য বিভিন্ন আকৃতিতে প্রকাশ পেতে পারে। কখনও তা প্রকাশ পায় পণ্য রূপে, কখনও মুদ্রারূপে। তবে মুদ্রা হলো মূল্যের সাধারণ রূপ, আর পণ্য হলো তার বিশেষ রূপ। বিনিময়ের সময় মূল্য পণ্যরূপ ছেড়ে মুদ্রা-রূপ নিলে বা মুদ্রা-রূপ ছেড়ে পণ্যরূপ নিলে তাতে মূল্যের পরিমাণের কোন হেরফের হয় না।

কিন্তু আমরা দেখলাম, বিনিময়ের এক বিশেষ ধারায় অর্থাৎ মু→প→মু´তে মূল্য পরপর রূপ পরিবর্তনের মধ্যেই উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে। এইরূপে মূল্য একটি সক্রিয় সত্তা হয়ে ওঠে। আর এই সক্রিয়তার ফলেই মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যিক পুঁজির বেলায় এই সক্রিয়তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বণিক ক্রয় করে বিক্রয় করার জন্য, অর্থাৎ বেশি দামে বিক্রয় করার জন্য। চাহিদা ও যোগানের অসঙ্গতির জন্য বাজারে দামের যে উঠতি পড়তি হয় বণিকশ্রেণী তার সুযোগ গ্রহণ করে। বণিক নিজে উৎপাদনকারী বা ভোগকারী কোনোটাই নয়, উৎপাদনকারী ও ভোগকারী অন্য লোক। বণিক উৎপাদনকারীর নিকট থেকে কম দামে পণ্য ক্রয় করে এবং ভোগকারীর নিকট থেকে বেশি দাম আদায় করে। সামাজিক উৎপাদনে কোনো নতুন মূল্য যোগ না করে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়কে ঠকিয়ে বণিক উদ্বৃত্ত-মূল্য সংগ্রহ করে।

কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের বেলায় তা হয় না। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিপতিরাই মূলতঃ সমস্ত উৎপাদন চালায়। সুতরাং তারাই হলো উৎপাদনকারী। তাই পুঁজিবাদী পুঁজির গতি-প্রকৃতি থেকে বাণিজ্যিক পুঁজির গতি-প্রকৃতিতে অনেক প্রভেদ। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

পুঁজির আদি সঞ্চয়

'মার্কসবাদ জানবো'এর প্রথম খণ্ডে সমাজ বিকাশের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখেছি "পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য দুটি ঐতিহাসিক পূর্বসর্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ কিছু লোকের হাতে বেশ কিছু অর্থ সম্পদ জমতে হবে। আর তা জমতে হবে এমন এক সময় যখন সাধারণ ভাবে পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা বিকাশের এক উচ্চস্তরে রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এমন একটি শ্রমিকশ্রেণী থাকতে হবে যা দু'টি অর্থে স্বাধীন

(১) শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করার ব্যাপারে সমস্ত বাধানিষেধ থেকে মুক্ত, অর্থাৎ সে একজন স্বাধীন ও নিরাসক্ত শ্রমিক, সে একজন সর্বহারা। নিজের শ্রম-শক্তি বিক্রয় করতে না পারলে সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।"
(লেনিন—কার্ল মার্কস)

সুতরাং পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রথম সর্তটি হলো : কিছু লোকের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থসম্পদ, অর্থাৎ মুদ্রা জমতে হবে। কিন্তু মুদ্রা হিসাবে মুদ্রা কখনোই পুঁজি নয়। এইমাত্র আমরা দেখলাম যে, উদ্বৃত্ত মুল্য সৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হয়। কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করতে হলে আবার চাই মুদ্রা পুঁজি। সুতরাং এ যেন এক গোলক ধাঁধাঁ।

আর এর থেকে বেরিয়ে আসার একটিমাত্র রাস্তাই রয়েছে। আর তা হলো—পুঁজির আদি-সঞ্চয় খুঁজে বার করা। পুঁজির আদি-সঞ্চয় কখনোই পুঁজিবাদী উৎপাদন থেকে পাওয়া সম্ভব হবে না। বলতে গেলে এই আদি সঞ্চয়ই হবে পুঁজিবাদের জন্মক্ষেত্র। সুতরাং পুঁজিবাদের সূচনার আগেই তার জন্ম হতে হবে। আর হয়েছিলও তাই-ই।

খ্রীষ্টান পুরোহিতদের মতে, মানবের আদি পিতা 'এডাম' জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়েছিল। সেই পাপের ফল ভোগ করছে আজকের বিশ্বের সাধারণ মানুষ, যারা সেই আদি পিতার অভিশপ্ত বংশধর। বুর্জোয়া অর্থ-নীতিবিদদের মতে, পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের ইতিহাসও প্রায় একই প্রকারের। তাদের মতে, "অতি পুরাকালে দু'রকমের লোক ছিল। তাদের একদল ছিল পরিশ্রমী ও চালাক, সর্বোপরি তারা ছিল সঞ্চয়ী ভদ্রলোক। আর অপর দলটি ছিল অলস ও নির্বোধ, আর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে গিয়ে তারা সব কিছু খরচ করে ফেলতো।...তাই এই কথাটাই চালু হয়ে গেছে যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা সম্পদ জড়ো করতে লাগলো। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের শেষ পর্যন্ত নিজেদের গায়ের চামড়া ছাড়া বেচবার মতো আর কিছুই অবশিষ্ট রইলো না। এই আদি পাপ থেকেই বিরাট সংখ্যক জন-সাধারণের দারিদ্র্যের সূচনা হয়েছে। তাই আজ শত পরিশ্রমের পরও একমাত্র নিজেকে ছাড়া বেচবার মতো তাদের আর কিছুই নেই। অথচ অনেক দিন আগে থেকেই যারা নিজেদের গা খাটিয়ে পরিশ্রম করা ছেড়ে দিয়েছে, এমনি গুটিকয়েক লোকের সম্পদ ক্রমাগতই বাড়ছে। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থার সাফাই হিসাবে এমনি সব ছেঁদো কথাগুলি আমাদের কাছে প্রতিদিন প্রচার করা হচ্ছে।...কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস বলে যে, রাজ্য গ্রাস, ক্রীতদাসত্ব, লুণ্ঠন, হত্যা, এক

কথায় বলতে গেলে বলপ্রয়োগই আদি-সঞ্চয় সৃষ্টি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে কুখ্যাত হয়েছে।" (মার্কস—ক্যাপিটাল)।

বুর্জোয়া পণ্ডিতরা যতই ইনিয়ে বিনিয়ে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করুন না কেন—পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের পেছনে কোনো অন্যায় অবিচার ছিল না, ইতিহাস কিন্তু উল্টো কথাই বলে। শত সহস্র উদাহরণসহ ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে, পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের কাহিনী হলো হত্যা, লুণ্ঠন, শোষণ-পীড়ন ও অত্যাচারের সুপারকল্পিত নিষ্ঠুর ঘটনাবলীর সমষ্টি। এর নজিরের জন্য আমাদের কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের লেখা ইতিহাস ও অন্যান্য রচনাবলীই যথেষ্ট।

এই লুণ্ঠন, পীড়ন, হত্যা ও আত্মসাতের ইতিহাসের একটি বিশেষত্ব রয়েছে; একদিকে এর শিকার হয়েছে যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিদেশী ও বিধর্মী জনসাধারণ, তেমনি অন্যদিকে স্বদেশের স্বজাতীয় জনসাধারণও এ থেকেই রেহাই পায়নি। বিদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করা হয়েছে, অধিবাসীদের ক্রীতদাসে পরিণত করে শোষণ করা হয়েছে, শিশু ও নারীসহ সেই সব দেশের স্থানীয় অধি-বাসীদের জোর করে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হয়েছে। আর স্বদেশে সামন্ত যুগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের জোর করে উচ্ছেদ করা হয়েছে উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপাদান থেকে। কৃষি ও হস্তশিল্প উভয় ক্ষেত্রেই তা করা হয়েছে। আর এই সব সম্পদ আত্মসাৎ করে গুটিকয়েক লোক হয়ে উঠেছে সম্পদশালী। তারাই হলো আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর পূর্বসূরী। উচ্ছেদ ও আত্মসাতের এই প্রক্রিয়াটি কখনই অহিংস উপদেশামৃত বিতরণের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়নি। তবুও যে সকল পণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের তা বিশ্বাস করাতে চান, হয় তারা নিজেরা সাধারণ বুদ্ধি বিবর্জিত, নয়তো তারা উদ্দেশ্যমূলক দুষ্টবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত।

পুঁজিবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল ইউরোপের কয়েকটি দেশে। তার মধ্যে ইংলণ্ডই প্রধান। পুঁজিবাদের সূচনা হয়েছিল সামন্ত সমাজ ব্যবস্থার ভগ্নস্তূপের উপর। আর সেই সময় সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা চূড়ান্ত বিকাশের যুগে ছিল। সুতরাং পুঁজির আদি সঞ্চয়ের ইতিহাস সেই সব দেশের সামন্ত ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশ ও পরবর্তী ভাঙনের সঙ্গে যুক্ত। আমরা আগেই দেখেছি যে, সামন্ত ব্যবস্থার মধ্যেই বিনিময়ের পরিধি ও বৈচিত্র বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বণিকশ্রেণীর সম্পদ ও প্রভাব বাড়তে থাকে। বণিকশ্রেণী উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উভয়কে ঠকিয়ে অর্থসম্পদ জড়ো করছিল। পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় তেজারতি কারবার। একদিকে তারা বিলাসী সামন্ত প্রভুদের চড়া সুদে ঋণের জালে জড়িয়ে সামন্ত ব্যবস্থার ভিত

আলগা করে ফেলছিল। অন্যদিকে অভাবগ্রস্ত কৃষক ও হস্তশিল্পীদের চড়া সুদের ঋণের নাগপাশে জড়িয়ে সর্বস্বান্ত করছিল। এমনি করেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও সুদের কারবারের মধ্য দিয়ে পুঁজির আদি সঞ্চয়ের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল।

এই যুগের কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা এই প্রক্রিয়াটিতে এক বৈপ্লবিক গতি সঞ্চার করে। ভারতের নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে বেরিয়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের ভাগ্যান্বেষণকারীর দল পাড়ি জমালো সেই দেশে। শুরু হলো সেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ। আর সেই সঙ্গে চলতে লাগলো সেই দেশের মালিক রেড ইনডিয়ানদের উপর অকথ্য অত্যাচার, শোষণ, পীড়ন ও হত্যাকাণ্ড। চাঙ্গা হয়ে ওঠে দাস ব্যবসা।

আফ্রিকা মহাদেশ অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু এতদিন তা অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশরূপেই পড়ে ছিল। এইবার সেই দেশের অভ্যন্তরেও ঢুকতে শুরু করলো স্বার্থলোভীর দল। আফ্রিকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ লুঠ করা শুরু হলো। ছলে-বলে কৌশলে প্রধানত উন্নততর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বলপ্রয়োগ করেই স্থানীয় অধিবাসীদের বশ করা হলো। নৃশংসতম ঘটনা এই যে, স্থানীয় অধিবাসীদের জোর করে ধরে নিয়ে ক্রীতদাস হিসাবে বেচে দেওয়া হতে লাগলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে; আর হত্যা? সে তো ডাল-ভাত। বিদেশীরা এদের প্রাণকে একটি মুরগির প্রাণের চেয়েও কম মূল্য দিত। এইসব বীভৎস, নৃশংস অত্যাচারের যে সামান্যতম বর্ণনা বিভিন্ন বুর্জোয়া লেখকদের মার্জিত রচনার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা দেখলেই যে কোন মানুষের মন ঘৃণায় ও ধিক্কারে কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

সমসাময়িক কালে ভাসকো-ডা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। ভারত ও চীনের সঙ্গে ইউরোপের স্থলপথে বাণিজ্য চলছিল অনেকদিন ধরে। তা হতো প্রধানত আরব বণিকদের মাধ্যমে। তাদের কাছেই তারা শুনেছিল ভারত ও চীনের অফুরন্ত সম্পদ ও সমৃদ্ধির কথা। এতদিন তারা উদগ্রীব হয়ে ছিল। নতুন জলপথ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকেরা পাড়ি জমালো ভারতের মাটিতে। শুরু হলো ব্যবসা-বাণিজ্যের নাম করে লুণ্ঠন। আর একই সঙ্গে চললো সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে ডাকাতি ও হানাদারি, যার সমুদ্রে জাহাজ লুঠ করা।

ক্রমে দেশীয় রাজন্যদের পারস্পরিক কলহের সুযোগ নিয়ে ও উন্নত ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে গোটা দেশটাই তারা দখল করে নিলো। বণিকের মানদণ্ড পরিণত হলো শাসকের রাজদণ্ডে। চললো নতুন কায়দায় শোষণ। রাজকার্যে

নিযুক্ত ইউরোপীয় কর্মচারীরাও দু'হাতে লুঠতে লাগলো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, আর শোষণ করতে লাগল দেশের জনগণকে। সে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের ইতিহাস; সভ্যতার এক কলঙ্কময় অধ্যায়। তার বিস্তারিত আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। দীর্ঘদিন ধরে চীনের সম্পদও এমনিভাবেই লুঠ করেছে এইসব বিদেশী লুঠেরার দল।

এমনিভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে গড়ে ওঠে প্রচুর অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধ এক বুর্জোয়াশ্রেণী। গড়ে ওঠে পুঁজির আদি-সঞ্চয়। এর পরও বুর্জোয়া পণ্ডিতগণ আমাদের বিশ্বাস করাতে চান যে, একশ্রেণীর ধর্মপ্রাণ সঞ্চয়ী ভদ্রলোকের ধৈর্য ও তিতিক্ষার ফলে পুঁজির আদি-সঞ্চয় সম্ভব হয়েছিল।

কিভাবে বিদেশী বিধর্মীদের লুণ্ঠন, পীড়ন ও হত্যার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের উদ্ভবের প্রথম শর্তটি পূরণ হয়েছে, তা আমরা দেখতে পেলাম। এইবার আমরা দেখবো কি করে স্বদেশের স্বজাতীয় জনগণকে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও বঞ্চনা করে পুঁজিবাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ হয়েছিল।

পুঁজিবাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় শর্তটি হলো : একটি স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণী। প্রথমতঃ এই শ্রমিকশ্রেণীকে সমস্ত দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। দ্বিতীয়তঃ তাকে মুক্ত হতে হবে সমস্ত সম্পদের মালিকানা থেকে, তাকে হতে হবে সর্বহারা। একমাত্র সম্পদ যা তার অবশিষ্ট থাকবে, তা হলো শ্রমশক্তি। এ অবস্থায় সে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার দায়ে তার শ্রমশক্তি বেচতে বাধ্য হবে সমস্ত সম্পদের মালিক পুঁজিপতি-শ্রেণীর নিকট। তবে পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হবে।

সুতরাং যে-প্রক্রিয়া দ্বারা এই শর্তগুলি পূরণ হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল দুটি (১) শ্রমিকশ্রেণীকে সামন্ত প্রথার ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করা, (২) সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা।

এই প্রক্রিয়াটি ঠিকমতো বুঝতে হলে প্রথমেই বুঝতে হবে সামন্তযুগের উৎপাদন ব্যবস্থাটি কিরূপ ছিল। সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় "ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই এই অবস্থা ছিল। সামাজিক উৎপাদনের বিকাশ ও শ্রমিকদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের জন্য সেই যুগে এই সব ক্ষুদ্র উৎপাদন-ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। ক্রীতদাসত্ব, ভূমিদাসত্ব বা অনুরূপ পরাধীনতার মধ্যেও ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা চলতে পারে। কিন্তু ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা একমাত্র সেখানেই উন্নততর বিকাশ লাভ করতে পারে—যেখানে উৎপাদনের উপাদানে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মালিকানা রয়েছে এবং তারা তাদের নিজস্ব শ্রম দ্বারা সেগুলি

কাজে লাগায়। অর্থাৎ যেখানে জমির কৃষক নিজেই জমি চাষ করে এবং যন্ত্রপাতির মালিক হস্তশিল্পী নিজেই দক্ষতার সঙ্গে তা দিয়ে কাজ করে। আর এই ব্যবস্থার মধ্যেই ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সমস্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তা সর্বোচ্চ স্তরে উঠতে পারে। এই উৎপাদন ব্যবস্থার পূর্বশর্ত ছিল জমিকে খণ্ড খণ্ড করে বিলি করা এবং উৎপাদনের উপাদানগুলি অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এই উৎপাদন ব্যবস্থা যেমন একদিকে উৎপাদনের উপাদানগুলিকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হতে দেয় না, তেমনি অপরদিকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উৎপাদনের কোনো একটি পদ্ধতির মধ্যে শ্রমবিভাগকে বাধা দেয়। আবার সমাজ নিজেই উৎপাদন ক্ষেত্রে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে—এই প্রস্তাবও ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থা মেনে নিতে রাজি নয়। তাছাড়া উৎপাদন শক্তির বাধাহীন বিকাশকেও এই ব্যবস্থা স্বীকার করে না। সুতরাং এই ব্যবস্থা এমন একটি উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ—যা একটি সংকীর্ণ এবং কম-বেশি আদিম পরিধির মধ্যেই ঘোরা-ফেরা করে। এ সম্বন্ধে 'পিকুয়ার' সঠিকভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, একে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ 'সার্বজনীন চলনসই মাঝারি অবস্থার ফতোয়া জারি করা'। বিকাশের এক স্তরে এই ব্যবস্থা নিজেই কিন্তু তার ধ্বংসের শক্তিকে ডেকে আনে। আর সেই সময় থেকেই সমাজের মধ্যে নতুন শক্তি ও নতুন প্রেরণার উদয় হয়। কিন্তু পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা চায়—সেই শক্তি ও প্রেরণাকে বেঁধে রাখতে, তাদের দমিয়ে রাখতে।" (মার্কস—ক্যাপিটাল)

তাই দেখা যাচ্ছে, সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক ছিল এমন একটি সংকীর্ণ সম্পক, যার মধ্যে নতুন উৎপাদন শক্তির বিকাশ সম্ভব ছিল না। তাই সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক ও নতুন বিকশিত উৎপাদন শক্তির মধ্যে বিরোধ বেধে যায়। অন্যভাবে বললে এর অর্থ দাঁড়ায়, একটি সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত। "তাই পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করার প্রয়োজন অবধারিতভাবে দেখা দেয়। আর সেই ব্যবস্থাকে নির্মূলও করা হয়। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা নির্মূল করার অর্থ ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র ও ছড়িয়ে-থাকা উৎপাদনের উপাদানগুলিকে সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত করা; অর্থাৎ অনেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তিগুলিকে অল্প কয়েকজনের বিশাল বিশাল সম্পত্তিতে পরিণত করা; অর্থাৎ জমি, জীবনধারণের উপায় ও শ্রমের উপাদানগুলি থেকে বিরাট সংখ্যক সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করা। আর বঞ্চনার এই ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক ঘটনাগুলিই হলো পুঁজির ইতিহাসের ভূমিকা। আবার তা হলো বলপ্রয়োগের ঘটনাবলীর এক ধারাবাহিক সমষ্টি।" (মার্কস—ক্যাপিটাল)

ইউরোপের দেশগুলিতেই পুঁজিবাদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল। আর তার মধ্যে

ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তই উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডে দাস ব্যবস্থা উঠে গেছে প্রায় চতুর্দশ শতকে। তখন ভূমি ব্যবস্থা গোটা ইওরোপে প্রায় একই প্রকারের ছিল। রাজা বা সামন্ত প্রভুদের নীচে থাকতো জমিদারশ্রেণী। তার নীচে থাকতো মধ্যস্বত্ব-ভোগীদের বিভিন্ন স্তর। সবার নীচে থাকতো কৃষক। জমিও সেই মতো ভাগ করা থাকতো।

জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষক। কৃষি মজুরের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। কৃষকরা জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগীদের অধীনে নিজ নিজ জমি চাষ করতো। কৃষকদের ছোট ছোট চাষ আবাদের পাশাপাশি থাকতো জমিদারের বিরাট বিরাট খামার। কৃষকরা সপ্তাহে কয়েকদিন এই সব খামারে খাটতো।

পঞ্চদশ শতক থেকেই পুঁজিবাদের সূচনা দেখা যায়। ঐ সময় রাজা ও জমিদারের মধ্যে বিরোধ বাধে। এই বিরোধের মধ্যে থেকে জন্ম নেয় এক নতুন অভিজাত-শ্রেণী। তাদের কাছে অর্থই ছিল একমাত্র শ্রেষ্ঠ শক্তি। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যে-কোনো উপায়ে অর্থ উপার্জন করা ও অর্থ সঞ্চয় করা। এর জন্য তারা যে-কোনো অত্যাচার অবিচার করতেও কুণ্ঠিত ছিল না।

ঐ সময়ে পশমের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। নতুন অভিজাতশ্রেণী দেখতে পেলো যে, চাষ-বাস উঠিয়ে দিয়ে সেই জমিতে যদি মেষ পালন করা যায়, তবে প্রচুর অর্থাগম হবে। তাই তারা প্রথমে বেআইনীভাবে সর্বসাধারণের ব্যবহার্য বারোয়ারি জমিগুলি জোর-জবরদস্তি ঘিরে নিলো। সেখানে পত্তন করলো মেষ-চারণ ক্ষেত্র। কিন্তু অর্থের লোভ সীমাহীন। তাই শুরু হলো নানা প্রকার বে-আইনী উচ্ছেদ। কৃষকদের বাড়ি-ঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো। আর সেই জায়গা ঘিরে নিয়ে তাতে পত্তন করা হল মেষ-চারণ ক্ষেত্র। অসংখ্য কৃষক ঘর-বাড়ি খুইয়ে সর্বহারায় পরিণত হলো। তারা ভিড় করতে লাগলো শহরাঞ্চলে। পুঁজিপতিদের প্রয়োজনীয় মজুরি-শ্রমিক পাওয়া গেলো। পুঁজিবাদের উদ্ভবের দ্বিতীয় শর্ত এখন পূরণের মুখে।

ষোড়শ শতকে উচ্ছেদ ও আত্মসাতের এই প্রক্রিয়া আরো জোরদার হলো। ইংলণ্ডের ক্যাথলিক চার্চগুলি ছিল বিরাট বিরাট জমিদারীর মালিক। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের আঘাতে সেগুলি ভেঙে পড়লো। চার্চের কর্মচারী ও আশ্রিত লোকেদের অধিকাংশই বেকারে পরিণত হলো। এই সব জমিদারী নামমাত্র মূল্যে কিনে নিলো রাজার আশ্রিত লোকেরা। নতুন মালিকরা কৃষকদের বংশানুক্রমিক স্বত্ব অস্বীকার করে জোর করে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করলো।

গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের চেয়ে একটু উচ্চস্তরের একটি শ্রেণী ছিল। প্রথমদিকে তারা ছিল জমিদারের গোমস্তা বা 'বেইলিফ'। তারা জমিদারের নিকট থেকে জমি বন্দোবস্ত নিয়ে কৃষি-মজুর খাটিয়ে চাষ করাতো। প্রথম দিকে জমিদারগণই এদের চাষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বীজ ধান, সার ইত্যাদি যোগান দিতো। পরে তারা নিজেরাই ঐ সব জোগাড় করতে শুরু করে। মজুর খাটিয়ে তারা যে উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতো, তা থেকে জমিদারের খাজনা দিতো। এমনি করেই ক্রমে তারা 'ফারমারে' পরিণত হলো। এরাই হলো গ্রামাঞ্চলে প্রথম প্রকৃত পুঁজিবাদী কৃষক।

জমি থেকে কৃষকদের বলপ্রয়োগে উচ্ছেদ ও গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী ফারমার প্রথার উদ্ভব-- এ দু'টোকেই শহরের পুঁজিপতিরা সমর্থন করেছে। কারণ এতে তাদের দু'দিক দিয়ে সুবিধা হয়েছে। প্রথমতঃ, বাড়ি জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে এই সব সর্বহারা কৃষক কারখানার মজুরি-শ্রমিকের যোগান নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয়তঃ, এই সব মজুরি শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের সর্বহারা মজুরি কৃষকরা কারখানার তৈরি নানা পণ্যের ক্রেতায় পরিণত হয়েছে। ফলে স্বদেশেই পুঁজিপতিদের পণ্যাদির একটি বড় বাজার সৃষ্টি হয়।

পূর্বে কৃষক ও তার পরিবারের লোকেরা মিলে নিজেদের জমিতে ফসল ফলাতো। অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী নিজেদের গ্রাম বা অঞ্চলের মধ্যেই তৈরী করতো। পুঁজিবাদের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাআনির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতি ভেঙে পড়তে লাগল। এখন উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও জীবন ধারণের সমস্ত উপায়ই পুঁজিপতিদের দখলে। পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করে শ্রমিক মজুরি অর্জন করে। আর সেই মজুরি দিয়ে সে পুঁজিপতিদের নিকট থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে। এমনি করে পুঁজিপতিদের পণ্যের একটি বাজার স্বদেশেই গড়ে ওঠে।

এমনিভাবে সামন্ত ক্ষুদ্র উৎপাদন ব্যবস্থার ধ্বংসস্তূপের ওপর গড়ে ওঠে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা।

আমরা আগেই দেখেছি যে, পুঁজির আদি সঞ্চয় প্রথম দেখা দিয়েছিল: (১) বাণিজ্যিক পুঁজি, (২) তেজারতি পুঁজি হিসাবে। কিন্তু সামন্ত প্রথার সাংবিধানিক বাধা অতিক্রম করে তারা গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী উৎপাদন চালু করতে পারেনি। আর শহরাঞ্চলে গিল্ড প্রথাই ছিল তাদের প্রধান শত্রু। সামন্ত ব্যবস্থার আওতায় গিল্ড প্রথা শহরের উৎপাদন ব্যবস্থা দখল করেছিল। গিল্ড ব্যবস্থায় শ্রমিকের সংখ্যা ও নিয়োগের নিয়ম-কানুন সামন্ত আইন দ্বারা নির্দিষ্ট ছিল। এই আইন-কানুনের মধ্যে থেকে কারখানা প্রথায় উৎপাদন চালানো সম্ভব ছিল না।

এ ছাড়া সামন্ত কর-প্রথা ও অন্যান্য বাধা-নিষেধও পুঁজিবাদের বিকাশের পথে অন্তরায় ছিল।

প্রথম দিকে পুঁজিপতিরা গিল্ডের আওতাভুক্ত শহরাঞ্চলের বাইরে কারখানা পত্তন করে। বন্দর ও নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে কারখানা স্থাপন করে। এই সব অঞ্চল মিউনিসিপ্যাল আইনের আওতার বাইরে ছিল। সেখানে লোকচক্ষুর আড়ালে শ্রমিক শোষণের কর্মকাণ্ড চলতে লাগলো নির্বিবাদে। অবশ্য পরে যখন গিল্ড প্রথা ভাঙতে শুরু করলো, তখন অনেক গিল্ড মালিক, জারনিম্যান ও আরটিজানও কারখানা স্থাপন করে পুঁজিবাদী প্রথায় উৎপাদন শুরু করেছিল।

পুঁজিবাদের পথের বাধা দূর করতে বুর্জোয়ারা শুধু গিল্ড প্রথার উচ্ছেদ করতেই চেষ্টা করেনি, অভিজাতশ্রেণীর বিনাশও তাদের লক্ষ্য ছিল। শ্রমিক-শ্রেণীর ওপর পুঁজির অবাধ শোষণের পথে সামন্ত ব্যবস্থাই ছিল প্রধান অন্তরায়।

প্রথম দিকে তারা সামন্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পায়নি, বরং বিরোধিতাই পেয়েছে। কিন্তু যখন থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর বুর্জোয়ারা তাদের অধিকার কিছুটা কায়েম করতে পারল তখন থেকেই তারা পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের কাজে রাষ্ট্রশক্তিকে ব্যবহার করতে শুরু করে। যেমন, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে কৃষকদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা বে-আইনী ছিল। তখন সব উচ্ছেদ হয়েছে জোর জুলুম করে। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে পার্লামেণ্টই আইন করে উচ্ছেদকে সমর্থন করেছে।

আবার দেখি, যখন বাড়ি-জমি থেকে বঞ্চিত করে সর্বহারা কৃষককে ভিক্ষুক, চোর ও দস্যুতে পরিণত করা হলো, তখন রাষ্ট্র নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। অথচ পরে এদের শায়েস্তা করার জন্য রাষ্ট্রই আইন করেছে। বুর্জোয়াদের ইচ্ছামতো কাজ করতে অস্বীকার করলে গালে অথবা পিঠে 'S' ছাপ দাগিয়ে দিয়ে তাকে ক্রীতদাস বলে চিহ্নিত করেছে।

শ্রমিকরা যাতে বেশি মজুরি দাবি করতে না পারে, তার জন্য পুঁজিপতিরা রাষ্ট্রকে দিয়ে আইন পর্যন্ত করিয়ে নিয়েছিল। ১৮২৫ সাল পর্যন্ত শ্রমিকসংগঠন করা ইংলণ্ডে বেআইনী ছিল।

এ ছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় ঋণ সংগ্রহ ব্যবস্থা, নতুন কর ব্যবস্থা, আমদানি ও রফতানি শুল্কনীতি, সংরক্ষণ নীতি প্রভৃতি প্রত্যেকটি কাজ পুঁজিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাই দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতাই সামন্ত সমাজ ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরণের প্রতি স্তরকে সহজতর ও সুসাধ্য করেছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ও মুনাফা

আমরা দেখলাম কি করে পুঁজিবাদের উদ্ভব হলো। এইবার অন্যান্য যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনা করে দেখবো এবং খুঁজে বার করবো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলো।

স্বাভাবিক পণ্যোৎপাদন ও পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের মূল পার্থক্য হলো : স্বাভাবিক পণ্যোৎপাদনের মূল প্রেরণা 'ভোগ' এবং পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের মূল প্রেরণা 'মুনাফা'।

স্বাভাবিক পণ্যোৎপাদনের যুগে নিজস্ব উৎপাদনের উপাদানের উপর উৎপাদনকারী বা তার নিযুক্ত ব্যক্তি শ্রম করে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপন্ন করতো। নিজের ভোগের পর উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ পণ্য হিসাবে অন্য উৎপাদনকারীর পণ্যের সঙ্গে বিনিময় করতো। অন্য ভাবে বললে, নিজের উৎপন্ন দ্রব্যের উদ্বৃত্ত অংশ পণ্য হিসাবে বিক্রয় করে মুদ্রা সংগ্রহ করতো এবং সেই মুদ্রা দিয়ে অন্য উৎপাদনকারীর পণ্য ক্রয় করতো। তাই সেই ব্যবস্থায় পণ্য সঞ্চালনের ধারা ছিল : পণ্য 'ক'→মু→পণ্য 'খ'। আগের অধ্যায়ে ধুতি ও ধানের উদাহরণসহ বিস্তৃত আলোচনা করে আমরা দেখেছি যে, সেই ধারার মূল প্রেরণা ছিল ভোগ।

কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পণ্য সঞ্চালনের ধারাটি হলো : মু→প→মু´ (মুদ্রা + বাড়তি মুদ্রা)। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়ায়—পুঁজিপতি মুদ্রা-পুঁজির বিনিময়ে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে। সেই পণ্যগুলির সংমিশ্রণে যে পণ্য উৎপন্ন হয় তা বিক্রয় করে পুঁজিপতি মূল পুঁজির সমান মুদ্রামূল্য তো ফিরে পায়ই, উপরন্তু বাড়তি কিছু মুদ্রামূল্যও পায়। এই বাড়তি মুদ্রামূল্যকেই আমরা বলব উদ্বৃত্ত-মূল্য, আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতির মুনাফার উৎস। আর এই মুনাফা লাভ করাই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল প্রেরণা।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের উৎপত্তিস্থল কোথায় ?

পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থাটিকে মূলতঃ তিনটি প্রক্রিয়ায় ভাগ করা যায় : (১) পুঁজির বিনিময়ে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করা বা পণ্য-ক্রয় প্রক্রিয়া (২) পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া (৩) উৎপন্ন পণ্যের বিনিময়ে মুদ্রা সংগ্রহ করা বা পণ্য-বিক্রয়

প্রক্রিয়া। স্বভাবতঃই মনে হতে পারে যে, উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলির যে কোনো একটিতে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়।

বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা আমাদের বোঝাতে চান যে, পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের মধ্যে মুনাফার উৎপত্তি হয়। তাঁরা আমাদের বিশ্বাস করতে বলেন যে পুঁজিপতি কম দামে পণ্য ক্রয় করে এবং সেই পণ্য পরে বেশি দামে বিক্রয় করতে পারে বলেই তার মুনাফা হয়।

কিন্তু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব। আমরা জানি, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিপতি শ্রেণীই সমস্ত পণ্যের উৎপাদক। সুতরাং এখানে পুঁজিপতি শ্রেণীই সমস্ত পণ্যের মালিক। এ অবস্থায় গোটা পুঁজিপতি শ্রেণীকে ধরে বিচার করলে কোনো একজন পুঁজিপতির লাভ হওয়ার অর্থ দাঁড়ায় অন্য পুঁজিপতির ক্ষতি হওয়া। সুতরাং একের লাভ ও অপরের ক্ষতিতে কাটাকাটি হয়ে কোনো সাধারণ লাভই থাকতে পারে না।

নীচের উদাহরণ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। মনে করি, কোনো এক সমাজে তিন জন পুঁজিপতি আছে। তাদের নাম রাম শ্যাম ও রহিম। আরো মনে করি যে, তাদের প্রত্যেকেই নিজের পণ্য শতকরা ১০ টাকা লাভে বিক্রয় করে।

যেহেতু তারা একই সমাজের অধিবাসী, তারা পরস্পরের পণ্য অবশ্যই ক্রয় করবে। মনে করি, রাম তার ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য শ্যামকে বিক্রয় করে ১১০ টাকায়। সুতরাং বিক্রেতা হিসাবে রামের মুনাফা হয় ১০ টাকা, আর ক্রেতা হিসাবে শ্যামের ক্ষতি হয় ১০ টাকা। আবার শ্যাম যখন ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য রহিমকে ১১০ টাকায় বিক্রয় করে তখন বিক্রেতা হিসাবে শ্যামের ১০ টাকা লাভ হয়, অথচ ক্রেতা হিসাবে রহিমের ১০ টাকা ক্ষতি হয়। আবার আমাদের প্রস্তাব মতো রাম অবশ্যই রহিমের পণ্য ক্রয় করবে। আর বাস্তব ক্ষেত্রে তাইই ঘটে। কারণ যদি কেউ বলে যে, আমি কেবল পণ্য বিক্রয়ই করবো, কখনও পণ্য ক্রয় করবো না, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অবাস্তব। তাই রাম ১১০ টাকা দিয়ে রহিমের ১০০ টাকা মূল্যের পণ্য ক্রয় করবে। এতে রহিমের মুনাফা হবে ১০ টাকা আর রামের ক্ষতি হবে ১০ টাকা।

এইবার তিন জনের বিকিকিনির মোট ফল কি দাঁড়ালো? বিক্রেতা হিসাবে প্রত্যেকেরই ১০ টাকা করে মুনাফা হলেও ক্রেতা হিসাবে প্রত্যেকের ১০ টাকা করে ক্ষতি হয়েছে। মোটের উপর কোন সাধারণ লাভ ক্ষতি রইলো না।

তাই দেখা যাচ্ছে যে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যেই মুনাফার উৎপত্তি হয়, বুর্জোয়া পণ্ডিতদের এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার উপরে উল্লিখিত ১ম ও ৩য় প্রক্রিয়ার কোনোটিতেই মুনাফার উৎপত্তি হয় না।

বাকি থাকে ২য় প্রক্রিয়াটি, অর্থাৎ পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া। এইবার পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়াটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাক

পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়া হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণীর নির্দেশ মতো উৎপাদন ও আদিম যুগ থেকে আরম্ভ করে সামন্তযুগের উৎপাদনের মধ্যে কোনো প্রকার প্রভেদ নেই। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মূল উপাদান দু'টি : প্রকৃতি ও মানুষ। অবশ্য মানুষও প্রকৃতিরই একটি অংশ। তবে তা হলো প্রকৃতির সবচেয়ে সচেতন ও সক্রিয় অংশ। প্রকৃতির এই সচেতন অংশ মানুষ, প্রকৃতির বাকি অংশের উপর নিজের শ্রম প্রয়োগ করে। শ্রম প্রয়োগ করে মানুষ প্রকৃতির বস্তু ও শক্তিতে ব্যবহার মূল্য সৃষ্টি করে। আর সেই ব্যবহার মূল্য মানুষের কোনো না কোনো প্রকার অভাব মেটায়।

মানুষ কিন্তু শ্রম শুরু করার আগেই মনে মনে ঠিক করে নেয় কি সে করবে। একেই বলা হয় পরিকল্পনা। শ্রম করার সময় মানুষ তার হাত, পা, মাথা খাটায়। আর এদের সাহায্যে শ্রম করে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে। এইখানেই মানুষ ও অন্যান্য পশুপক্ষীর মধ্যে প্রধান পার্থক্য।

"শ্রম প্রক্রিয়ার মৌলিক উপাদানগুলি হলো : (১) মানুষের ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ড অর্থাৎ কাজ (২) যে-বিষয়ের উপর কাজ প্রয়োগ করা হয় এবং (৩) কাজের যন্ত্রপাতি।" (মার্কস —ক্যাপিটাল)

প্রকৃতি কখনই তার অস্তিত্বের জন্য মানুষের উপর নির্ভরশীল নয়। অথচ প্রকৃতিই মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সব কিছু যোগান দেয়। এই প্রকৃতিই হলো কাজের বিষয়। মানুষ এই প্রকৃতির উপরই তার কাজ বা শ্রম প্রয়োগ করে। যেমন, চাষের জমি কাজের বিষয়; সেই জমির উপর শ্রম প্রয়োগ করে মানুষ চাষ-বাস করে; তবে ফসল হয়।

শ্রমের বিষয় ও শ্রমিকদের মাঝখানে থাকে শ্রমের যন্ত্রপাতি। শ্রমের যন্ত্রের মধ্য দিয়ে শ্রমিকের শ্রম তার শ্রমের বিষয়ে পরিচালিত হয়। শ্রমিক বিভিন্ন জিনিসের যান্ত্রিক, জৈবিক ও রাসায়নিক শক্তি ব্যবহার করে তার শ্রমের বিষয়টিকে নিজের উদ্দেশ্য মতো পরিবর্তন করে। প্রথম দিকে মানুষ কেবলমাত্র তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারাই ফল-মূল সংগ্রহ করতো। সেই অবস্থার কথা বাদ দিলে, মানুষ

প্রথম যা যোগাড় করেছিল তা হলো, শ্রমের যন্ত্রপাতি, শ্রমের বিষয় নয়। সেই যন্ত্রও সে প্রথম দিকে প্রকৃতি থেকেই সংগ্রহ করেছে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উঁচু গাছ থেকে ফল পাড়ার জন্য মানুষ প্রকৃতি থেকে গাছের ডাল ভেঙে নেয়। সেই ডাল তখন কাজ করে ফল পাড়ার যন্ত্র হিসাবে। আর এমনি করে সে তার নিজের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন আনে। গাছের উঁচু ডাল থেকে ফল পাড়তে গিয়ে সে দেখতে পেয়েছে তার হাত প্রয়োজনের তুলনায় খাটো। তাই ডালের সাহায্য নিয়ে সে তার হাতের দৈর্ঘ বাড়িয়ে নিয়েছে। সুতরাং প্রকৃতিই হলো মানুষের যন্ত্রপাতির আদিম যোগানস্থল।

আবার দেখি একটি লম্বা ডালের এক প্রান্তে আর একটি ছোট ডাল বেঁধে নিয়ে তৈরি হয় আঁকশি। আঁকশি লাঠির চেয়ে উন্নত ধরনের যন্ত্র। আর তা তৈরি হল প্রকৃতির উপর বার বার পরিকল্পিত শ্রম প্রয়োগ করে। এমনিভাবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সমস্ত যন্ত্রপাতিই প্রকৃতির উপর মানুষের পর্যায়ক্রমিক শ্রমের ফল অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা সঞ্চিত অতীত শ্রম। সুতরাং যন্ত্র দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য নির্ণয় করার সময় আমাদের এই কথাটি মনে রাখতে হবে।

উৎপাদনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা সোজাসুজি প্রকৃতিকে কাজের বিষয় হিসাবে গ্রহণ করি না। প্রকৃতির উপর মানুষ পূর্বে শ্রম করে যে জিনিস তৈরি করেছে, তাকে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ্য দ্রব্য হিসাবে ভোগ না করে তাকে কাজের বিষয় হিসাবে ব্যবহার করি। যেমন চাষী প্রকৃতির জমির উপর কাজ করে তুলো, ধান বা আখ উৎপন্ন করেছে। এইবার তাঁতি তুলোকে শ্রমের বিষয় করে সুতো তৈরি করতে পারে, কাপড় বুনতে পারে। ময়রা ধানকে শ্রমের বিষয় করে খই তৈরি করতে পারে, মুড়কি তৈরি করতে পারে। চাষী আখকে তখন তখনই খেয়ে না ফেলে তা থেকে রস নিঙড়ে তা জাল দিয়ে গুড় তৈরি করতে পারে। তখন আমরা তুলো, ধান ও আখকে বলি কাঁচামাল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কাঁচামাল হল প্রকৃতির উপর মানুষের অতীত শ্রমের ফল, অর্থাৎ পুঞ্জীভূত বা সঞ্চিত অতীত শ্রম। তবে শ্রমযন্ত্র ও কাঁচামালের মধ্যে মূল পার্থক্য হল—কাঁচামাল হচ্ছে শ্রমের বিষয়; আর যন্ত্র হল সেই বিষয়ে শ্রম প্রয়োগ করার হাতিয়ার।

তাই বলে এ কথা ভাবলে ভুল করা হবে যে, এই এই জিনিস কাঁচামাল, এই এই জিনিস ভোগ্যদ্রব্য—এমনিভাবে ভাগ করা যায়। একই জিনিস ব্যবহার ভেদে কখনও ভোগ্যদ্রব্য, কখনও কাঁচামাল হতে পারে। যেমন, আখকে যখন আমরা সোজাসুজি খেয়ে ফেলি তখন তা হয় ভোগ্যদ্রব্য। আবার যখন তা থেকে

রস নিয়ে গুড় তৈরি করি তখন সেই আখই হয়ে পড়ে কাঁচামাল। তাছাড়া একই জিনিস আবার নানা প্রকার ভোগ্যদ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন, ভাত, মুড়ি, প্রভৃতি অনেক কিছু ভোগ্যদ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হলো চাল।

সব কাঁচামালই তা হলে পূর্বে কোনো এক বা একাধিক সময়ে মানুষ শ্রম করে তৈরি করেছে। সুতরাং কাঁচামাল মূলতঃ প্রকৃতির উপর মানুষের অতীত শ্রমের ফল, অর্থাৎ পুঞ্জীভূত অতীত শ্রম। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিক কাঁচামালকে শ্রমের বিষয় হিসাবে নিয়ে তার উপর শ্রম প্রয়োগ করে। কাঁচামালের ব্যবহার মূল্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমান শ্রমিক তার বর্তমান শ্রম দ্বারা তাতে নতুন ব্যবহার মূল্য সৃষ্টি করে। কাঁচামালের মূল্য হলো তাতে যতটুকু অতীত শ্রম সঞ্চিত আছে। আর এই মূল্যের উপর নতুন শ্রম প্রয়োগ করে যে নতুন দ্রব্য তৈরি হয়, তার মূল্য কাঁচামালের মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। এমনিভাবে মানুষের শ্রম তার উৎপন্ন দ্রব্যে মূল্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও শ্রমিকের বর্তমান শ্রম—এই তিনের মিশ্রণে যে-দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তা মূলত সমস্তটাই মানুষের শ্রমের ফল। নতুন দ্রব্যের যে মূল্য হয় তা হলো—

কাঁচামালের মূল্য+শ্রম যন্ত্রের মূল্য+বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট মূল্য।

প্রথম দু'টি হলো সঞ্চিত অতীত শ্রম, আর তৃতীয়টি হলো নতুন প্রাণবন্ত শ্রম। সুতরাং সমস্তটাই মানুষের শ্রমের ফসল।

এইবার আমরা দেখবো নতুন দ্রব্যের মূল্যে এই তিনটি অংশের কোনটির কি পরিমাণ থাকবে। প্রথমত, যদি দেখা যায় যে, কোনো একটি দ্রব্য তৈরি করতে কাঁচামালের সবটাই শেষ হয়ে গেছে, তবে কাঁচামালের গোটা মূল্যই নতুন দ্রব্যটির মূল্যে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু যদি কাঁচামালের একটি অংশ মাত্র নতুন দ্রব্যটি তৈরি করতে ব্যয় হয়, তবে নতুন দ্রব্যের মূল্যে কাঁচামালের মূল্যের হারাহারি অংশই মাত্র থাকবে।

দ্বিতীয়ত, শ্রমযন্ত্র সাধারণতই একটি মাত্র দ্রব্য তৈরি করে শেষ হয়ে যায় না। সাধারণতই বছরের পর বছর অনেক দ্রব্য তৈরি করে তবে তার আয়ু শেষ হয়। সুতরাং শ্রমযন্ত্রের তৈরি প্রতিটি দ্রব্যের মূল্যে শ্রমযন্ত্রের মূল্যের হারাহারি অংশই মাত্র থাকবে।

তৃতীয়ত, বর্তমান শ্রমিকের ব্যাপারটি দেখা যাক। একটি দ্রব্য তৈরি করতে বর্তমান শ্রমিক শ্রমযন্ত্রের সাহায্যে কাঁচামালের উপর যতটুকু শ্রম প্রয়োগ করে,

তার সবটাই নতুন দ্রব্যে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং বর্তমান শ্রমিক নতুন দ্রব্যটি যতক্ষণ ধরে তৈরি করে, ততক্ষণে সামাজিক নির্বিশেষ শ্রমের মূল্যের সবটাই নতুন দ্রব্যের মূল্যে উপস্থিত হয়। তাই দেখা যাচ্ছে :

নতুন দ্রব্যের মূল্য = কাঁচামালের হারাহারি মূল্য (সঞ্চিত অতীত শ্রমের হারাহারি অংশ) + শ্রমযন্ত্রের হারাহারি মূল্য (সঞ্চিত অতীত শ্রমের হারাহারি অংশ) + বর্তমান শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য

মনে করি, এক কেজি সুতো থেকে একজন তাঁতী একজোড়া ধুতি তৈরি করল। আরো মনে করি, এক কেজি সুতোতে ৩০ ঘণ্টার অতীত শ্রম সঞ্চিত হয়েছে, এক জোড়া ধুতি তৈরি করতে তাঁত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে সঞ্চিত অতীত শ্রমের ৮ ঘণ্টার শ্রম ক্ষয় হয়, এবং এক জোড়া ধুতি বুনতে তাঁতী ১০ ঘণ্টার সামাজিক নির্বিশেষ শ্রম ব্যয় করে। এ অবস্থায় :

১ জোড়া ধুতির মূল্য=৩০ ঘণ্টার অতীত শ্রম+৮ ঘণ্টার অতীত শ্রম +১০ ঘণ্টার নতুন শ্রম—মোট ৪৮ ঘণ্টার শ্রম

এখন, প্রতি ঘণ্টা শ্রমের মূল্যকে যদি ৫০ পয়সা দ্বারা প্রকাশ করা যায়। তবে ধুতি জোড়ার মূল্য দাঁড়াবে (৪৮×·৫০) টাকা= ২৪ টাকা।

পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার এই মৌলিক শর্তগুলি আদিম যুগের উৎপাদন ব্যবস্থায় যেমন সত্য ছিল, বর্তমান উন্নত পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও তেমনি সত্য।

আমরা পূর্বেই দেখেছি, বিকি-কিনি বা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি হয় না। এইবার আমরা দেখতে পাবো পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন মূল্য সৃষ্টি হয় বটে, তবে সেই মূল্য কখনই উদ্বৃত্ত-মূল্য নয়।

মনে করি, একজন মুচি ১০ টাকা মূল্যের চামড়ার উপর এক রোজ শ্রম করে এক জোড়া জুতো তৈরি করলো। আরো মনে করি, এক জোড়া জুতো তৈরি করতে ১ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্ষয় হয়। জুতোর মূল্য নিশ্চয়ই চামড়ার মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। মনে করি, জুতো জোড়ার মূল্য হলো ১৬ টাকা। এই নতুন মূল্যের মধ্যে আছে চামড়ার (কাঁচামাল) মূল্য—১০ টাকা, যন্ত্রপাতির (ক্ষয়ক্ষতির হারাহারি অংশ) মূল্য=১ টাকা, আর মুচির এক রোজের শ্রমের মূল্য। সুতরাং মুচির এক রোজের শ্রম যে মূল্য সৃষ্টি করলো, তা হলো [১৬—(১০+১)] টাকা=৫ টাকা। মুচি শ্রম যে-মূল্য সৃষ্টি করলো, তা নিশ্চয়ই

নতুন মূল্য, কারণ মুচির এক রোজের শ্রমেই এই মূল্য সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তা কখনই উদ্বৃত্ত মূল্য নয়।

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যেমন বিনিময় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না, তেমনি পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় না।

উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয় কিভাবে ?

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পণ্য সঞ্চালনের ধারাটি হলো মু→প→মু´। এর অর্থ হল পুঁজিপতি মুদ্রাপুঁজি খরচ করে পণ্য ক্রয় করে এবং পরে সেই পণ্য বিক্রয় করে মুদ্রাপুঁজি ফিরে পায়। আবার যেহেতু পুঁজিবাদী পণ্য সঞ্চালনের মূল প্রেরণাই হলো মুনাফা, সুতরাং 'দ্র' অবশ্যই 'মু´'-এর চেয়ে বড় হয় এবং (মু´—ম)-কেই আমরা বলি উদ্বৃত্ত মূল্য, যা কিনা পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার উৎস। সুতরাং উদ্বৃত্ত মূল্য তথা মুনাফা সৃষ্টি করেই মুদ্রা পুঁজিতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু মুদ্রা হিসাবে মুদ্রার মধ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, বিনিময় হয় সব সময় সমান সমান মূল্যের মধ্যে এবং মুদ্রা শুধু সমান সমান মূল্যের বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

পণ্য সঞ্চালনের ধারায় 'মু→প' এই ধাপটিতে পুঁজিপতি যখন মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য সংগ্রহ করে তখন মুদ্রা হিসাবে পুঁজিপতি যতটুকু মূল্য দিয়ে দেয়, পণ্য হিসাবে ততটুকু মূল্য ফিরে পায়। সুতরাং এখানে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। আবার পণ্য সঞ্চালনের 'প→মু´'—এই ধাপটিতে পুঁজিপতি পণ্য হিসাবে যে মূল্য দিয়ে দেয়, মুদ্রা হিসাবে তা ফিরে পায়। সুতরাং এখানেও উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হতে পারে না।

এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির ঘটনাটিকে একমাত্র তখনই ব্যাখ্যা করা যায় যখন পণ্য সঞ্চালনের প্রথম ধাপে মুদ্রার বিনিময়ে পুঁজিপতি যে-সকল পণ্য ক্রয় করে, দ্বিতীয় ধাপে তা বিক্রয় করার আগেই সেইসব পণ্যের মধ্যে বা তাদের কোন একটি অংশের মধ্যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। কারণ, একমাত্র তখনই পণ্য বিক্রয় করে পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য পেতে পারে। সুতরাং পুঁজিপতিকে এমন একটি পণ্য ক্রয় করতে হবে যার ভোগ বা প্রয়োগের মধ্যেই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। আবার আমরা জানি যে, একমাত্র মানুষের শ্রমই মূল্য সৃষ্টি করে। তাই পণ্যটি অবশ্যই এমন হবে যার ভোগ বা প্রয়োগই হলো শ্রম, অর্থাৎ পণ্যটি হবে:'শ্রম করার ক্ষমতা' বা 'শ্রমশক্তি'। আর শ্রমিকের রয়েছে 'শ্রম করার ক্ষমতা'। সুতরাং পণ্যটি হবে

'শ্রমিকের শ্রমশক্তি'। একটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। পুঁজিবাদী পণ্য সঞ্চালনের সাধারণ ধারা 'মু→প→মু´'-কে উপরোক্ত আলোচনায় ভিত্তিতে নিম্নরূপে বিস্তৃত করা যায়— মু→প→প´→মু´'। আবার তাকে নিম্নরূপ তিনটি ধাপে বিভক্ত করা যায়,—(১) মু→প (২) প→প´ (৩) প´→মু´।

ধাপ তিনটির বাস্তব ব্যাখ্যা এই যে—(১) প্রথম ধাপে (অর্থাৎ মু→প) পুঁজিপতি মুদ্রা পুঁজির বিনিময়ে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, শ্রমিকের শ্রমশক্তি ইত্যাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপাদান পণ্য হিসাবে সংগ্রহ করে। যেহেতু বিনিময় হয় সমান সমান মূল্যে, তাই যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদি পণ্যের জন্য পুঁজিপতি তাদের মূল্যের, অর্থাৎ উৎপাদন ব্যয়ের সমান মূল্য দিয়ে তাদের সংগ্রহ করে। তেমনি শ্রমিকের শ্রমশক্তিরূপ পণ্যের বিনিময়ে শ্রমিককে যে মজুরি দেয় তা তার শ্রমশক্তিরূপ পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বা মূল্যের সমান হয়। সুতরাং মনে রাখতে হবে যে শ্রমিকের মজুরি তার শ্রমশক্তিরূপ পণ্যের দাম, তার শ্রমের দাম নয়।

(২) দ্বিতীয় ধাপে (প→প´) পুঁজিপতি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দিয়ে শ্রমিককে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত করে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিক কাঁচামালের উপর তার শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে, ফলে নতুন পণ্য উৎপন্ন হয়। নতুন পণ্যে যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ইত্যাদির হারাহারি মূল্য ফিরে এলেও, বর্তমান শ্রমিক তার শ্রমশক্তি খাটিয়ে যে শ্রম করে তার ফলে পণ্যে নতুন মূল্য সংযোজিত হয়। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে যে পরিমাণ মজুরি মূল্য দেয়, শ্রমিক শ্রম করে তার চেয়ে বেশি পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে। সুতরাং নতুন পণ্য 'প´' এর মূল্য সব সময়ই 'প' এর মূল্যের চেয়ে বেশি হয়।

(৩) তৃতীয় ধাপে (অর্থাৎ প´→মু´) পুঁজিপতি নতুন পণ্য বিক্রয় করে মুদ্রা পুঁজি ফিরে পায়। যেহেতু 'প´'-এর মূল্য 'প'-এর মূল্যের চেয়ে বেশি, সুতরাং 'মু´' অর্থাৎ 'প´'-এর বিনিময় মূল্য অবশ্যই 'মু অর্থাৎ 'প'-এর বিনিময় মূল্যের চেয়ে বেশি হবে। তাই পুঁজিপতি 'মু' হিসাবে যে পুঁজি-মূল্য খরচ করে 'মু´' হিসাবে তার চেয়ে বেশি পুঁজি-মূল্য ফিরে পায়। আবার যেহেতু মু´ থেকে মু-এর বিয়োগ-ফলরূপ এই বাড়তি মূল্যের জন্য পুঁজিপতি কাউকে কিছু দেয় না, সুতরাং এই মূল্য হলো 'উদ্বৃত্ত-মূল্য'।

উপরোক্ত উদাহরণ থেকে একথা স্পষ্ট হলো যে, শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করা এবং পুঁজিবাদী-পদ্ধতিতে তা ভোগ বা ব্যবহার করার মধ্যেই রয়েছে উদ্বৃত্ত-মূল্যের

উৎপত্তিস্থল। আরো দেখা যাচ্ছে যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন চলতে হলে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে অবশ্যই পণ্য হতে হবে। এর অর্থ হল, এমন এক পরিস্থিতি থাকতে হবে যেন শ্রমিক পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

শ্রমশক্তি কি করে পণ্য হলো

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, পুঁজিবাদের অন্যতম শর্ত হলো সর্বহারা শ্রমিক-শ্রেণী। এই সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপাদান, এমন কি বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান থেকেও বঞ্চিত। তার একটি মাত্র সম্পদ অবশিষ্ট আছে, আর তা হলো—তার শ্রমশক্তি। "শ্রমশক্তি বা শ্রম করার ক্ষমতা বলতে মানুষের অন্তর্নিহিত সেই সব মানসিক ও শারীরিক কর্মশক্তির সমষ্টিকে বোঝায়, যা মানুষ যে-কোন প্রকার ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টির সময় ব্যবহার করে।" (মার্কস—ক্যাপিটাল)

'পুঁজিবাদের সূচনা' অধ্যায়ে আমরা পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের ইতিহাস দেখেছি। সেখানে দেখেছি কি করে সামন্ত যুগের ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের একটি বিরাট অংশকে তাদের সমস্ত সম্পদ অর্থাৎ জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল এমন কি তাদের জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের পরিণত করা হয়েছে সর্বহারায়। আর এদের সেই সম্পদ আত্মসাৎ করে, তা জড়ো করে সৃষ্টি হয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণী। পুঁজিপতিশ্রেণীর দখলে রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপাদান, অর্থাৎ জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জীবনধারণের সমস্ত উপায় প্রভৃতি।

শ্রমিকশ্রেণীর অধিকারে রয়েছে একটিমাত্র সম্পদ তা হলো, তার শ্রমশক্তি। কিন্তু শ্রমের যন্ত্রপাতি বা শ্রমের বিষয় অর্থাৎ জমি, কাঁচামাল ইত্যাদি কোনো কিছুই তার হাতে না থাকায় সে তার শ্রমশক্তিকেও কাজে লাগাতে পারে না। উপরন্তু তার একমাত্র সম্বল শ্রমশক্তিকে বজায় রাখতেও সে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ মানুষের শরীরের অস্তিত্বের সঙ্গে তার শ্রমশক্তির অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। আবার শরীরকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে চাই খাদ্য, আশ্রয় ইত্যাদি জীবন ধারণের উপায়। সেই জীবন ধারণের উপায় থেকেও শ্রমিকশ্রেণীকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এমনি এক অসহায় অবস্থায় ফেলে শ্রমিককে তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। কারণ পুঁজিপতিশ্রেণীর নিকট তার একমাত্র সম্পদ শ্রমশক্তি বিক্রয় করেই শ্রমিকশ্রেণী বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় জীবনধারণের ন্যূনতম উপায় সংগ্রহ করতে পারে। এমনি করে শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হয়।

"শ্রমশক্তি সব সময় পণ্য ছিল না। আর শ্রমও সব সময় মজুরি-শ্রম, অর্থাৎ স্বাধীনশ্রম ছিল না। কৃষকের কাছে গরু তার সেবাকে যতটুকু বিক্রি করে, ক্রীতদাস তার মালিকের কাছে তার শ্রমশক্তিকে ততটুকুর চেয়ে বেশি বিক্রি করে না। তার শ্রমশক্তি সহ ক্রীতদাস একেবারেই তার মালিকের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। সে এমন একটি পণ্য যা এক মালিকের হাত থেকে অন্য মালিকের হাতে যেতে পারে। সে নিজেই পণ্য, কিন্তু তার শ্রমশক্তি তার পণ্য নয়। ভূমিদাস তার শ্রমশক্তির একটি অংশ বিক্রি করে। জমির মালিকের কাছ থেকে সে কোন মজুরি পায় না, উপরন্তু জমির মালিকই ভূমিদাসের কাছ থেকে খাজনা পায়।" (মার্কস- মজুরি শ্রম ও পুঁজি)। আর মজুরি-শ্রমিক নিজে তো পণ্য নয়ই, বরং সে পণ্যের মালিক। তার পণ্য তার শ্রমশক্তি। আর "বিকাশের সর্বোচ্চস্তরে শ্রমশক্তি যখন নিজেই পণ্য হয়ে পড়ে, সেই সময়ের পণ্যোৎপাদনকেই বলা হয় পুঁজিবাদ।" (লেনিন—সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চস্তর)।

শ্রমশক্তির মূল্য কিভাবে ঠিক হয়

এইমাত্র আমরা দেখলাম, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি কি করে পণ্যে পরিণত হয়। যে কোন পণ্য ক্রয় করতে হলেই তার জন্য দাম দিতে হয়। সুতরাং শ্রমশক্তি ক্রয় করতে পুঁজিপতিকে দাম দিতে হয়। আর শ্রমশক্তির এই দামকেই বলা হয়, মজুরি বা সাধারণভাবে যাকে বলা হয়, শ্রমের দাম।

আমরা জানি কোনো পণ্যের দাম ঠিক হয় তার উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণ দ্বারা, অর্থাৎ সেই পণ্যটি তৈরি করতে যতটুকু সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম ব্যয় হয়েছে তার পরিমাণ দ্বারা। আর যেহেতু এখন শ্রমশক্তি একটি পণ্য, তার দাম বা মজুরি ঠিক হবে সেই একই নিয়মে। সুতরাং শ্রমিকের শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন করতে যে পরিমাণ সামাজিক প্রয়োজনীয় শ্রম ব্যয় হয়, শ্রমিকের মজুরি মূল্য হবে তার সমান।

এখন প্রশ্ন হলো শ্রমশক্তির উৎপাদন বলতে কি বোঝায় ?

আমরা জানি শ্রমিকের শরীরই হলো শ্রমশক্তির আধার। তাই শ্রমিকের শরীরের অস্তিত্বের সঙ্গে শ্রমশক্তির অস্তিত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। সুতরাং শ্রমশক্তির উৎপাদন বলতে বোঝায়—শ্রমিককে খাইয়ে-পরিয়ে এমন শারীরিক অবস্থায় রাখতে হবে যেন, সে চুক্তিমতো শ্রম-সময় ঠিকমতো শ্রম করতে পারে।

আবার, আজকের শ্রমশক্তিকেই শুধু বাঁচিয়ে রাখলে চলবে না। আজকের সক্ষম শ্রমিক একদিন বৃদ্ধ হয়ে অক্ষম হয়ে পড়বে, নয়তো মরে যাবে। এখন

থেকেই যদি তার জন্য ব্যবস্থা করে রাখা না যায়, তবে একদিন শ্রমিকের অভাব দেখা দিতে বাধ্য। তাই একদিকে বর্তমান শ্রমিককে যেমন সুস্থ সবল অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে হবে, তেমনি অপর দিকে তাকে এমন সুযোগ দিতে হবে, যেন সে অবসর নেবার সময় তার মালিক পুঁজিপতিকে তার নিজের জায়গায় একটি সক্ষম ও কর্মঠ শ্রমিক উপহার দিয়ে যেতে পারে। সুতরাং শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তার ছেলেমেয়েসহ তার পরিবারকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

শ্রমিক ও তার পরিবারকে বেঁচে থাকতে হলে চাই খাদ্য, পোশাক, আশ্রয় প্রভৃতি জীবনধারণের ন্যূনতম উপায়গুলি। আর এইগুলির মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য দিয়েই শ্রমিক তা পেতে পারে। তাই মজুরি হিসাবে শ্রমিককে অবশ্যই সেই পরিমাণ মূল্য দিতে হবে যেন সে তার বিনিময়ে এইগুলি সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং শ্রমিকের মজুরি নির্ধারিত হয় তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্যের পরিমাণ দ্বারা, অর্থাৎ মুদ্রার হিসাবে সেইসব দ্রব্য-সামগ্রীর দাম দ্বারা।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরির পরিমাণ নির্ধারণে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ের প্রভাব পড়ে : (১) প্রথমতঃ শ্রমিক যে কাজ করে তা শিখতে তার যত বেশিদিন সময় লাগে, শ্রমিকের উৎপাদন ব্যয় ততই বেড়ে যায়। ফলে তার মজুরিও বেশি হতে বাধ্য। আবার যে কাজের জন্য কোনো শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন হয় না, অর্থাৎ যে কাজে শ্রমিক তার কর্মক্ষম শরীরটি নিয়ে উপস্থিত থাকলেই যথেষ্ট, সেখানে শ্রমিককে শুধু সক্ষম অবস্থায় বেঁচে থাকার মতো মজুরি দিলেই চলে। (২) দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট দেশের জলবায়ু, সামাজিক আচার-আচরণ ও ঐতিহাসিক নিয়মে নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি মজুরির পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন শীতপ্রধান দেশে গরম পোশাক, বরফ ও তুষারের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার মতো আশ্রয়স্থল প্রভৃতির প্রয়োজন হয়। অথচ গরমের দেশে এসব না হলে চলে।

কিন্তু সাধারণভাবে শ্রমশক্তির উৎপাদন ব্যয় শ্রমিক ও তার পরিবারের বেঁচে থাকার ব্যয়ের সমান হয়। এই মজুরিকে বলা হয় নিম্নতম মজুরি। সব ক্ষেত্রেই যে মজুরি এই পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নানা কারণে মজুরি নিম্নতম মজুরি থেকে উপরে থাকে, আবার কোথায়ও বা তা নিম্নতম মজুরির নিচে থাকে। কিন্তু গোটা শ্রমিকশ্রেণীর মজুরির গড় নিম্নতম মজুরির আশে পাশেই ওঠানামা করে।

উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি

শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিকের একমাত্র পণ্য শ্রমশক্তির দাম, অর্থাৎ চলতি কথায় মজুরি কি হিসাবে ঠিক হয়, তা আমরা দেখলাম। এইবার আমরা দেখবো কি করে পুঁজিপতি সেই মজুরির বিনিময়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে এবং তার ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে। আরো দেখবো, কি করে নিজে শ্রম না করেও পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমের উৎপন্ন মূল্যের একটি অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে মুনাফা কামায়।

পুঁজিপতি প্রথমেই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যথা কাঁচামাল, শ্রমযন্ত্র ইত্যাদি বাজার থেকে ক্রয় করে। এদের জন্য সে যে মূল্য দেয়, তা সাধারণতই ঐগুলির উৎপাদন-মূল্যের সমান। কারণ বিনিময় সব সময়ই হয় সমান মূল্যের মধ্যে। তারপরই সে বের হয় শ্রমিকের খোঁজে। কারণ, শ্রমিকের প্রাণবন্ত শ্রম প্রয়োগ না করে কেবলমাত্র কাঁচামাল ও শ্রমযন্ত্র দিয়ে উৎপাদন হয় না।

শ্রম-বাজারে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়েই স্বাধীন মালিক। তারা পৃথক পৃথক পণ্যের মালিক, পুঁজিপতি পুঁজির মালিক, আর শ্রমিক তার শ্রমশক্তির। বাজারে সব কিছুই ঘটে সবার সামনে, খোলাখুলিভাবে। শ্রমশক্তির বিকিকিনির যে চুক্তি হয়, তাও হয় সবার সামনে: শ্রমশক্তির জন্য শ্রমিকের যে মজুরি ঠিক হয়, তা হয় অন্যান্য পণ্যের মতো তার উৎপাদন-মূল্যের সমহারে। আবার অন্যান্য পণ্য যেমন বাজারের বাইরে লোকচোখের আড়ালে ভোগ করা হয়, তেমনি শ্রম-শক্তির ভোগও হয় সর্বসাধারণের চোখের আড়ালে। সেখানে গেলেই দেখতে পাওয়া যাবে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে: "বিনা প্রয়োজনে প্রবেশ নিষেধ।"

পুঁজিপতি বাজার থেকে শ্রমশক্তি ক্রয় করার পরই সগর্বে চলতে শুরু করে কারখানার দিকে, আর শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিক চলে তার পিছু পিছু। পুঁজিপতি চলে দ্রুতপদে, আর শ্রমিক এক পা এগোয় তো দু' পা পেছোয়। কারণ যেহেতু সে তার নিজের চামড়া বিক্রি করে গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, তাই সে মনে মনে জানে যে, তার ভাগ্যে লেখা আছে অবধারিত মৃত্যু। আমরা দেখেছি কোন অবস্থায় পড়ে শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছে। এখন তার এই জীবনী-শক্তিটুকুই একমাত্র সম্বল যার বিনিময়ে সে তার ও তার পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। তাই তার এই দ্বিধা, এত ভয়।

অন্যান্য পণ্যের বেলায় দেখা যায়, আগে দাম দিয়ে তারপর পণ্য ভোগ করতে

হয়। শ্রমিক কিন্তু সাধারণত পুরো শ্রম-সময় কাজ করার পর মজুরি পায়। এ থেকে এই ধারণা হতে পারে যে শ্রমিক শ্রম করে যা উৎপাদন করে, উৎপাদনের পর তারই একটি অংশ মজুরি হিসাবে পায়। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বলতে গেলে শ্রমিক পুঁজিপতিকে বাকিতে পণ্য ক্রয় করার বাড়তি সুযোগ দেয় মাত্র। কারণ একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে পণ্য উৎপন্ন হওয়ার অনেক পরে পণ্য বিক্রয় হয়। অথচ তার অনেক আগেই শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয়ে গেছে।

একবার চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর চুক্তি-সময়ের জন্য নিজের শ্রমশক্তির উপর শ্রমিকের আর কোনো অধিকার থাকে না। তখন পুঁজিপতিই ঠিক করে, কিভাবে সে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ভোগ করবে। এই অবস্থায় নিজের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের ওপরও শ্রমিকের কোনো মালিকানা থাকে না। উৎপন্ন পণ্যের মালিক হয় পুঁজিপতি।

পুঁজিপতি তার নিজস্ব পরিকল্পনা মতো শ্রমিককে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতিতে নিযুক্ত করে। শ্রমিকের কাজের উপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। সে সব সময়ই চেষ্টা করে, কি করে নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ পণ্য তৈরি করিয়ে নেওয়া যায়। চুক্তিমতো শ্রম-সময় পার হয়ে গেলে পুঁজিপতি শ্রমশক্তি হিসাবে যে পণ্য ক্রয় করেছিল, তা ফুরিয়ে যায়। শ্রমিককেও আর কাজ করতে হয় না। ইতোমধ্যে শ্রমশক্তি ভোগের মধ্য দিয়ে তা দ্বারা শ্রম পণ্যে নতুন মূল্য হিসাবে জমা হয়।

এই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি বাস্তব চিত্র। আমরা আগেই দেখেছি যে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে পণ্য উৎপন্ন হয় তার মূল্য হলো, কাঁচামালের হারাহারি মূল্য + শ্রমযন্ত্রের হারাহারি মূল্য + বর্তমান শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য। সুতরাং বর্তমান শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্যের সবটাই শ্রমিকের প্রাপ্য। কিন্তু শ্রমিক যদি মজুরি হিসাবে সেই নতুন মূল্যের সবটাই নিয়ে নেয়, তবে পুঁজিপতির ভাগে কিছুই থাকবে না।

পুঁজিপতিকে অবশ্য এতটা বোকা ভাবার কোনো কারণ নেই। পুঁজিপতি আট-ঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে। পুঁজিপতি অভিজ্ঞতা থেকে জানে যে "শ্রম-শক্তির মূল্যের পরিমাণ এবং শ্রম প্রক্রিয়ায় সেই শ্রমশক্তি যে পরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে, তা কখনোই সমান নয়।" (মার্কস – ক্যাপিটাল) শেষেরটি সব সময়ই বড় হয়। সুতরাং শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে পুঁজিপতি যে মজুরি দেয়, শ্রমশক্তিকে খাটিয়ে তার চেয়ে বেশি মূল্যই পায়।

বাস্তবে যা ঘটে তা হল, মোট শ্রম-সময়ের একটি অংশ কাজ করেই শ্রমিক তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের (আহার, পরিচ্ছদ, বাসস্থান ইত্যাদি) মূল্যের সমপরিমাণ মূল্য সৃষ্টি করে। আবার আমরা জানি—শ্রমিক যে মজুরি পায় তা তার ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের মূল্যের সমান হয়। সুতরাং শ্রম-সময়ের এই অংশটি কাজ করেই শ্রমিক তার মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করে; শ্রমিকের নিয়োগকারী পুঁজিপতি তাকে যে মজুরি দেয় তা উসুল দিয়ে দেয়।

এরপর শ্রম-সময়ের বাকি অংশ কাজ করে শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে তা বাড়তি মূল্য হিসাবে তার নিয়োগকারী পুঁজিপতির পকেটে যায়। শ্রম-সময়ের প্রথম অংশে যে মূল্য সৃষ্টি হয়েছে তা থেকেই শ্রমিককে দেওয়া মজুরি মূল্য উসুল হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শ্রম-সময়ের বাকি অংশে যে মূল্য সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য পুঁজিপতিকে কোন প্রকার খরচ করতে বা প্রতিদান দিতে হয়নি। সুতরাং শ্রম সময়ের এই অংশে সৃষ্ট মূল্যকে বলা হয় উদ্বৃত্ত মূল্য। আর এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হলো পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার উৎস।

উপরোক্ত বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিমত মোট শ্রম-সময়কে দুটি অংশে ভাগ করা যায়—(১) যে অংশ কাজ করে, শ্রমিক তার মজুরি মূল্যের সমান মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ আবশ্যিক শ্রম-সময়। (২) যে অংশ কাজ করে শ্রমিক তার নিয়োগকারী পুঁজিপতির জন্য উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করে, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

সুতরাং, মোট শ্রম-সময়=আবশ্যিক শ্রম-সময়+উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

১। **আবশ্যিক শ্রম-সময়:** কোন একজন শ্রমিক যদি কোন পুঁজিপতি মালিকের অধীনে কাজ না করে নিজের খুশিমতো কাজ করে তবে তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের মূল্যের সমান মূল্য সৃষ্টি করতে তাকে যতক্ষণ শ্রম করতে হতো তাকে বলা যায় আবশ্যিক শ্রম-সময়। অর্থাৎ শ্রমিকের নিজের প্রয়োজনেই তাকে এই সময়টুকু শ্রম করতে হচ্ছে। এইবার পুঁজিপতির অধীনে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি-মূল্যের সমান মূল্য সৃষ্টি করতে তাকে চুক্তিমতো শ্রম-সময়ের যতটুকু অংশ শ্রম করতে হয় তাকে বলা যায় আবশ্যিক শ্রম সময়, কারণ আমরা জানি মজুরি-মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণপোষণের মূল্যের সমপরিমাণের হিসাবে।

২। **উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়:** পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চুক্তিমতো মোট শ্রম-সময় থেকে আবশ্যিক শ্রম-সময়টুকু বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তা হলো—উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। শ্রমিকের কাছে এই সময়টুকু উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় এই জন্য যে, সে নিজের প্রয়োজনে

বাধ্য হয়ে বা আনন্দের সঙ্গে এই সময়টুকু শ্রম করে না। আবার এই শ্রম-সময়টুকু শ্রম করে সে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার কোন অংশই সে ভোগ দখল করতে পারে না। তার নিয়োগকারী পুঁজিপতি কোন প্রকার প্রতিদান না দিয়েই এই সময়ে সৃষ্টি মূল্যের সবটাই আত্মসাৎ করে।

মোট শ্রম-সময় ও তার অংশগুলির চিত্ররূপ নিম্নরূপ—

এখানে 'ক গ' হচ্ছে মোট শ্রম সময়ের দৈর্ঘ্য—যার মধ্যে 'ক খ' অংশ হলো আবশ্যিক শ্রম-সময়, আর 'খ গ' অংশ হলো উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বোঝা যাক।

কিন্তু যখন চুক্তি হয় তখন মোট শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় এমনিভাবে দুটি অংশে ভাগ করে দেখানো থাকে না। তাই মনে হয় মজুরি যেন মোট শ্রম-সময়ের শ্রমের মূল্য। প্রকৃতপক্ষে মজুরি হল আবশ্যিক শ্রম সময়ের শ্রমে সৃষ্ট মূল্যের সমান। সুতরাং তা মোট শ্রম-সময়ের পুরো মূল্যের চেয়ে কম হতে বাধ্য। তাই শ্রমিক মোট শ্রম-সময় কাজ করে যে মূল্য সৃষ্টি করে মজুরি হিসাবে তার চেয়ে কম মূল্য ফিরে পায়।

এই সত্যটি শ্রমিকরা বুঝতে পারে না কেন? আর সাধারণ মানুষই বা কেন মনে করে যে, শ্রমিক শ্রম করে যা উৎপাদন করে তা মজুরি হিসাবে ফিরে পায়? এর কারণ শ্রমিক শ্রম করে সৃষ্টি করে পণ্য-মূল্য, অথচ মজুরি পায় মুদ্রায়। ফলে পণ্য-মূল্যের ধারণাটি মুদ্রা-মূল্যের আড়ালে চাপা পড়ে যায়, এবং শ্রমিক নিজে

এবং সাধারণ মানুষ মনে করে যে, শ্রমিক শ্রম করে যে মূল্য সৃষ্টি করে তার সবটাই মজুরি হিসাবে পেয়ে যায়।

পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে যখন চুক্তি হয় তখন দুটি জিনিসের উল্লেখ থাকে—(১) শ্রমিক কতক্ষণ শ্রম করবে, (২) এই শ্রম করার জন্য সে কত টাকা মজুরি পাবে। এইবার চুক্তিমতো সময় শ্রম করে শ্রমিক কিছু পরিমাণ পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করে এবং চুক্তিমতো সময় শ্রম করার পর শ্রমিক চুক্তিমতো মজুরির টাকা নিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রম যে পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করে তা সব সময়ই তার মজুরি-মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। আর এদের অন্তরই হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিশ্রেণী কোন প্রকার শ্রম না করেও মুনাফা কামায়, বিলাস বহুল জীবন যাপন করে।

সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্য=মোট শ্রম-সময়ে সৃষ্ট পণ্য-মূল্য

—মোট শ্রম-সময়ের মজুরি-মূল্য

আর এই সত্যের উপরই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে। পুঁজি-পতির রয়েছে উৎপাদনের সমস্ত বাস্তব মালিকানা। আর এই মালিকানার দৌলতে শ্রমিককে নিয়োগ করে সে তার শ্রম থেকে উৎপন্ন পণ্য-মূল্য আত্মসাৎ করে মুনাফা কামায়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির ব্যাপারটি একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখা যাক—

মনে করি, একটি লেদ কারখানায় বিশেষ এক প্রকারের যন্ত্রাংশ তৈরি হয়। প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য ৩০ টাকা মূল্যের কাঁচামাল প্রয়োজন হয়। প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য শ্রমযন্ত্র, বিদ্যুৎ, ঘরভাড়া ইত্যাদির হারাহারি অংশ হিসাবে ৮ টাকার সমান মূল্য খরচ হয়। আর একজন শ্রমিক দুই শ্রম-দিবস (রোজ) কাজ করে একটি যন্ত্রাংশ তৈরি করতে পারে। আরো মনে করি যে, প্রতি শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য ৮ ঘণ্টা এবং একজন শ্রমিকের প্রতি ঘণ্টার শ্রম ২ টাকার নতুন মূল্য সৃষ্টি করে। আবার, প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় একজন শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রত্যহ ৮ টাকা মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী প্রয়োজন হয় এবং সেই হিসাবে একজন শ্রমিকের প্রতিদিনের মজুরি ৮ টাকা।

লেদ কারখানার মালিক পুঁজিপতি প্রথমে কারখানা-বাড়ি সংগ্রহ করে, সেখানে কয়েকটি লেদ মেশিন বসায় ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করে। তারপর দৈনিক ৮ টাকা মজুরিতে কয়েকজন শ্রমিক নিয়োগ করে। শ্রমিক কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ শুরু করে উৎপাদন শুরু করে। পুঁজিপতি সব সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখে যেন প্রতি দু'দিন অন্তর প্রতি শ্রমিক পিছু একটি করে যন্ত্রাংশ পাওয়া যায়।

এইবার দেখা যাক যন্ত্রাংশ উৎপাদনের অর্থ নৈতিক দিকটি। প্রথমে দেখা যাক প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য পুঁজিপতির কত টাকা মূল্যের পুঁজি খরচ হয়—

কাঁচামাল+যন্ত্র, বিদ্যুৎ, ঘরভাড়া ইত্যাদি হারাহারি অংশ

(৩০+৮) টাকা	৩৮ টাকা
দৈনিক ৮ টাকা হিসাবে একজন শ্রমিকের ২ রোজের মজুরি (৮×২) টাকা	১৬ টাকা
মোট পুঁজি খরচ হয়	৫৪ টাকা

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রতিটি যন্ত্রাংশ তৈরি করতে ৫৪ টাকার পুঁজি খরচ হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, একটি সম্পূর্ণ যন্ত্রাংশে কত মূল্য সৃষ্টি হয়:

কাঁচামাল+যন্ত্র, বিদ্যুৎ, ঘরভাড়া ইত্যাদির হারাহারি অংশ

(৩০+৮) টাকা	৩৮ টাকা
প্রতি ঘণ্টার শ্রমে ২ টাকার নতুন মূল্য সৃষ্টি হয় এই হিসাবে ২ রোজের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য (১৬×২) টাকা	৩২ টাকা
মোট সৃষ্ট পণ্য-মূল্য	৭০ টাকা

উপরের উদাহরণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি যন্ত্রাংশের জন্য পুঁজিপতি মোট ৫৪ টাকা মূল্যের পুঁজি খরচ করে। তার বদলে সে পায় একটি সম্পূর্ণ তৈরি যন্ত্রাংশ, যার মোট পণ্য মূল্য হলো ৭০ টাকা। ফলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ থেকে পুঁজিপতি (৭০−৫৪) টাকা=১৬ টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়। পুঁজিপতি হিসাবে লেদ কারখানার মালিক এইভাবে প্রতিটি যন্ত্রাংশ থেকে ১৬ টাকা হিসাবে মুনাফা অর্জন করে।

আরো একটি বিষয় দেখা যায়—বর্তমান শ্রমিকের শ্রম ৩২ টাকার নতুন মূল্য সৃষ্টি করেছে। এই ৩২ টাকার একটি অংশ, অর্থাৎ ১৬ টাকা শ্রমিক পেয়েছে মজুরি হিসাবে। আর অপর অংশটি অর্থাৎ ১৬ টাকা পুঁজিপতি পেয়েছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা মুনাফা হিসাবে। সুতরাং মজুরি ও মুনাফা হলো বর্তমান শ্রমিকের প্রাণবন্ত শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য=মজুরি-মূল্য+উদ্বৃত্ত-মূল্য।

তাই নতুন সৃষ্ট মূল্যের পরিমাণ ঠিক থেকে এদের মজুরি বা উদ্বৃত্ত-মূল্যের যে কোন একটির পরিমাণ বাড়ালে অপরটির পরিমাণ কমে যাবে, অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বাড়লে মজুরির পরিমাণ কমবে এবং মজুরির পরিমাণ বাড়লে মুনাফার পরিমাণ কমবে।

প্রতিটি যন্ত্রাংশ উৎপাদনের জন্য পুঁজিপতি যে যে পণ্য, অর্থাৎ কাঁচামাল শ্রম-যন্ত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদি ও শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করেছে তাদের প্রত্যেকটির জন্যই সে তাদের মূল্যের সমান মূল্য দিয়েছে। আর এ সবই ঘটেছে সবার চোখের সামনে। আর এই ঘটনা দেখিয়েই বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুঁজিপতি ন্যায্য মূল্যে সমস্ত পণ্য ক্রয় করে এবং চুক্তি মতো শ্রমিকের প্রাপ্য ন্যায্য মজুরিই তাকে দেয়। সুতরাং পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমের ফলের একটা অংশ থেকে বঞ্চিত করে এবং তা উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করে—এই কথাটি ঠিক নয়।

অথচ আমরা দেখেছি যে, তার ক্রয় করা সবকটি পণ্য একসঙ্গে মিলিয়ে ভোগ করার ফলে পুঁজিপতি তাঁর দেওয়া মূল্যের পরিমাণের চেয়ে বেশি মূল্য ফিরে পেয়েছে। আমরা আরো দেখতে পাই যে, কাঁচামাল, শ্রমযন্ত্র, ঘরবাড়ি ইত্যাদি অর্থাৎ সঞ্চিত অতীত শ্রমের বেলায় কেবলমাত্র হারাহারি মূল্যই সে ফিরে পেয়েছে। কিন্তু পণ্য হিসাবে বর্তমান শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করতে পুঁজিপতি মজুরি হিসাবে শ্রমিককে যে মূল্য দিয়েছে, শ্রমিকের শ্রমশক্তি ভোগ করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ শ্রমিককে দিয়ে শ্রম করিয়ে সে মজুরির মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য ফিরে পেয়েছে। সুতরাং এখন আমরা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারছি যে, শ্রমিকশ্রেণীর শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের একটি অংশ থেকে তাদের বঞ্চিত করে এবং তা আত্মসাৎ করেই পুঁজিপতিশ্রেণী মুনাফা অর্জন করে। আর এমনিভাবেই চলে শ্রমিকশ্রেণীর উপর পুঁজিপতিশ্রেণীর শোষণ।

পুঁজিপতি ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্ক

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় তাই শ্রমিক ও পুঁজিপতির স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। কারণ পুঁজিপতি চায় কি করে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়, বিপরীত পক্ষে শ্রমিক চায় তার মজুরির পরিমাণ বাড়াতে। পুঁজিবাদের সূচনার যুগে বলপ্রয়োগ, লুণ্ঠন, হত্যা ও শোষণ-পীড়নের যে ধারা অনুসরণ করে পুঁজির আদি সঞ্চয় শুরু হয়েছিল, সেই ধারা এখনও সমানেই চলছে। তবে এখন তা হচ্ছে খুব সূক্ষ্মভাবে, মার্জিতভাবে, স্বাধীন চুক্তির মুখোশের আড়ালে।

শ্রমিকের স্বাধীনতার স্বরূপ

পুঁজিবাদের অন্যতম শর্ত হলো স্বাধীন শ্রমিকশ্রেণী। এর অর্থ হলো, এমন একটি শ্রমিকশ্রেণী থাকবে যা দুটি অর্থে স্বাধীন। প্রথমতঃ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকতে হবে, অর্থাৎ সে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি অন্য কোন লোকের মতামত ছাড়াই ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সে হবে সমস্ত সম্পদের মালিকানা থেকে মুক্ত—সে হবে সর্বহারা—নিজের শ্রমশক্তি ছাড়া অন্য কোনো সম্পদ তার অবশিষ্ট থাকবে না। উৎপাদনের উপাদান বলতে কোন কিছু তো তার থাকবেই না, এমনকি তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের কোন উপায়ও তার অধিকারে থাকবে না। এ অবস্থায় নিজের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে কোন প্রকার উৎপাদন করার মতো পরিস্থিতি তার সামনে খোলা থাকবে না। অর্থাৎ নিজেদের শ্রমশক্তি বজায় রাখতে এবং নিজের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখতে যা প্রয়োজন তা সে উৎপাদন করতে পারবে না। তার সামনে কেবলমাত্র দু'টি রাস্তাই খোলা থাকবে। (১) সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুবরণ করা, (২) পুঁজিপতি অর্থাৎ উৎপাদনের উপাদানের মালিকের নিকট নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করা।

সামন্ত ব্যবস্থায় কৃষক ছিল জমির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, সে স্বাধীন নয়, সে ভূমিদাস। আবার, সামন্ত প্রভুর নিকট থেকে পাওয়া জমিতে উৎপাদন চালানোর মতো ন্যূনতম উপাদানও তার রয়েছে, তাই সে সর্বহারাও নয়। ফলে পুঁজিপতির নিকট তার শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে সে বাধ্য নয়। কিন্তু এ অবস্থায় পুঁজিবাদী উৎপাদন চলতে পারে না। তাই তো দেখতে পাই, বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত ভূমি-

দাসকে তার ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য এতো ব্যাগ্র। পুঁজিবাদের সূচনা অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, এই মহৎ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বুর্জোয়াশ্রেণী সামন্ত ভূমিদাসকে লুণ্ঠন ও হত্যা করতে ইতঃস্তত করেনি। ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্ত করার নাম করে তাকে সর্বহারায় পরিণত করেছে, তাকে পরিণত করেছে মজুরি-দাসে।

অথচ তারাই আবার গর্ব করে প্রচার করে যে, তারা সাম্য ও স্বাধীনতার পূজারী। তাদের আশ্রিত পণ্ডিতরা উচ্চকণ্ঠে ক্রীতদাস ও ভূমিদাস প্রথার নিন্দা করেন। তাঁরা দেখান যে, ক্রীতদাস ও ভূমিদাসের কোন স্বাধীনতা ছিল না, সাম্যের তো কোনো প্রশ্নই নেই। কিন্তু তাদের যুগে সর্বহারা শ্রমিক সম্পূর্ণ স্বাধীন! আইনের চোখে শ্রমিক ও পুঁজিপতি উভয়ই সমান; সুতরাং এই ব্যবস্থায় জোর করে শ্রমিককে শোষণ করার কোনো কথাই উঠতে পারে না। স্বাধীন শ্রমিক স্বাধীন চুক্তিমতো পুঁজিপতির নিকট থেকে মজুরি নিয়ে তবে শ্রম করে। কিন্তু একটু আগেই আমরা দেখলাম কি করে স্বাধীনতা দেওয়ার নাম করে শ্রমিককে সর্বহারায় পরিণত করা হয়েছে। সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে স্বাধীন চুক্তির নামে শ্রমিক যা করতে বাধ্য হয় তা হল নিজেকে নিঃশেষে শোষণ করার অধিকার পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়—আর তা দেয় বেঁচে থাকার মতো সামান্যতম মজুরির বিনিময়ে।

তাই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভূমিদাসকে স্বাধীন ও মুক্ত করার নাম করে বুর্জোয়ারা যা করল তা হল—তারা তাকে মজুরি-দাসে পরিণত করল। পুঁজিপতি-শ্রেণীর নিকট বাধ্যতামূলকভাবে নিজের শ্রমশক্তি বিক্রয় করা ছাড়া তার আর অন্য কোন রাস্তা খোলা রইল না। ক্রীতদাস ছিল দাস মালিকের সম্পত্তি; মালিক নিজের স্বার্থে তাকে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখত। ভূমিদাস ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা; আর সেই জমিই তাকে বাঁচিয়ে রাখত। কিন্তু তথাকথিত স্বাধীন মজুরি-শ্রমিক না মালিকের সম্পত্তি, না ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ। সে সর্বহারা। পুঁজিপতি নিজের প্রয়োজনে তার শ্রমশক্তি ক্রয় করে; তাকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করে; তবে সে খেয়ে পরে বাঁচতে পায়। আবার পুঁজিপতি নিজের খুশিমতো তাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেয়; তার সামনে দেখা দেয় অনাহারে মৃত্যুর বিপদ। তার বেঁচে থাকার একমাত্র শর্ত হল—নিজের শ্রমশক্তি বেচতে পারা। তাই তাকে বার বারই পুঁজিপতিদের দ্বারস্থ হতে হয়। তার দাসত্ব বেশী গভীর, অনেক বেশী বিস্তৃত; বেঁচে থাকতে হলে তাকে এমন একজন পুঁজিপতি খুঁজে পেতে হবে যে তাকে নিয়োগ করবে। সে স্বাধীন, তাই সে কোন বিশেষ পুঁজিপতির দাস নয়, কিন্তু কার্যতঃ সে গোটা পুঁজিপতিশ্রেণীরই দাস।

পুঁজি—উৎপাদন ব্যবস্থার একটি সামাজিক সম্পর্ক

বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা দেখাতে চায় যে, পুঁজিপতি নিজের পুঁজি খরচ করে কারখানা পত্তন করে, যন্ত্র বসায়, কাঁচামাল ক্রয় করে, মজুরি দিয়ে শ্রমিক নিযুক্ত করে। উৎপাদনের সমস্ত প্রকার ঝুঁকি পুঁজিপতিই গ্রহণ করে। শ্রমিক উৎপাদনে যে শ্রম দেয়, মজুরি হিসাবে তার সবটাই পুঁজিপতি তাকে দিয়ে দেয়। সুতরাং শ্রমিকের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করার কোনো কথাই উঠতে পারে না।

কিন্তু মার্কস দেখিয়েছেন যে, বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা 'শ্রমশক্তি'কে 'শ্রম'-এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন বলেই এই যুক্তি দেখান। আসলে শ্রমশক্তি ও শ্রম দু'টি আলাদা জিনিস। শ্রমশক্তি হলো মানুষের কাজ করার ক্ষমতা, আর শ্রম হলো সেই শক্তির প্রকাশ। শ্রম পণ্যে মূল্য সৃষ্টি করে, সুতরাং সে নিজে কখনই পণ্য হতে পারে না। শ্রমশক্তিই পণ্য। আর মজুরি দিয়ে পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তিই ক্রয় করে।

বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে পুঁজি হচ্ছে কতিপয় বাস্তব দ্রব্য, যেমন যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জীবনধারণের উপায় ইত্যাদি। তাদের মতে, মানুষের শ্রমে উৎপন্ন কোনো জিনিস যদি সঙ্গে সঙ্গে ভোগ না করে, পরে আরো উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে সেই জিনিসই হবে পুঁজি।

কিন্তু "পুঁজি বলতে শুধু জীবনধারণের উপায়, শ্রমের যন্ত্র ও কাঁচামাল, অর্থাৎ এই সব বাস্তব দ্রব্যগুলিকেই বোঝায় না, এদের বিনিময় মূল্যকেও বোঝায়। পুঁজি বলতে যে সকল দ্রব্য বোঝায় তার সবই পণ্য। সুতরাং পুঁজি শুধু কতকগুলি দ্রব্যের সমষ্টি নয়, তা হলো পণ্য সমষ্টি, বিনিময় পণ্যের সমষ্টি, সামাজিক পরিমাপের সমষ্টি।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)।

কিন্তু, তাই বলে সমস্ত পণ্য-সমষ্টি বা সমস্ত বিনিময় মূল্যের সমষ্টিই পুঁজি নয়। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের সূত্র মতো যে কোন শ্রমযন্ত্রই পুঁজি—তা সে ক্রীতদাস প্রথার আমলেই হোক, আর তা সামন্ত যুগের আমলেই হোক। কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কেবলমাত্র বিশেষ এক সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই পণ্য সমষ্টি পুঁজিতে পরিণত হতে পারে। কিছু পরিমাণ পণ্য বা বিনিময় মূল্যকে তখনই পুঁজি বলা যায়, যখন "তা একটি স্বতন্ত্র সামাজিক শক্তি হিসাবে, অর্থাৎ সমাজের একটি অংশের শক্তি হিসাবে প্রাণবন্ত শ্রমশক্তির সঙ্গে সোজাসুজি নিজেকে বিনিময় করে তবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে এবং নিজের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে পারে। তাইত পুঁজির অবশ্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলো: এমন একশ্রেণীর লোক থাকতে হবে, যাদের শ্রম করার ক্ষমতা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নেই।" (মার্কস—মজুরি-

শ্রমিক ও পুঁজি)। আর এই শ্রেণীর প্রাণবন্ত শ্রম পুঁজি অর্থাৎ, সঞ্চিত শ্রমকে সেবা করেই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে, আবার সেই সঙ্গে পুঁজি অর্থাৎ, সঞ্চিত শ্রমের বিনিময়-মূল্য বৃদ্ধি করে।

তাই পুঁজি হলো উৎপাদন ব্যবস্থার একটি সামাজিক সম্পর্ক। আর তা হলো বুর্জোয়া উৎপাদন সম্পর্ক, বুর্জোয়া সমাজের উৎপাদন সম্পর্ক। কারণ পুঁজিবাদে জীবনধারণের উপায়, শ্রমের যন্ত্র, কাঁচামাল প্রভৃতি একটি বিশেষ সমাজ ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেই পুঁজি হিসাবে উৎপন্ন হয় ও সঞ্চিত হয় এবং আবার নতুন উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

নীচের উদাহরণ থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে। মনে করি, একজন চাষী মাছ ধরার জন্য একটি জাল তৈরি করল। সে এই জাল দিয়ে নিজের খাওয়ার জন্য মাছ ধরে। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে, এই জালটি চাষীর মূলধন বা পুঁজি। কারণ চাষী জালটি তৈরি করেই তা ভোগ করে ফেলেনি। সে সেইটি রেখে দিয়েছে আরো উৎপাদন করার জন্য। কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে চাষীর এই জালটি কখনই পুঁজি নয়। কারণ এই জালটি কখনোই শ্রমিককে শোষণ করার কাজে ব্যবহৃত হয় না।

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা একটি সামাজিক অনুভূতি

বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। এক অর্থে কথাটি যথার্থ। কারণ, পুঁজি যদি শ্রমিককে নিয়োগ না করে, তবে শ্রমিকের ধ্বংস অবধারিত, আবার শ্রমিককে শোষণ করতে না পারলে পুঁজিও ধ্বংস হয়ে যায়। আর শ্রমিককে শোষণ করতে হলে পুঁজিকে অবশ্যই শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়া পণ্ডিতগণ কথাটি এই অর্থে ব্যবহার করেন না। তাঁরা যে অর্থে বলেন তা হল—উৎপাদন পুঁজি যত দ্রুত বাড়বে, বুর্জোয়ারা তত দ্রুত ধনী হবে ; তাদের ব্যবসা ভাল হবে ; আর সেই সঙ্গে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়বে, ফলে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পাবে। তাঁদের মতে এই কারণে পুঁজি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন।

"কিন্তু উৎপাদন পুঁজির বৃদ্ধির অর্থ কি ? প্রাণবন্ত শ্রমের উপর সঞ্চিত শ্রমের আধিপত্য বৃদ্ধি। শ্রমিকশ্রেণীর উপর বুর্জোয়াশ্রেণীর আধিপত্য বৃদ্ধি।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)। শ্রমিক তার শত্রু, অর্থাৎ পুঁজি, অর্থাৎ তার নিয়োগকারী সম্পদ বৃদ্ধি করে। আর সেই বর্ধিত সম্পদ পরবর্তীকালে পুঁজি হয়ে বর্ধিত হারে শ্রমিককে শোষণ করে।

সুতরাং "পুঁজি ও শ্রমিকের স্বার্থ এক ও অভিন্ন, এ কথার অর্থ হলো পুঁজি ও শ্রমিক এক ও অভিন্ন সম্পর্কেরই দু'টি দিক। এদের একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল, যেমন, সুদখোর ও অপব্যয়কারী একে অপরের উপর নির্ভরশীল।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)।

তাই দেখা যাচ্ছে যে, "মজুরি-শ্রমিক যতদিন মজুরি-শ্রমিক থাকবে ততদিন তার ভাগ্য পুঁজির সঙ্গেই বাঁধা থাকবে। এই হলো শ্রমিক ও পুঁজিপতির পারস্পরিক নির্ভরতার বাগাড়ম্বরপূর্ণ চিত্র।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)

ধরুন, বুর্জোয়া পণ্ডিতদের কথাই আমরা মেনে নিচ্ছি। তাঁদের মতে, উৎপাদন পুঁজির পরিমাণ বাড়লে শ্রমিকের চাহিদা বাড়বে। ফলে শ্রমিক এখনকার চেয়ে বেশি মজুরি পাবে। কিন্তু তার নীট সামাজিক ফল কি হবে? একটি বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বিচার করা যাক।

পূর্বে সেচের ব্যবস্থা ছিল না এমন অঞ্চলের একটি গ্রামের কথা ধরা যাক। মনে করি, সেই গ্রামের একজন গরিব চাষীর মাত্র দু' বিঘা ধানী জমি আছে।

ধান পেত, .এ যথেষ্ট সচ্ছল ছিল। এখন সে তো রীতিমতো ধনী লোক। এখন তা. ..াসিতা অনেক বেড়ে গেছে। শহরে একটি বাড়ি ভাড়া করে বা তৈরি করে সে তার সমস্ত ছেলে মেয়েকে শহরের স্কুলে পড়াচ্ছে। নিজেও প্রায়ই শহরে থেকে শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করছে।

এ অবস্থায় আমাদের গরিব চাষীর বাস্তব অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও, জোত ারের অবস্থার উন্নতির সঙ্গে তুলনা করলে মনে হবে যেন গরিব চাষীর অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়ে গেছে।

তেমনি আমরা দেখতে পাই যে, "উৎপন্ন পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে সম্পদ, বিলাসদ্রব্য, সামাজিক অভাব ও সামাজিক ভোগবিলাসের বৃদ্ধি ঘটে। সমাজের সাধারণ উন্নততর অবস্থায় এইরূপে শ্রমিকদের উপভোগের মাত্রারও বৃদ্ধি ঘটে; তা সত্বেও শ্রমিকদের নাগালের সীমানার বাইরে পুঁজিপতিদের বর্ধিত ভোগবিলাসের সঙ্গে তুলনা করলে শ্রমিকদের বর্ধিত উপভোগ থেকে প্রাপ্ত সামাজিক তৃপ্তি কমে যায়। (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)

কিছু কিছু লোককে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, আগে যেসব শ্রমিক-কৃষক গামছা-পেন্ডি পরে দিন কাটাতো, আজকাল তারা ধুতি-শার্ট পরতে পারছে। সুতরাং শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। পুঁজিপতি শোষণের ফলে মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য বাড়ছে, এ কথা বলা অন্যায়। এইসব বক্তৃতাবাগীশদের একবার পুঁজিপতিদের অবস্থার উন্নতির দিকে চেয়ে দেখতে অনুরোধ করি। আগে যারা সাধারণ কোঠাবাড়িতে থাকতো, এখন তারা থাকে শীততাপনিয়ন্ত্রিত বিরাট হাল-ফ্যাসানের বাড়িতে। প্লেন ছাড়া এখন তারা এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাফেরা করে না। শ্রমিক যখন তার গুরুতর অসুস্থ কন্যাকে পয়সার অভাবে একজন ভাল ডাক্তার দেখাতে পারে না, তখন তারই মালিকের কন্যা বিশাল ক্যাডিল্যাক চেপে স্কুলে বা কলেজে যায়।

আসল কথা, এই সব বক্তারা বুঝতে পারে না, বা বুঝতে চায় না যে, "আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাধ-আহ্লাদ সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয়। সুতরাং সমাজের মাপকাঠিতেই আমরা তার পরিমাপ করি, যে সকল দ্রব্য-সামগ্রী আমাদের অভাব পূরণ করে, তাদের দিয়ে নয়।" (মার্কস—মজুরি শ্রমিক ও পুঁজি)

দ্রব্যমূল্য ও মজুরি

আজকাল কিছু লোককে প্রায়ই বলতে শোনা যায়, শ্রমিকদের মজুরি এখন অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমান সামাজিক উন্নতির যুগে শ্রমিকদের উন্নতি হয়েছে।

কিন্তু, মজুরি বৃদ্ধি দেখেই কি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হয়েছে ?

শ্রমিকের মজুরি সাধারণতই দেওয়া হয় মুদ্রায়। মুদ্রার মূল্য হলো—তা দিয়ে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করা যায়। শ্রমিক মজুরি হিসাবে পাওয়া মুদ্রা দিয়ে তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে।

মুদ্রার হিসাবে শ্রমিক যে মজুরি পায়, আমরা তাকে বলব **মুদ্রা-মজুরি**, আর সেই মুদ্রা দিয়ে সে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারে, তাকে বলব, **'প্রকৃত-মজুরি'**। মুদ্রা মজুরির কোনরূপ পরিবর্তন না হলেও প্রকৃত-মজুরি বাড়তে বা কমতে পারে। যেমন, মুদ্রা-মজুরি ঠিক থাকা অবস্থায় শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় শ্রমিক আগে তার মজুরির টাকা দিয়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারতো, এখন আর তা পারে না। ফলে তার প্রকৃত-মজুরি কমে যাবে। আবার মনে করি মুদ্রা-মজুরি ঠিকই রইল, অথচ জিনিসপত্রের দাম কমে গেল। ফলে শ্রমিক তার মজুরির টাকা দিয়ে এখন অনেক বেশী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে, তার প্রকৃত-মজুরি বেড়ে যাবে। আবার শ্রমিকের মুদ্রা মজুরি যে হারে বাড়ে, শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম যদি তার চেয়ে বেশি হারে বাড়ে, তবে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। সুতরাং শ্রমিকের মুদ্রা-মজুরির বৃদ্ধি দেখেই শ্রমিকের বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না। মুদ্রা-মজুরির পরিবর্তনের সঙ্গে জিনিসপত্রের দামের পরিবর্তন মিলিয়ে বিচার করতে হবে।

মজুরি ও মুনাফার সম্বন্ধ

কিন্তু কেবলমাত্র মুদ্রা-মজুরি ও প্রকৃত-মজুরির বিবেচনাই মজুরি সম্বন্ধে বিবেচনার শেষ কথা নয়। শ্রমিকের মজুরিকে পুঁজিপতির মুনাফার সঙ্গেও তুলনা করে দেখতে হবে।

আমরা দেখেছি যে, বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্যের একটি অংশ হলো মজুরি ও অপর অংশটি মুনাফা। আরো দেখেছি যে, এদের একটি বাড়লে অপরটি কমে যায়। সুতরাং এদের তুলনামূলক আলোচনা থেকে আমরা এদের মালিক শ্রমিক ও পুঁজিপতির পারস্পরিক অবস্থা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতে পারি। মুনাফার সঙ্গে মজুরির তুলনা করে আমরা যা পাই, তাকে আমরা **আপেক্ষিক মজুরি** বলব।

আমরা এমনও দেখতে পাই যে, প্রকৃত মজুরি ঠিকই রয়ে গেছে বা বেড়ে গেছে, অথচ তার আপেক্ষিক মজুরি কমে গেছে। যেমন, মনে ক'রি একজন শ্রমিকের আট ঘণ্টার শ্রম বারো টাকার মূল্য সৃষ্টি করে। তার মধ্যে মজুরি হিসেবে শ্রমিক পায় ৬ টাকা, আর পুঁজিপতি মুনাফা হিসাবে পায় ৬ টাকা। এখন ধরা যাক, শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম ⅓ অংশ কমে গেল, আর শ্রমিকের মজুরি কমল ⅙ অংশ। তবে শ্রমিকের মজুরি কমে গিয়ে দাঁড়াবে ৫ টাকা এবং আগে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে তার ৬ টাকা লাগত এখন তা ৪ টাকাতেই পাওয়া যাবে। ফলে শ্রমিকের মুদ্রা-মজুরি ৬ টাকা থেকে কমে ৫ টাকা হয়ে গেলেও শ্রমিকের প্রকৃত-মজুরি কিন্তু বেড়ে যাবে। কারণ আগে যে দ্রব্য-সামগ্রী কিনতে তার ৬ টাকা লাগত তা এখন সে ৪ টাকাতেই পেয়ে যাবে। সুতরাং এখনকার ৫ টাকা মজুরি দিয়ে শ্রমিক আগের চেয়ে বেশী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

কিন্তু এর ফলে আরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। তা হলো পুঁজি-পতির মুনাফা বেড়ে যাবে। আগে পুঁজিপতি মুনাফা হিসাবে ৬ টাকা পেত, কিন্তু এখন পাবে (১২ – ৫) টাকা = ৭ টাকা। সুতরাং শ্রমিকের প্রকৃত-মজুরি বেড়ে যাওয়া সত্বেও তার আপেক্ষিক মজুরি কমে গেছে। অর্থাৎ সামাজিক উৎপাদনের ভাগাভাগির ব্যাপারে অসাম্য বেড়ে গেছে। ফলে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যকার সামাজিক ব্যবধানও বেড়ে যাবে।

বুর্জোয়া পণ্ডিতেরা অনেক সময় যুক্তি দেখান যে, নতুন বাজার খুলে গেলে বা পুরোনো বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পেলে, যন্ত্রপাতির উন্নতি হলে ও প্রাকৃতিক শক্তির নতুন প্রয়োগ শুরু হলে শ্রমিকের মজুরি না কমেও মুনাফার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। ধরে নিলাম তাই না হয় হলো, কিন্তু তাতে শ্রমিকদের কি লাভ? শ্রমিকের আপেক্ষিক মজুরি তো কমে যাবে। কারণ, মজুরি ঠিক থেকে মুনাফা বেড়ে গেলে তুলনামূলকভাবে তাদের মধ্যকার দূরত্ব বেড়ে যাবে। অবশ্য এবার ঘটনাটি ঘটবে উল্টো দিক দিয়ে। মজুরি কমে গিয়ে মুনাফা বৃদ্ধি না হয়ে, এবার যা হবে তা হলো, মুনাফা বেড়ে যাওয়ায় আপেক্ষিক মজুরি কমে যাবে।

আবার মুনাফা যে হারে বাড়ে, মজুরি যদি সেই হারে না বাড়ে, তা হলে মজুরি বৃদ্ধি সত্বেও আপেক্ষিক মজুরি কমে যায়। যেমন, মজুরি যদি শতকরা ৫ হারে বাড়ে, আর মুনাফা বাড়ে শতকরা ২৫ হারে, তবে মজুরি বাড়ল ঠিকই কিন্তু আপেক্ষিক মজুরি কমে গেল।

"তাই পুঁজির দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের আয় যদিও বাড়ে তবুও শ্রমিক ও

পুঁজিপতিদের মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব সেই সঙ্গে বাড়ে এবং একই সাথে শ্রমের উপর পুঁজির আধিপত্য ও পুঁজির উপর শ্রমের নির্ভরতা অনুরূপভাবে বাড়ে।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)

সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পুঁজিপতির স্বার্থ ও শ্রমিকের স্বার্থ মূলত বিপরীতমুখী।

"শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায়ও পুঁজির অতি দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের বাস্তব অস্তিত্বের যত বেশি উন্নতিই হোক না কেন, তা কখনই শ্রমিকের স্বার্থের সঙ্গে বুর্জোয়াদের অর্থাৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থের মধ্যকার বিরোধকে দূর করতে পারে না। মুনাফা ও মজুরি আগেকার মতোই বিপরীত অনুপাতে যুক্ত থাকে।" (মার্কস—মজুরি-শ্রমিক ও পুঁজি)।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার

এতক্ষণ আমরা মজুরি ও মুনাফার বিপরীত গতি এবং শ্রমিকশ্রেণী ও পুঁজিপতিশ্রেণীর বিপরীতমুখী স্বার্থের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। তার আগেই আমরা দেখেছি, কি করে পুঁজিপতি মজুরি দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করে এবং সেই শ্রমশক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে, অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করে। এইবার আমরা নির্ণয় করব উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার, আর সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণের হার। আমরা আরো দেখব, কি ভাবে পুঁজিপতিশ্রেণী এই শোষণের হার বাড়াতে চেষ্টা করে, আর কি করেই বা শ্রমিকশ্রেণী তা রুখতে পারে।

পণ্য উৎপাদনে পুঁজিপতি মোট যে পুঁজি নিযুক্ত করে, তাকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—(১) প্রথম ভাগটি দিয়ে সে কাঁচামাল, শ্রমযন্ত্র, কারখানার জন্য বাড়ি, জমি ইত্যাদি সংগ্রহ করে। (২) আর দ্বিতীয় ভাগটি দিয়ে সে ক্রয় করে শ্রমিকের শ্রমশক্তি, অর্থাৎ তা দিয়ে সে শ্রমিকের মজুরি দেয়।

আমরা একটু আগেই দেখেছি যে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে পণ্য উৎপন্ন হয়, তার মূল্য মূলতঃ দুটি অংশে বিভক্ত—(১) অতীত সঞ্চিত শ্রম অর্থাৎ শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি হারাহারি অংশের মূল্য। (২) বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য।

আমরা আরো দেখেছি যে, বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে যে মূল্য সৃষ্টি হয়, তা সব সময়ই তার মজুরি মূল্যের চেয়ে বেশি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিপতির মোট পুঁজির প্রথম অংশটি পণ্যের মূল্য অপরিবর্তিত অবস্থায় হাজির হয়। তাই

পুঁজির এই অংশটিকে আমরা বলব অপরিবর্তমান বা স্থির পুঁজি। আবার পুঁজির দ্বিতীয় অংশটির (অর্থাৎ যা দিয়ে শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয়) মূল্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ পণ্যের মূল্যে আত্মপ্রকাশ করে। তাই পুঁজির এই অংশটিকে আমরা পরিবর্তমান বা পরিবর্তনশীল পুঁজি বলব।

সুতরাং মোট পুঁজি = স্থির পুঁজি + পরিবর্তনশীল পুঁজি

অথবা পু = স্থিপু + পপু

আমরা জানি উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয় পরিবর্তনশীল পুঁজি থেকে। আবার উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে সেই মূল্য = মজুরির-মূল্য + উদ্বৃত্ত-মূল্য।

সুতরাং মজুরি ও উদ্বৃত্তমূল্য, উভয়েই মূলত পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত। তাই আমরা উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার নির্ণয় করার সময় উদ্বৃত্ত-মূল্যকে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে তুলনা করব। যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যকে আমরা সংক্ষেপে 'উমূ' বলি, তবে—

$$\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্য}}{\text{পরিবর্তনশীল পুঁজি}} = \frac{\text{উমূ}}{\text{পপু}}$$

উদ্বৃত্ত-মূল্য হলো শ্রমিকের শ্রমের উৎপন্ন মূল্যের সেই অংশ, যা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়, অর্থাৎ শ্রমিককে শোষণ করে উৎপন্ন মূল্যের যে অংশটি পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হারই যথার্থত পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে শোষণের হার। অর্থাৎ, উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার = শ্রমিক শোষণের হার

উপরে আমরা জেদ কারখানার যে উদাহরণটি দিয়েছি তার মালিকের উদ্বৃত্ত-আদায়ের হার এবং সেই সঙ্গে ঐ মালিক কর্তৃক তার শ্রমিকদের শোষণের হার হবে—

$$\frac{\text{উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের হার}}{\text{বা শ্রমিক শোষণের হার}} = \frac{\text{উমূ}}{\text{পপু}} = \frac{\text{১৬ টাকা}}{\text{১৬ টাকা}} = \text{শতকরা ১}$$

আমরা জানি, উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতিশ্রেণীর মুনাফার উৎস। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হারের উপর, তথা শ্রমিক শোষণের হারের উপর পুঁজিপতিদের মুনাফার হার নির্ভর করে। এর অর্থ এই যে, যে পুঁজিপতি তার কারখানা বা খামারে নিযুক্ত শ্রমিকদের নিকট থেকে যে-কোনো উপায়ে নির্দিষ্ট

মজুরির বিনিময়ে যত বেশী উদ্‌বৃত্ত-মূল্য আদায় করতে পারবে, তার মুনাফার হারও তত বেশী হবে। বিপরীতভাবে বললে এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, শ্রমিক যদি নির্দিষ্ট সময়ের কাজের জন্য প্রাপ্ত মজুরি বাড়িয়ে নিতে পারে, তবে তার ফলে পুঁজিপতির মুনাফার হার কমে যাবে।

কিছু কিছু বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদদের মত হল এই যে, জাতীয় উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট অংশ শ্রমিকশ্রেণীর মজুরির জন্য ঠিক করা আছে। এই তত্ত্বকে বলা হয়, "মজুরি ভাণ্ডারের তত্ত্ব"। এই তত্ত্ব মতে মজুরি ভাণ্ডার যেন নির্দিষ্ট আয়তনের একটি চৌবাচ্চা, মজুরিরূপ জল দিয়ে তা ভরা রয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে জাতীয় মজুরির সমপরিমাণ জল ধরে এমনি একটি ঘটি। প্রত্যেকটি শ্রমিক মজুরি হিসাবে এক ঘটি করে জল পাওয়ার হকদার। এই অবস্থায় কিছু শ্রমিক যদি দুই বা তিন ঘটি করে জল নিয়ে নেয়, তবে যারা পরে আসবে তাদের ভাগে কম পড়তে বাধ্য। এই তত্ত্ব তুলে ধরে বুর্জোয়া পণ্ডিতরা শ্রমিকদের বোঝাতে চায় যে শ্রেণী হিসাবে মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন করে শ্রমিকশ্রেণী মোটের উপর কখনও লাভবান হতে পারে না। এমন হতে পারে যে, কোনো একটি শিল্পের শ্রমিকরা তাদের মজুরি বাড়িয়ে নিতে পারে; ফলে অন্যান্য শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সেই পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু আমরা একটু আগেই দেখেছি যে শ্রমিক যদি তার নির্দিষ্ট সময়ের শ্রমের জন্য মজুরি বাড়িয়ে নিতে পারে তবে তার নিয়োগকারীর উদ্‌বৃত্ত-মূল্য আদায়ের পরিমাণ কমে যাবে। এই ঘটনা অন্য শ্রমিকদের মজুরির পরিমাণের উপর কোনো প্রভাবই বিস্তার করবে না।

পুঁজিপতিদের হিসাবে মুনাফার হার

আমাদের উদাহরণের লোহ কারখানার মালিকের ক্ষেত্রে দেখতে পেলাম যে সে তার শ্রমিকদের শতকরা ১০০ ভাগ হারে শোষণ করছে। কিন্তু যদি ঐ মালিকের হিসাবের খাতা দেখি তবে দেখতে পাবো যে, তার হিসাবমতো সে অনেক কম হারে মুনাফা পাচ্ছে। এই তারতম্যের কারণ কি?

এর কারণ এই যে পুঁজিপতিশ্রেণী তার লগ্নীকৃত মোট পুঁজির সঙ্গে উদ্‌বৃত্ত-মূল্যের অনুপাত করে মুনাফার হার নির্ণয় করে। তাদের মুনাফার হারের সূত্র হলো।

$$\text{মুনাফার হার} = \frac{\text{উদ্‌বৃত্ত-মূল্য}}{\text{মোট পুঁজি}} = \frac{\text{উমূ}}{\text{স্থিপুঁ + পপুঁ}}$$

এই সূত্র মতো আমাদের লেদ কারখানার মালিকের মুনাফার হার হবে—

$$\text{মুনাফার হার} = \frac{\text{উমূ}}{\text{স্থিপূ} + \text{পপূ}} = \frac{\text{১৬ টাঃ}}{\text{৩৮ টাঃ} + \text{১৬ টাঃ}} = \text{২৯.৬ ভাগ শতকরা}$$

মুনাফার এই হার দেখলে মনে হবে, পুঁজিপতি তো শ্রমিককে খুব বেশি শোষণ করছে না। প্রকৃতপক্ষে এই হিসাব পুঁজিপতিশ্রেণীর নিজেদের হিসাব মতো মুনাফার হার হলেও, এ কখনই শ্রমিকশ্রেণীর শোষণের হার প্রকাশ করে না।

কারণ, উদ্বৃত্ত-মূল্য কখনই মোট পুঁজির সমস্ত অংশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয় নয়। মোট শ্রম-সময়ের একটি অংশ হলো আবশ্যিক-শ্রম-সময়। এই আবশ্যিক শ্রম-সময় সম্বন্ধে শ্রমিকের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কারণ, সে যদি পুঁজিপতির অধীনে কাজ না করতো, তবুও তার নিজের ভরণ-পোষণের জন্য এই সময়টুকু তাকে অবশ্যই শ্রম করতে হতো। মোট শ্রম-সময়ের অপর অংশটি হলো উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। এই উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়টি শ্রমিকের নিজস্ব প্রয়োজন ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার উপর চাপানো শ্রম। আর এর মধ্য দিয়েই শ্রমিককে শোষণ করা হয়।

কিন্তু, যেহেতু চুক্তির সময় গোটা শ্রম-সময়কে কখনও এমনিভাবে 'আবশ্যিক' ও 'উদ্বৃত্ত' বলে ভাগ করে দেখানো হয় না, তাই শ্রমিক কার্যত তার উপর শোষণের পরিমাণ ও গুরুত্ব বুঝতে পারে না। পুঁজিপতিও মোট শ্রম-সময়ের মূল্যই মজুরি হিসাবে দিচ্ছে বলে শ্রমিককে বুঝিয়ে দেয়।

আমরা দেখেছি, পুঁজিপতি শ্রমিককে মজুরি দেয় পরিবর্তনশীল পুঁজি দিয়ে। শ্রমিক মোট শ্রম-সময় কাজ ক'রে পণ্যে যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, তা হলো মজুরি-মূল্য + উদ্বৃত্ত-মূল্য। উৎপাদন প্রক্রিয়া আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, স্থির-পুঁজি শুধু হারাহারি অংশেই নতুন পণ্যে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টির কাজে স্থির-পুঁজির কোনো অর্থনৈতিক ভূমিকা নেই। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সম্বন্ধ শুধু পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে। সুতরাং শ্রমিককে কি অনুপাতে শোষণ করা হচ্ছে, তার হিসাব উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে তুলনা করেই নির্ণয় করতে হবে, উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মোট পুঁজির সঙ্গে তুলনা করে নয়।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বৃদ্ধির উপায়

আমরা দেখেছি যে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনে শ্রমিকের মোট শ্রম-সময় দুটি অংশে বিভক্ত—(১) আবশ্যিক শ্রম-সময়, (২) উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

অর্থাৎ, মোট সময়=আবশ্যিক শ্রম-সময়+উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়।

এই সমীকরণের যে কোন দুটি রাশির পরিমাণ জানা থাকলে, আমরা তৃতীয়টি নির্ণয় করতে পারি। সুতরাং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে হলে আমাদের প্রথমে আবশ্যিক শ্রম-সময় ও মোট শ্রম-সময়ের পরিমাণ জানতে হবে।

শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ কিভাবে ঠিক হয়

আবশ্যিক-শ্রম-সময় হল সেই পরিমাণ শ্রম-সময় যেটুকু প্রতিটি শ্রমিক নিজের প্রয়োজনেই কাজ করতে বাধ্য। কারণ তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করার জন্য এই সময়টুকু তাকে শ্রম করতেই হয়। কোন এক দেশের শ্রমিকের প্রয়োজনীয় পণ্য-মূল্যের পরিমাণ সেই দেশের জলবায়ু, প্রাকৃতিক পরিবেশ, উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশের স্তর ও ইতিহাস নির্ধারিত জীবন-যাত্রার মানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু কোন এক বিশেষ যুগে কোন এক বিশেষ দেশে তা প্রায় একই থাকে। সুতরাং, আমরা সহজেই তা জানতে পারি এবং তার সমান মূল্য সৃষ্টি করতে কত শ্রম-সময় প্রয়োজন হয় তাও নির্ণয় করতে পারি। সুতরাং আবশ্যিক শ্রম-সময় একটি জানা রাশি।

মনে করি, দৈনিক হিসাবে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ ৪ ঘণ্টা। এর অর্থ হল, একজন শ্রমিক দৈনিক ৪ ঘণ্টা শ্রম করলেই তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যের সমান মূল্য সৃষ্টি করতে পারে।

এইবার দেখা যাক মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ কিভাবে ঠিক হয়। একদিনের মোট পরিমাণ হল ২৪ ঘণ্টা। আবার আবশ্যিক শ্রমের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪ ঘণ্টা। সুতরাং, মোট শ্রম-সময়ের পরিমাণ ২৪ ঘণ্টার বেশি হতে পারে না, আবার তা ৪ ঘণ্টার কমও হতে পারে না। মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ স্থির করার ব্যাপারে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ স্বভাবতই বিপরীতমুখী। পুঁজিপতি চাইবে মোট শ্রম-সময় যেন ২৪ ঘণ্টার খুব কাছাকাছি হয়। কারণ, তাহলে আবশ্যিক

শ্রম-সময় বাদ দিয়ে যথেষ্ট বেশি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় পাওয়া যাবে। আবার, শ্রমিক চাইবে মোট শ্রম-সময় যেন ৪ ঘণ্টার খুব কাছাকাছি থাকে; কারণ তবেই তাকে বিনা মজুরিতে বেশি সময় শ্রম করতে হবে না। এই অবস্থায় তাদের দ্বন্দ্ব মেটানোর জন্য যেহেতু "কোন উচ্চতর কর্তৃপক্ষ নেই, তাই বিষয়টি বলপ্রয়োগের সাহায্যেই মীমাংসা করা হয়। তাইত শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ নির্ণয়ের ইতিহাস হল—জোটবদ্ধ পুঁজিপতি ও জোটবদ্ধ শ্রমিক অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শ্রম-সময়ের দৈর্ঘের পরিমাণ চূড়ান্তভাবে নির্ণয়ের সংগ্রামের ইতিহাস।" (এঙ্গেলস—মার্কসের ক্যাপিটাল প্রসঙ্গে)।

পুঁজিপতিশ্রেণীর অর্থনৈতিক ক্ষমতা অনেক বেশি। তাই এই সংগ্রামে সে নিশ্চয়ই বেশি সুবিধা ভোগ করে। তাই বলে সে কিন্তু মোট শ্রম-সময়কে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পারে না। কারণ, শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে হলে একজন শ্রমিককে অবশ্যই দিনে কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করতে দিতে হয়। তা না হলে পরের দিন সে আর চুক্তিমতো শ্রম-সময় কাজ করার মতো শারীরিক অবস্থায় থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাজের চাপে ও সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চাপে পুঁজিপতিকে বাধ্য করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুঁজিপতি শ্রেণী শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শ্রমিকের বাঁচা মরা সম্বন্ধে উদাসীন থাকে।

অবশ্য পুঁজিবাদের নিজস্ব প্রতিযোগিতা থেকেই প্রতিটি পুঁজিপতির আচরণের উপর খবরদারি করার ক্ষমতা সমাজের হাতে এসে যায়। তা ছাড়া রয়েছে শ্রমিকের সংঘশক্তি। এই সংঘশক্তির জোরে সে পুঁজিপতিকে মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ কমাতে বাধ্য করতে পারে। পুঁজি হল সঞ্চিত অতীত-শ্রম অর্থাৎ মৃত-শ্রম। একমাত্র প্রাণবন্ত-শ্রমকে নিজের সেবায় নিযুক্ত করে পুঁজি অর্থাৎ মৃত-শ্রম বেঁচে উঠতে পারে ও তার আয়ু দীর্ঘতর করতে পারে। সুতরাং সংঘবদ্ধ প্রাণবন্ত-শ্রম অর্থাৎ সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী যদি সঞ্চিত অতীত-শ্রম অর্থাৎ পুঁজিকে সেবা করতে রাজী না হয়, অর্থাৎ কাজ করতে অস্বীকার করে, তবে পুঁজির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়ে।

কিন্তু পুঁজিবাদের প্রথম যুগে শ্রমিকশ্রেণী সংগঠিত ছিল না। তখন শ্রমিক সংগঠন আইনত নিষিদ্ধ ছিল। তাই সেই যুগে পুঁজিপতিশ্রেণী মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ দীর্ঘতর রেখে বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করেছে। সেই আমলে মোট শ্রম-সময় দৈনিক ১৮/১৯ ঘণ্টা পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল।

শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ নির্ণয়ের ব্যাপারে পুঁজিপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের বিরোধটিকে একটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে দেখা যাক।
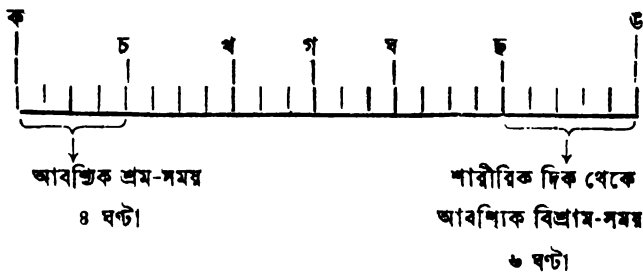
উপরের চিত্রে 'ক ঙ' সরল রেখাটি দিয়ে একটি দিনের ২৪ ঘণ্টার দৈর্ঘ বুঝানো হচ্ছে। ছোট ছোট দাগ দিয়ে 'ক ঙ'কে ২৪টি সমান অংশে ভাগ করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিটি ছোট অংশের দৈর্ঘ ১ ঘণ্টা সময় বুঝাবে।

এইবার মনে করি, আবশ্যিক শ্রম-সময়—৪ ঘণ্টা, এবং তা 'ক চ' অংশ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে। এবার, মনে করি, শারীরিক দিক থেকে বিচার করলে প্রতিটি শ্রমিককে দিনে অন্ততঃ ৬ ঘণ্টা বিশ্রাম করতে দিতে হবে। এই আবশ্যিক বিশ্রাম সময়টিকে 'ঙ ছ' অংশ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে।

তাহলে পড়ে থাকল 'চ ছ' অংশটি। আর এই অংশটির দৈর্ঘ হল ১৪ ঘণ্টা। এই অংশটি নিয়েই যত মারামারি। পুঁজিপতি চাইবে 'চ ছ' এর গোটা অংশটাই 'ক চ' এর সঙ্গে যুক্ত করে মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ 'ক চ' অর্থাৎ, ১৮ ঘণ্টা পর্যন্ত বিস্তৃত করতে, কারণ তবেই সে গোটা 'চ ছ' অংশটি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হিসাবে পেতে পারেন। কিন্তু শ্রমিক চাইবে উল্টোটি। 'চ ছ' অংশের যত কম অংশ 'ক চ' অংশের সঙ্গে যুক্ত হয় ততই তার সুবিধা।

এই টানা পোড়েনের মধ্য দিয়ে মোট শ্রম-সময় 'ক খ', 'ক গ', 'ক ঘ' বা 'ক ছ' প্রভৃতি যে কোন একটি স্থানে বা তাদের মধ্যবর্তী কোন স্থানে ঠিক হবে। মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ স্থির হয়ে যাওয়ার পর তা থেকে 'ক চ' অংশ বাদ দিলেই উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ পাওয়া যাবে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য, তথা মুনাফা বৃদ্ধির উপায়

শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতির মুনাফার উৎস। পর-শ্রমভোগী পুঁজিপতিশ্রেণী এই মুনাফা আত্মসাৎ করেই বেঁচে থাকে। মনে করি, মোট শ্রম-সময় ৮ ঘণ্টা। তার মধ্যে ৪ ঘণ্টা হল আবশ্যিক শ্রম-সময়, আর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হল ৪ ঘণ্টা। এ অবস্থায় কোন পুঁজিপতি যদি মাত্র একজন শ্রমিক নিয়োগ করে তবে সে কেবলমাত্র তার শ্রমিকের মতই জীবন যাপন করতে পারে। নিজের

জীবন যাত্রার মান শ্রমিকের মানের চেয়ে দুগুণ, তিনগুণ, চারগুণ ভাল করতে হলে তাকে শ্রমিকের সংখ্যা সেই অনুপাতে বাড়াতে হবে।

কিন্তু পুঁজিপতিরা সব সময়ই তার শ্রমিকদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি ভালভাবে বাঁচতে চায়। আবার সেই সঙ্গে পুঁজির পরিমাণও ক্রমাগতই বাড়িয়ে যেতে চায়। সেই ক্ষেত্রে পুঁজিপতিকে আনুপাতিক হারে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াতে হয়, অর্থাৎ তার পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হয়। এমনি ভাবে পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে পুঁজিপতি তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণ বাড়াতে পারে। এখানে কিন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের হার বৃদ্ধি পায় না, উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট পরিমাণেরই বৃদ্ধি হয় মাত্র।

কিন্তু এই পদ্ধতিতে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানোর পথে স্থির পুঁজির পরিমাণ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। কারণ, প্রতিটি নতুন শ্রমিকের জন্যই কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন, অর্থাৎ স্থির পুঁজির প্রয়োজন। তাই শ্রমিকের সংখ্যা বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানোর সম্ভাবনা স্থির পুঁজির পরিমাণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। অবশ্য একই শ্রমযন্ত্রে দিনে ও রাত্রে দু'দল বা তিনদল শ্রমিক আলাদা আলাদা নিযুক্ত করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়। কিন্তু, তাহলেও কাঁচামালের পরিমাণ বাড়ানোর সমস্যা থেকেই যায়।

এ অবস্থায় পুঁজিপতি অন্য কি উপায়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়াতে পারে? তা হতে পারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বৃদ্ধি করে। মনে করি, উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ। এ অবস্থায় যদি ১০ জন শ্রমিকের মজুরি ৫০ টাকা হয়, তবে পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হবে ৫০ টাকা। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না করে পুঁজিপতি যদি তার উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ৭৫ টাকা করতে চায়, তবে তার উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার হতে হবে শতকরা ১৫০ ভাগ।

কি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ থেকে শতকরা ১৫০ ভাগ করা যায়? তা করা যায় উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়িয়ে। মনে করি দৈনিক মোট শ্রম-সময় ছিল ৮ ঘণ্টা, তার মধ্যে ৪ ঘণ্টা আবশ্যিক ও ৪ ঘণ্টা উদ্বৃত্ত। মোট শ্রম-সময়কে যদি বাড়িয়ে ১০ ঘণ্টা করা যায় তো কি দাঁড়াবে? আবশ্যিক শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টাই থাকবে। অথচ উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৬ ঘণ্টা হয়ে যাবে। ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার দাঁড়াবে শতকরা ১৫০ ভাগ। পুঁজিপতির মোট মুনাফার পরিমাণ ৫০ টাকা থেকে বেড়ে ৭৫ টাকা হয়ে যাবে।
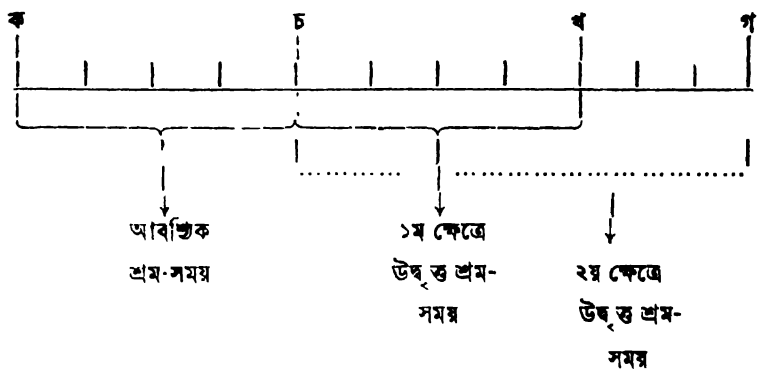
উপরের চিত্রে প্রথম ৮ ঘণ্টার মোট শ্রম-সময়কে 'কখ' রেখা দ্বারা বুঝানো হয়েছে। এর মধ্যে 'কচ' দ্বারা ৪ ঘণ্টার আবশ্যিক ও 'চখ' দ্বারা ৪ ঘণ্টার উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বুঝানো হয়েছে। পরে মোট শ্রম-সময় ২ ঘণ্টা বেড়ে যাওয়ায় নতুন মোট শ্রম-সময় হবে 'কগ'। কিন্তু, আবশ্যিক শ্রম-সময় সেই 'কচ'ই থেকে যাবে। ফলে নতুন উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হবে 'চগ' অর্থাৎ 'চখ'+'খগ'। অর্থাৎ আবশ্যিক শ্রম-সময়ের কোন পরিবর্তন না করেই উদ্বৃত্ত 'চখ' অংশের সঙ্গে 'খগ' অংশ যোগ করে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। যেহেতু আবশ্যিক শ্রম-সময়ের কোন পরিবর্তন না করে বা অন্য কোন কিছুর উপর নির্ভর না করেই উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়ানো হয়েছে. তাই একে বলা হয় **নিরপেক্ষ বৃদ্ধি**।

মোট শ্রম সময়ের দৈর্ঘ বৃদ্ধি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বৃদ্ধি করা পুঁজিবাদ পত্তনের প্রথম দিকে সম্ভব ছিল। কিন্তু, ক্রমে শ্রমিকশ্রেণী সংঘবদ্ধ হতে লাগল। তাদের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে এই ব্যবস্থা রোধ করা সম্ভব হল। সংঘবদ্ধ শ্রমিকশ্রেণীর চাপে আধুনিক প্রতিটি রাষ্ট্র মোট শ্রম-সময়ে দৈর্ঘ বেঁধে দিতে বাধ্য হয়েছে। অবশ্য একথা ঠিক যে, শ্রমিকশ্রেণীর দীর্ঘ সংগ্রামের ফলেই এই ব্যবস্থা আদায় করা সম্ভব হয়েছে।

একতরফা মোট শ্রম-সময় বাড়িয়ে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বাড়াতে গিয়ে পুঁজিপতিকে নানা অসুবিধা ও বাধার মুখোমুখি হতে হয়। তাই এখন উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বাড়াতে পুঁজিপতিরা অন্য কৌশল গ্রহণ করে।

আমরা দেখেছি মোট শ্রম-সময়কে দু'টি অংশে বিভক্ত করা যায়—(১) আবাশ্যক শ্রম-সময়, (২) উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। আমরা আরো দেখেছি যে, কোন একটি দেশে প্রচলিত উৎপাদন ব্যবস্থায়, প্রচলিত সামাজিক পরিবেশে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। সেই অবস্থায় যদি কোনো উপায়ে আবশ্যিক শ্রম-

সময়ের দৈর্ঘ কমিয়ে দেওয়া যায়, তবেই মোট শ্রম-সময় না বাড়িয়েও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ বাড়ানো সম্ভব। এর অর্থ হল, শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করতে শ্রমিকের এখন যে সময় লাগছে, কোন কৌশলে সেই সময়ের দৈর্ঘ কমিয়ে আনতে হবে, অর্থাৎ আগের চেয়ে কম সময়ে শ্রমিক তার মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করতে পারবে।

দুটি উপায়ে তা করা সম্ভব—(১) শ্রমিকের শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি করে (২) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

প্রথমটি হতে পারে শ্রমিকের কাজের উপর খবরদারী বৃদ্ধি করে ও শ্রমিক যে শ্রমযন্ত্র ব্যবহার করে তার গতি বাড়িয়ে। এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র খুবই সীমাবদ্ধ।

আর দ্বিতীয়টি হতে পারে উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি করে এবং উৎপাদনে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। বলতে গেলে কি এই পদ্ধতির প্রয়োগক্ষেত্র অসীম। উৎপাদন পদ্ধতির নব নব বিকাশ ও শ্রমযন্ত্রের নব নব উন্নতির ফলেই আদিম অনুন্নত মানুষ আজকের দিনের উন্নত মানুষে পরিণত হয়েছে। আবার এই ধারা অনুসরণ করেই মানুষ আরো উন্নততর পর্যায়ে উঠতে পারবে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি দেখা যাক। মনে করি, আইনত শ্রমিকের মোট শ্রম-সময় দৈনিক ৪ ঘণ্টা। আবার প্রচলিত উৎপাদন ও সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকের আবশ্যিক শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ ৪ ঘণ্টা। সুতরাং উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় থাকবে ৪ ঘণ্টা। আরো মনে করি, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫ টাকা, অর্থাৎ আবশ্যিক শ্রম-সময়ের ৪ ঘণ্টায় শ্রমিক ৫ টাকার মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। এর অর্থ হল, শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় ১·২৫ টাকার মূল্য সৃষ্টি করে। আর এই অবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ থাকে ৫ টাকা।

পুঁজিপতিরা সব সময়ই চায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে। কিন্তু আইনত বাধা থাকায় তারা এখন মোট শ্রম-সময়ের দৈর্ঘ বাড়াতে পারে না। আর শ্রমিকের মজুরি কমানোর কথা তো উঠতেই পারে না। তাই তারা অন্য দিকে মন দেয়। শ্রমিকদের কাজের উপর খবরদারী করার জন্য সুপারভাইজার নিযুক্ত করে। কারখানায় উন্নত ধরনের নতুন যন্ত্র বসায়। উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োজনীয় রদবদল করে। ফলে, শ্রমিক আগে মাঝে মাঝে যে দু'এক মিনিট দম নিয়ে কাজ করতে পারত এখন তা পারে না। তার উপর উন্নত দ্রুতগতি যন্ত্রের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তার শ্রম আরো তীব্র হয়। শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বেড়ে যায়।

মনে করি. আগে একজন শ্রমিক প্রতি ঘণ্টায় ১.২৫ টাকার মূল্য সৃষ্টি করতে পারত, এখন সে প্রতি ঘণ্টায় ১.৬৬ টাকার মূল্য সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এখন শ্রমিকের ৫ টাকা মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি হতে (৫ ÷ ১.৬৬) ঘণ্টা = ৩ ঘণ্টা সময় লাগবে। এইভাবে আবশ্যিক শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টা থেকে কমে ৩ ঘণ্টা হয়ে যাবে। আর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ৪ ঘণ্টা থেকে বেড়ে গিয়ে (৮ − ৩) ঘণ্টা = ৫ ঘণ্টা হবে। অনুরূপভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণও ৫ টাকা থেকে বেড়ে গিয়ে (১.৬৬ × ৫) টাকা = ৮.৩০ টাকা হবে, অর্থাৎ (৮.৩০ − ৫) টাকা = ৩.৩০ টাকা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হারের নিম্নরূপ পরিবর্তন হবে।
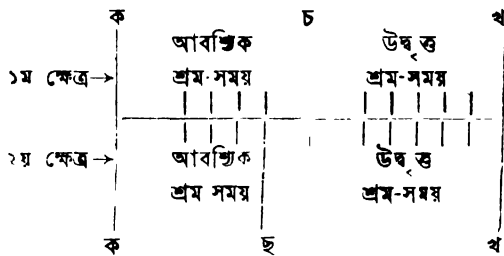
'কখ' রেখাটি ৮ ঘণ্টার শ্রম-সময় বুঝাচ্ছে। ১ম ক্ষেত্রে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের ৪ ঘণ্টা 'কচ' দ্বারা দেখানো হয়েছে। তখন উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় ছিল 'খচ' অংশ, অর্থাৎ ৪ ঘণ্টা।

পরবর্তী সময়ে (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে) আবশ্যিক শ্রম-সময় কমে গিয়ে 'কছ' হয়ে যায় এবং তার দৈর্ঘ হয় ৩ ঘণ্টা। আর উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় হয়ে যায় 'ছখ' অংশ, অর্থাৎ ৫ ঘণ্টা।

এই পদ্ধতিতে আবশ্যিক শ্রম-সময় কমিয়ে উদ্বৃত্ত শ্রম-সময় বাড়ানো হয় বলে একে বলা হয় উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের **আপেক্ষিক বৃদ্ধি**।

মজুরির স্বরূপ

আমরা দেখেছি যে, মজুরি হলো শ্রমিকের শ্রমশক্তির দাম। কিন্তু বুর্জোয়া ব্যবস্থায় মজুরি কথাটিকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যেন মজুরি হলো শ্রমিকের শ্রমের দাম। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে চুক্তিমতো মজুরি ঠিক হয়। চুক্তিতে দু'টি জিনিসের উল্লেখ থাকে—(১) শ্রমিক দৈনিক কত সময় শ্রম করবে, (২) ঐ শ্রম-সময় শ্রম করার জন্য শ্রমিক দৈনিক কত মজুরি পাবে। ফলে এই ধারণাই এসে যায় যে, শ্রমিক নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ের শ্রমের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ মজুরি পায়।

আর যখন স্বাধীন চুক্তির মাধ্যমে ব্যবস্থাটি হয়, তখন শ্রমিক নিশ্চয়ই মজুরি হিসাবে তার শ্রমের পুরো দামই নিয়ে নেয়। কিন্তু, আমরা দেখেছি যে, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল।

উৎপাদন প্রক্রিয়ার আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, একমাত্র মানুষের শ্রমই পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করে। বুর্জোয়া পণ্ডিতগণও এ কথা স্বীকার করেন। সুতরাং, শ্রমই হলো মূল্যের মাপকাঠি। তা হলে শ্রমের মূল্যকেও আমাদের শ্রম দিয়েই মাপতে হবে। যেমন, বলতে হবে,—আট ঘণ্টা শ্রমের মূল্য আট ঘণ্টার শ্রম। এটা একটা বগড়ের ব্যাপার নয় কি? তবুও আমরা যদি এই হাস্যকর ব্যাপারটি মেনে নিই, তবে তার অর্থ দাঁড়ায় না কি যে, শ্রমিকের আট ঘণ্টার শ্রমের ন্যায্যমূল্য হবে, আট ঘণ্টায় সে যে পণ্য-মূল্য সৃষ্টি করেছে—তার সবটাই?

শ্রমিক যে মূল্য সৃষ্টি করে, তার সবটাই যদি মজুরি হিসাবে নিয়ে নেয়, তবে পরশ্রমভোগী পুঁজিপতিশ্রেণী বাঁচে কি করে? তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, হয় পুঁজিপতি শ্রমিককে মজুরি হিসাবে তার শ্রমের ন্যায্য মূল্য না দিয়ে সেই মূল্যের একটি অংশ আত্মসাৎ করে, নয়তো মজুরি হিসাবে পুঁজিপতি যা দেয় তা শ্রমের মূল্য নয়, অন্য কিছুর মূল্য।

আমরা আগেই দেখেছি যে, এই অন্য কিছুই হলো শ্রমিকের শ্রমশক্তি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিশেষত্ব এই যে এখানে শ্রমিকের শ্রমশক্তি একটি পণ্য। পুঁজিপতি মূল্য দিয়ে, অর্থাৎ মজুরি দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তিরূপে পণ্যটি ক্রয় করে, শ্রমিকের শ্রমকে ক্রয় করে না। সুতরাং মজুরি হলো শ্রমশক্তিরই দাম, অথচ 'একদিনের শ্রমের মজুরি' এইরূপ বলার ম] দিয়ে একটি মিথ্যা ধারণাই সৃষ্টি করা হয়। ফলে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিভ্রান্ত হয়। তারা মনে করে যে মজুরি হিসাবে শ্রমিক যা পায়, তা যেন তাদের গোটা শ্রমেরই দাম। ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী যে শ্রমের ফল আত্মসাৎ করছে সেই ধারণা তাদের থাকে না।

শ্রমশক্তি যেহেতু পণ্য, তাই তার দাম, অর্থাৎ মজুরিও অন্যান্য পণ্যের মতোই ঠিক হয়। আমরা জানি, অন্যান্য পণ্যের দাম মূলতঃ স্থির হয় তাদের উৎপাদন ব্যয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে। তেমনি শ্রমশক্তির দাম অর্থাৎ মজুরিও স্থির হয় শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ব্যয়ের ভিত্তিতে। আর সেই ব্যয়ের পরিমাণ হলো শ্রমিক ও তার পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয়ের সমান। অর্থাৎ পরিমাপে তা হয়—শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনধারণের উপায়ের দামের সমান।

শ্রমিক নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার শ্রমশক্তিরূপ পণ্যটি পুঁজিপতির নিকট বিক্রয় করে। এর অর্থ হল, ঐ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিজের শ্রম-

শক্তির উপর শ্রমিকের আর কোন অধিকার থাকে না; ঐ সময়ের জন্য তা তার নিয়োগকারী পুঁজিপতির সম্পত্তি হয়ে যায়। ফলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে তার শ্রমশক্তি খাটিয়ে শ্রমিক যা উৎপাদন করে তার সবটাই সেই পুঁজিপতির সম্পত্তি হয়ে যায়।

আমরা জানি মোট শ্রম-সময় ধরে তার শ্রমশক্তি খাটিয়ে, অর্থাৎ শ্রম করে শ্রমিক যে মূল্য উৎপাদন করে তা সাধারণতই তার মজুরি-মূল্যের চেয়ে বেশী হয়। এর অর্থ দাঁড়ায়—মোট শ্রম-সময়ের একটি অংশ শ্রম করেই শ্রমিক তার মজুরির সমান মূল্য সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে শ্রম-সময়ের বাকী অংশটি শ্রম করে (চুক্তিমতো গোটা শ্রম-সময় শ্রম করতে সে বাধ্য) সে যে মূল্য সৃষ্টি করে তা হয় উদ্বৃত্ত মূল্য। শ্রম-সময়ের প্রথম অংশটির আমরা নাম দিয়েছি আবশ্যিক শ্রম-সময়, আর দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। যেহেতু গোটা শ্রম-সময়ে সৃষ্ট মূল্যের সবটাই পুঁজিপতির পকেটে যায়, তাই শ্রমিকের মজুরি দিয়েও পুঁজিপতির পকেটে উদ্বৃত্ত মূল্যটি থেকে যায়।

কিন্তু, মূল রহস্যটি এইখানে যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থায় চুক্তির সময় মোট শ্রম-সময়ের এই দু'টি অংশকে আলাদা আলাদা দেখানো হয় না। মজুরির চুক্তি হয় গোটা শ্রম-সময়ের জন্য। তাই মনে হয়, মজুরি যেন গোটা শ্রম-সময়েরই দাম।

মধ্যযুগে সামন্ত ব্যবস্থায় কৃষকদের বেগার খাটতে হতো। যেমন, সপ্তাহে তিনদিন তারা কাজ করত নিজের জমিতে। বাকি ৩।৪ দিন তারা বেগার খাটতো জমিদারের খাস জমিতে। সুতরাং কোন অংশটি তার আবশ্যিক শ্রম-সময় আর কোন অংশটি উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়—কৃষক সাক্ষাৎভাবে তা বুঝতে পারতো। সে বুঝতে পারতো তার শোষণের পরিমাণ ও প্রকৃতি। আবার দাস ব্যবস্থার যুগে সেরূপ কোন ভাগ ছিল না। মনে হতো, ক্রীতদাসের গোটা জীবনটাই যেন উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়, আবশ্যিক শ্রম-সময়ের অনুভূতি চাপা পড়ে থাকতো। এর ঠিক উল্টোটাই ঘটে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়। এখানে শ্রমিক স্বাধীন। সুতরাং বলা হয় যে স্বাধীন চুক্তিমতো শ্রমিক শুধু আবশ্যিক শ্রম-সময়ই কাজ করে। আর তার জন্য সে চুক্তিমতো মজুরি পায়। এমনিভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের অনুভূতি মজুরির আড়ালে চাপা পড়ে যায়। "ক্রীতদাসের নিজের জন্য শ্রম তখনকার সম্পদ সম্পর্কে আড়ালে ঢাকা পড়ে যেত: আর এখানে অর্থ-সম্পর্ক মজুরি-শ্রমিকের অপ্রয়োজনীয় শ্রমকে ঢেকে রাখে।" (মার্কস—ক্যাপিটাল)

তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অর্থ-মজুরিকে শ্রমের মূল্য হিসাবে দেখার রীতিই চালু হয়ে গেছে। যার অর্থ হলো—পণ্য উৎপাদনে শ্রম হিসাবে শ্রমিক যে অংশ দেয়, তার গোটাটাই সে মজুরি হিসাবে পেয়ে যায়। পুঁজিপতিশ্রেণী ও তার আশ্রিত

পণ্ডিতরা এই মিথ্যা ধারণাটির চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করে। মজুরি সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব প্রচার করে তারা সাধারণ মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখে। 'মজুরি ভাণ্ডারের তত্ত্ব' তাদের অন্যতম। আমরা আগেই সেই তত্ত্বের অসারতা প্রমাণ করেছি।

এমনি আর একটি তত্ত্ব হল—'পণ্যের উৎপাদন-ব্যয় তত্ত্ব'। এই তত্ত্বের মতে মজুরি উৎপাদন ব্যয়েরই একটি অংশ, অর্থাৎ মজুরি বেড়ে গেলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। আবার, যেহেতু পণ্যের বাজার দাম তার উৎপাদন ব্যয়ের আশেপাশেই ওঠানামা করে, সুতরাং উৎপাদন ব্যয় বেড়ে গেলে পণ্যেব বাজার দামও বাড়তে বাধ্য। কিন্তু এ কথা ঠিক নয়।

ব্যাপারটি একটু বিস্তারিতভাবেই আলোচনা করা যাক; বুর্জোয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত থেকেই আমরা শুরু করব। সেই সিদ্ধান্তগুলি হল—

১। একমাত্র শ্রমই পণ্যে মূল্য সৃষ্টি করে (শ্রমই মূল্যের মাপকাঠি অর্থাৎ একটি পণ্যের মূল্য জানতে হলে, জানতে হবে পণ্যটি তৈরি করতে কি পরিমাণ প্রয়োজনীয় সামাজিক শ্রম ব্যয় হয়েছে)।

২। বিনিময় সব সময়ই সমান সমান মূল্যের মধ্যে (১০ টাকার সঙ্গে একটি পণ্যের বিনিময় হয়, অর্থাৎ একটি পণ্যের দাম ১০ টাকা—এর অর্থ হল, ১০ টাকা দ্বারা যতটুকু শ্রমের মূল্য বুঝায় পণ্যটিতে ততটুকু শ্রম আছে)।

৩। পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে পণ্য সাধারণতই তার প্রকৃত-মূল্যে বিক্রয় হয় (অর্থাৎ, পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে, পণ্যের দাম=পণ্যের প্রকৃত মূল্য= পণ্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শ্রম ব্যয় হয়েছে তার মূল্য=পণ্যের উৎপাদন-ব্যয়)।

৪। কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি হল সঞ্চিত অতীত শ্রম (যেহেতু শ্রমই মূল্যের মাপকাঠি তাই কোন পণ্যে যতটুকু কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির অংশ আছে, তা শ্রমের পরিমাণ দ্বারাই প্রকাশ করা যায়)।

যেহেতু বাজারে বিনিময় বা বিকিকিনি হয় টাকার মাধ্যমে, তাই আমরা মূল্যের পরিমাণকে অর্থাৎ শ্রমের পরিমাণকে টাকার পরিমাণ দ্বারা প্রকাশ করব। যখন একটি পণ্যের মূল্য বা দাম ১০ টাকা বলব, তখন তার অর্থ হবে—পণ্যটিতে যতটুকু শ্রম আছে তা ১০ টাকা মূল্যের শ্রমের সমান, অর্থাৎ পণ্যটির মূল্য বা দাম=১০ টাকা মূল্যের শ্রম।

আরো একটি বিষয় আমরা ধরে নিচ্ছি যে, আমাদের এই বিচারের সময়ের মধ্যে অন্যান্য সমস্ত কিছুই অপরিবর্তিত থাকবে।

এইবার দেখা যাক বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বলতে কি বোঝায়? তাদের মতে-

পণ্যের উৎপাদন ব্যয়--

কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির হারাহারি মূল্য (সঞ্চিত অতীত শ্রমের মূল্য)	+	বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট মূল্য (প্রাণবন্ত শ্রমের মূল্য)

কিন্তু আমরা জানি যে, বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্যের একটি অংশ শ্রমিক পায় মজুরি হিসাবে, আর অপর অংশটি পুঁজিপতি আত্মসাৎ করে মুনাফা হিসাবে। সেইমতো ভাগ করলে উৎপাদন ব্যয় দাঁড়ায়—

কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির হারাহারি মূল্য (সঞ্চিত অতীত শ্রমের মূল্য)	+	মজুরি + মুনাফা (প্রাণবন্ত শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য)

বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে উৎপাদন ব্যয়ের উপরোক্ত তিনটি অংশের একটির সঙ্গে অপরটির কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মজুরির পরিমাণ বাড়লে বা কমলে, মুনাফার পরিমাণের উপর তার কোন প্রভাব পড়বে না ; পরিবর্তন-যা হবে তা হল, পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে বা কমবে। তেমনি মজুরির পরিমাণ না কমিয়েও মুনাফার পরিমাণ বাড়ালে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে মাত্র।

মনে করি, একজন বাই সাইকেল উৎপাদনকারীর একটি সাইকেলের উৎপাদন ব্যয় ২১০ টাকা। উপবোক্ত সূত্রমতো তার উৎপাদন ব্যয়কে নিম্নরূপে ভাগ করা যায় –

সাইকেলের উৎপাদন ব্যয়

=২১০ টাকা (২১০ টাকা মূল্যের শ্রম)

=১৫০ টাকার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি

(১৫০ টাকা মূল্যের অতীত শ্রম)

+৩০ টাকার মজুরি (৩০ টাকা মূল্যের নতুন শ্রম)

+৩০ টাকার মুনাফা (৩০ টাকা মূল্যের নতুন শ্রম)

উপরোক্ত ৩নং সিদ্ধান্তমতো প্রতিটি সাইকেল তার উৎপাদন ব্যয়ের সমান দামে বিক্রয় হবে, অর্থাৎ ২১০ টাকায় বিক্রয় হবে।

এইবার মনে করি, এই সাইকেল কারখানার শ্রমিকগণ আন্দোলন করে সাইকেল প্রতি মজুরি ৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৫ টাকা করে নিল। পুঁজিবাদী

হিসাবমতো মজুরি বৃদ্ধির ফলে মুনাফার পরিমাণের কোন পরিবর্তন হবে না। কেবলমাত্র সাইকেলের উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাবে। যা দাঁড়াবে তা হলো,

সাইকেলটির নতুন উৎপাদন ব্যয়

=১৫০ টাকার কাঁচামাল, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি ইত্যাদি

(১৫০ টাকা মূল্যের অতীত শ্রম)

+৩৫ টাকা মজুরি (৩৫ টাকা মূল্যের নতুন শ্রম)

+৩০ টাকার মুনাফা (৩০ টাকা মূল্যের নতুন শ্রম)

=২১৫ টাকা (২১৫ টাকা মূল্যের শ্রম)

সুতরাং উপরোক্ত ৩ নং সিদ্ধান্তমতো এখন সাইকেলটি ২১৫ টাকায় বিক্রয় করতে হবে।

বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে, সাইকেলের উৎপাদন ব্যয়ের প্রথম ও শেষ অংশটির মূল্য অর্থের পরিমাপে অপরিবর্তিত রয়েছে। অথচ অর্থের পরিমাপে মজুরির পরিমাণ বেড়ে গেছে। তাই উৎপাদন ব্যয়ও সেই অনুপাতে বেড়ে যাবে। তাই সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের বাজার দামও বাড়তে বাধ্য। ফলে সাইকেল ব্যবহারকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাদের এখন একটি সাইকেল কিনতে ২১০ টাকার বদলে ২১৫ টাকা দিতে হবে। সুতরাং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়ে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি করা উচিত নয়।

কিন্তু, বিষয়টি একটু যুক্তিসঙ্গতভাবে দেখলেই বুর্জোয়া পণ্ডিতদের কারসাজিটি ধরা পড়ে যায়। মনে করি, ১ জন শ্রমিক ১ রোজ শ্রম করে ১০ টাকার সমান মূল্য সৃষ্টি করে। যেহেতু কেবলমাত্র শ্রমই পণ্যমূল্য সৃষ্টি করতে পারে, তাই সে হিসাবমতো সাইকেলটির প্রথম উৎপাদন ব্যয় ২১০ টাকা=২১ রোজ শ্রমের মূল্য। যাকে ভাগ করে দেখালে দাঁড়ায়—২১ রোজ শ্রমের মূল্য=১৫ রোজ সঞ্চিত অতীত শ্রমের মূল্য+৬ রোজ নতুন শ্রমের মূল্য।

আবার, সাইকেলটির দ্বিতীয় উৎপাদন ব্যয়, ২১৫ টাকা=২১½ রোজ শ্রমের মূল্য। ভাগ করে দেখলে তা দাঁড়ায়—২১½ রোজ শ্রমের মূল্য=১৫ রোজ সঞ্চিত অতীত শ্রমের মূল্য+৬½ রোজ নতুন শ্রমের মূল্য।

এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করে আগের বারে একজন শ্রমিক ৬ রোজ শ্রম করে একটি সাইকেল তৈরি করতে পারত; কিন্তু এখন মজুরি বেড়ে যাওয়ায় অনুরূপ একটি সাইকেল তৈরি করতে সেই শ্রমিকেরই ৬½ রোজ শ্রম প্রয়োজন হবে? অর্থাৎ মজুরি বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকের দক্ষতা কমে গেছে। খাঁটি বুর্জোয়া পণ্ডিতদের উপযুক্ত যুক্তিই বটে!

আবার, উপরোক্ত ১ নং সিদ্ধান্ত মতেও বিষয়টি অবাস্তব। ১ নং সিদ্ধান্ত-মতে শ্রমই যদি মূল্যের মাপকাঠি হয়, তবে দুটি সাইকেলের মূল্যই সমান হবে। কারণ একই প্রকারের দু'টি সাইকেল তৈরি করতে একই পরিমাণ শ্রম ব্যয় হবে। সুতরাং যা দাঁড়ায় তা হলো ২১০ টাকা=২১৫ টাকা, যা সম্পূর্ণ অবাস্তব।

এইবার আমরা দেখবো বুর্জোয়া পণ্ডিতদের এই অবাস্তব যুক্তির গোড়ায় গলদটি কোথায়। আমরা আগেই দেখেছি যে, বুর্জোয়া পণ্ডিতরা 'শ্রমশক্তিকে' 'শ্রম'এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন। তাই তারা মজুরিকে মনে করেন শ্রমের মূল্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মজুরি হলো শ্রমশক্তির মূল্য।

এইবার উপরোক্ত চারটি সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা যদি নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত দু'টি যোগ করে বিচার করি, তবে গোটা সমস্যাটি জলের মতো সহজ হয়ে যাবে। আমাদের নতুন সিদ্ধান্তগুলি হলো—

৫। মজুরি—শ্রমশক্তির দাম (শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপায়গুলির মূল্যের সমান শ্রম-মূল্য)।

৬। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্য=মজুরি-মূল্য+উদ্বৃত্ত-মূল্য (অর্থাৎ মজুরি ও উদ্বৃত্ত-মূল্য বর্তমান শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন মূল্যেরই দু'টি অংশ। এর একটি বাড়লে অপরটি কমবে, একটি কমলে অপরটি বাড়বে। অর্থাৎ মজুরির পরিমাণ বাড়লে. উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ কমবে।)

এইবার পূর্বের উৎপাদন ব্যয়দু'টিকে ব্যাখ্যা করা যাক—সাইকেলটির প্রথম উৎপাদন ব্যয়=২১০ টাকা (২১০ টাকা মূল্যের শ্রম)=১৫০ টাকার কাঁচামাল ইত্যাদি (১৫০ টাকা মূল্যের অতীত শ্রম)+[৩০ টাকার মজুরি+৩০ টাকার উদ্বৃত্ত-মূল্য] (নতুন শ্রমে সৃষ্ট ৬০ টাকার মূল্য)।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে বর্তমান শ্রমিকের শ্রম সাইকেলের মূল্যে (৩০+৩০) টাকা=৬০ টাকার নতুন সৃষ্ট মূল্য হিসাবে বর্তমান। তার মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য বা মজুরি=৩০ টাকার মূল্য, আর ৩০ টাকার উদ্বৃত্ত-মূল্য, যা পুঁজিপতি দখল করে।

এইবার মজুরির পরিমাণ বেড়ে গেলে নতুন-সৃষ্ট মূল্যের ভাগাভাগিরও রদবদল হবে। অর্থাৎ শ্রমিক যদি মজুরি হিসাবে ৩৫ টাকার মূল্য আদায় করে নেয়, তবে পুঁজিপতির ভাগে পড়বে (৬০—৩৫) টাকা=২৫ টাকার উদ্বৃত্ত মূল্য। ফলে সাইকেলটির দ্বিতীয় উৎপাদন ব্যয়ও ২১০ টাকাই থাকবে। যেমন, সাইকেলটির দ্বিতীয় উৎপাদন ব্যয়=১৫০ টাকার কাঁচামাল ইত্যাদি (১৫০ টাকা মূল্যের

অতীত শ্রম)+[৩৫ টাকার মজুরি+২৫ টাকার উদ্বৃত্ত মূল্য] (নতুন শ্রমে সৃষ্ট ৬০ টাকার মূল্য)।

তাই দেখা যাচ্ছে মজুরি বৃদ্ধির জন্য সাইকেলের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় না; এবং উপরোক্ত ৩নং সিদ্ধান্তমতো দু'টি সাইকেলই ২১০ টাকা দামে বিক্রয় হবে। মজুরি বৃদ্ধির ফলে যা হয়, তা হলো—পুঁজিপতির ভাগের উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ কমে যায়। তাই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবিকে পুঁজিপতি এত ভয়ের চোখে দেখে।

এইমাত্র আমরা দেখলাম যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির ফলে পণ্যের উৎপাদন ব্যয় বাড়ে না। সুতরাং এর ফলে পণ্যের বাজার দামও বাড়তে পারে না। অথচ বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় যে, শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণ্যের বাজার দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ কি? এর কারণ এই যে, বর্তমান যুগে প্রায় প্রতিটি বৃহৎ শিল্পই কম বেশি একচেটিয়া পুঁজির আওতায় পরিচালিত হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতার দ্বারা পণ্যের দাম এখন কদাচিতই ঠিক হয়ে থাকে। এ অবস্থায় একচেটিয়া পুঁজিপতিরা পণ্যের দাম একতরফাভাবে বাড়িয়ে দিয়ে, মূল্যবৃদ্ধির দোষটি মজুরি বৃদ্ধির উপর চাপিয়ে দেয়। বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ও মজুরি সম্বন্ধে ভুল ধারণার ফলে সাধারণ মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। তারা দেখতে পায় যে, কোন একটি শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই শিল্পের পণ্যের দাম বেড়ে যায়। এ যে একচেটিয়া পুঁজির কারসাজি, মৌলিক অর্থনৈতিক নীতির অবধারিত ফল নয়—তা তারা বুঝতে পারে না। তাই শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনকে তারা ভয়ের চোখে দেখে।

বিভিন্ন মজুরি প্রথা

মজুরি ব্যবস্থায় আমরা প্রধানতঃ তিন প্রকারের মজুরি প্রথা দেখতে পাই—(১) মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি, (২) ঘণ্টা হিসাবে মজুরি, (৩) ফুরণ মজুরি।

(১) মাসিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক মজুরি : এই প্রথায় মজুরি ঠিক হয় শ্রম-দিবসের একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ধরে। যেমন, শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য আট ঘণ্টা—মাসিক মজুরি ১২০ টাকা, সাপ্তাহিক ২৮ টাকা, দৈনিক মজুরি ৪ টাকা। (মাসিক ও সাপ্তাহিক মজুরির সময় রবিবারকে সবেতন ছুটির দিন হিসাবে ধরলে।)

আমরা দেখেছি যে, শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্যকে দু'টি অংশে ভাগ করা যায়। মনে

করি, শ্রম-দিবসের দৈর্ঘ্য আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টার মধ্যে চার ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রম-সময় ও চার ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। আরো মনে করি, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি চার টাকা। এর অর্থ হল, চার ঘণ্টার আবশ্যিক শ্রম-সময়ে শ্রমিক চার টাকার মূল্য সৃষ্টি করে, আর সেই চার টাকা মজুরি হিসাবে পায় এবং সপরিবারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম এই চার টাকা তার চাইই। তাই এই মজুরি তার অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাই এই চার টাকার মূল্য সৃষ্টি করতে চার ঘণ্টা শ্রম তাকে অবশ্যই করতে হবে। বাকি চার ঘণ্টায় সে যে চার টাকার মূল্য সৃষ্টি করবে তা তার নিয়োগকারী পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করবে। তবুও এই প্রথা অন্য দু'টি প্রথা থেকে শ্রমিকের পক্ষে লাভজনক ও নিশ্চিত। প্রথমতঃ, দৈনিক শ্রম-সময় নির্দিষ্ট থাকায় পুঁজিপতি শ্রমিককে বেশি সময় খাটতে বাধ্য করতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মজুরি হিসাবে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের মূল্য পায় বলে শ্রমিক সপরিবারে বেঁচে থাকার মতো নিশ্চয়তা বোধ করে।

পুঁজিপতি কিন্তু এই প্রথার মধ্যে থেকেই উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে। আর তা করে শ্রমিককে বাড়তি সময় কাজ করতে রাজী করিয়ে। প্রচলিত ভাষায় এর নাম 'ওভার টাইম' কাজ করা। চুক্তি মতো ৮ ঘণ্টা শ্রম করার পর যে সময়টুকু কাজ হয়, তাকেই বলে 'ওভার টাই'ম। আট ঘণ্টার শ্রমে পরিশ্রান্ত শ্রমিক ওভার টাইম কাজ করলে, তখন তার শ্রমশক্তির ক্ষয় স্বভাবতই তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। এ অবস্থায় ওভার টাইম কাজের জন্য শ্রমিকদের বেশি হারে মজুরির দাবি খুবই ন্যায়সঙ্গত।

কিন্তু একটা কথা বুঝতে হবে যে, ওভার টাইম কাজ করার প্রথা শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আমরা যদি দীর্ঘকালীন হিসাবে বিচার করি, তবে আমরা দেখতে পাবো যে, এর ফলে শ্রমিকের প্রকৃত-মজুরি কমে যাবে। কারণ, বেশির ভাগ শ্রমিকই যদি রোজ হিসাবে ওভার টাইম কাজ করে, তবে শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়েও শ্রমের যোগান বেড়ে যাবে। ফলে শ্রমিকদের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা দেখা দেবে, তার সুযোগ নিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রমিকদের মজুরি কমাতে পারবে বা প্রয়োজনীয় মজুরি-বৃদ্ধি আটকে রাখতে পারবে। আরো দীর্ঘদিন পরে দেখতে পাওয়া যাবে যে, ওভার টাইমের মজুরিসহ শ্রমিকের মোট প্রকৃত মজুরি আবশ্যিক শ্রম-সময়ের মূল্যের কাছাকাছি নেমে গেছে। তা ছাড়া ওভার টাইম মজুরির লোভ শ্রমিকের সংগ্রামী মনোবৃত্তি ভোঁতা করে দেয়। তাই অনেক সময় পুঁজিপতিরা ওভার টাইম মজুরির টোপ দিয়ে শ্রমিক ঐক্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করে।

এমনি ক্ষতিকর আর একটি ঘটনা হল, শ্রমিকের পরিবারের নারী ও শিশুদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারা। প্রথমতঃ, এর ফলে শ্রমের যোগান বেড়ে যায় এবং তার ফলে উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরি হ্রাস ঘটে। দ্বিতীয়তঃ, নারী ও শিশু শ্রমিকদের কম মজুরিতে কাজ করানো যায়। কারণ, সাধারণতই নারী ও শিশুদের উপর পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব থাকে না। তাই কম মজুরিতে কাজ করার ব্যাপারে তাদের ক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক বাধা নেই। তাই দেখা যায় অনেক সময় সক্ষম বয়স্ক শ্রমিককে বেকার রেখে নারী ও শিশুদের দিয়ে কম মজুরিতে কাজ করানো হয়। তৃতীয়তঃ, আগে শ্রমিক অর্থ নৈতিক কারণেই তার পরিবারের জীবন ধারণের উপায়ের মূল্যের চেয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে পারতো না। তাই মজুরি হ্রাসের বিরুদ্ধে বা প্রয়োজনীয় মজুরি বৃদ্ধির জন্য সে দৃঢ়ভাবে লড়াই করত, এখন আর সে অবস্থা নেই। তার প্রকৃত-মজুরি কমে গেলেও তার বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই করার বদলে, স্ত্রী ও পুত্র কন্যার আয় থেকে তা পূরণ করাকেই সে সহজ বলে মনে করে। সুতরাং এর ফলে স্বতন্ত্রভাবে কোন কোন শ্রমিক উপকৃত হলেও গোটা শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শ্রমিকের সংগ্রামী চেতনা কমে যাওয়ায় শ্রমিক আন্দোলন ও শ্রমিক ঐক্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(২) **ঘন্টা হিসাবে মজুরি ঃ** দৈনিক মজুরির হারের উপর ভিত্তি করেই ঘণ্টা হিসাবে মজুরির হার ঠিক হয়। যেমন যদি আট ঘণ্টা রোজের মজুরি চার টাকা হয়, তবে এক ঘণ্টার মজুরি হবে (৪ - ৮) টাকা = ৫০ পয়সা। পুঁজিপতি-শ্রেণী এই হারে মজুরি ঠিক করতে খুবই উৎসাহ বোধ করে। কারণ প্রথমতঃ যখন কাজ কম থাকে, -তখন শ্রমিককে গোটা রোজ কাজ না করিয়ে নিজের খুশিমতো এই হারে ছয় ঘণ্টা বা চার ঘণ্টা বা আরো কম সময় কাজ করাতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কাজ যখন বেশি থাকে, তখন প্রয়োজনমতো এই একই হারে শ্রমিককে দশ ঘণ্টা বা বারো ঘণ্টা বা আরো বেশি সময় কাজ করাতে পারে। ওভার টাইম কাজের জন্য বেশি হারে মজুরি দিতে হয় না। তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের ভরণ-পোষণের দায়িত্বের কথা চিন্তা করার ঝামেলা তাকে সইতে হয় না।

কিন্তু, শ্রমিকদের পক্ষে এই প্রথা খুবই ক্ষতিকর, আর অর্থনৈতিক নীতির বিচারেও এই প্রথা ত্রুটিপূর্ণ। কারণ, আমরা দেখেছি যে, উৎপাদন সংগঠনে এরূপ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন শ্রমিক তার শ্রমশক্তির বিনিময়ে সপরিবারে বেঁচে থাকার মতো ন্যূনতম দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে পারে অর্থাৎ বেঁচে থাকার মতো মজুরি পায়। তা না হলে শ্রমিকের যোগান একদিন বন্ধ হয়ে যাবে, উৎপাদন ব্যবস্থা খানখান হয়ে যাবে, পুঁজি তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে।

ঘণ্টা হিসাবে মজুরি দেওয়ার প্রথাটিকে একটু ভালভাবে বিচার করে দেখা যাক। যে শ্রমিক আট ঘণ্টা শ্রম করে চার টাকা মজুরি পায় তার মোট মজুরিকে শ্রম-সময় দিয়ে ভাগ করলে প্রতি ঘণ্টার মজুরি দাঁড়ায় ৫০ পয়সা। তার আট ঘণ্টা শ্রম-সময়কে ভাগ করে আমরা দেখেছি যে, তার মধ্যে চার ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রম-সময়, আর বাকি চার ঘণ্টা উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়। আট ঘণ্টায় সে মোট ৮ টাকা মূল্য সৃষ্টি করে। তার অর্ধেক টাকা মজুরি হিসাবে পায়। বাকি অর্ধেক টাকা পুঁজি-পতির পকেটে যায়। সুতরাং, সেই হিসাব মতো ১ ঘণ্টায় সৃষ্ট ১ টাকা মূল্যের অর্ধেক পয়সা সে মজুরি হিসাবে পাবে, এতে কোন ছল-চাতুরী নেই।

কিন্তু ঘটনাটি এত সহজ-সরল নয়। '৮ ঘণ্টা শ্রম সময়ের ৪ ঘণ্টা আবশ্যিক শ্রম-সময়'—কথাটি দু'টি অর্থে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ, আট ঘণ্টা কাজ না করলে পুঁজিপতি তাকে চার টাকা মজুরি দেবে না। দ্বিতীয়তঃ, ৪ টাকা মজুরি না পেলে সে পরিবারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবে না। সুতরাং, ৮ ঘণ্টা কাজ করতে পারা না পারা শ্রমিকের জীবন মরণের প্রশ্ন, কিন্তু পুঁজিপতির পক্ষে তা নয়।

মনে করি, মজুরির এই হারে পুঁজিপতি যদি শ্রমিককে ৬ ঘণ্টা বা ৪ ঘণ্টা কাজ দেয়, তবে শ্রমিক মজুরি হিসাবে যথাক্রমে ৩ টাকা বা ২ টাকা পাবে। ফলে সে তার পরিবারের ভরণ পোষণ করতে পারবে না। অথচ পুঁজিপতির মুনাফা আদায়ের হার সেই শতকরা ১০০ ভাগই থেকে যাবে। সুতরাং, দৃশ্যত শ্রমিকের মজুরির হার বজায় থাকলেও, কার্যতঃ শ্রমশক্তির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ব্যয়ের সমান মজুরি সে পাবে না। পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ওভার টাইম কাজ করার দোষক্রটি আমরা দেখেছি, এখানে পুরা সময় কাজ না পেলে শ্রমিকের কি হাল হয় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি।

এই প্রথায় শ্রমিকের ভরণপোষণের দায়িত্ব পুঁজিপতি গ্রহণ করে না, অথচ তার কাছ থেকে সমান হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করে। ফলে আবশ্যিক শ্রম-সময়ের গোটা ধারণাটাই ভেঙে পড়ে, পুঁজিপতি তার খেয়াল-খুশীমতো শ্রমিক নিয়োগের পুঁজিবাদী রীতিনীতিকেও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়।

উৎপাদনের যে সকল ক্ষেত্রে কাজের চাপ কখনও কম, কখনও বেশি থাকে, সেই সব ক্ষেত্রের পুঁজিপতিরা এই প্রথাকে খুবই পছন্দ করে। কারণ, মন্দার সময় শ্রমিককে কম সময় কাজ করিয়ে তারা নিজেদের মুনাফার হার ঠিক রাখে। আবার চাপের সময় একই হারে ওভার টাইম কাজ করিয়ে মুনাফার হার বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে মুনাফার মোট পরিমাণ বাড়িয়ে নেয়।

এই প্রথায় শ্রমিকদের নিজের স্বার্থ বজায় রাখতে হলে দু'টি ব্যবস্থা নিতে হবে,

প্রথমতঃ—মন্দার সময় একটি নিয়তম হারে দৈনিক মজুরি দিতে পুঁজিপতিকে বাধ্য করতে হবে। সেই নিয়তম হারটি এমন হবে যা দিয়ে শ্রমিক সপরিবারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, চাপা কাজের সময় প্রচলিত আট ঘণ্টার চেয়ে বেশি সময়ের, অর্থাৎ ওভার টাইম কাজের জন্য বাড়তি মজুরি আদায় করতে হবে।

(৩) ফুরন মজুরি ঃ ফুরন মজুরি প্রথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার শ্রেষ্ঠতম অস্ত্র। ফুরন মজুরি ঘণ্টা হিসাবে মজুরিরই উল্টোরূপ। মনে করি, একজন শ্রমিকের ১ ঘণ্টার মজুরি ৫০ পয়সা এবং সে এক ঘণ্টায় দু'টি পণ্য তৈরি করে। এ অবস্থায় ফুরন হিসাবে তার মজুরি হবে পণ্য পিছু ২৫ পয়সা। যেহেতু উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ, এই ব্যবস্থায় পুঁজিপতি প্রতিটি পণ্যের জন্য ২৫ পয়সা উদ্বৃত্ত-মূল্য পাবে।

ফুরন মজুরির হার ঠিক হয় বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। এই উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের হার এখানে ঠিকই থাকে, অথচ আবশ্যিক শ্রম-সময় ও উদ্বৃত্ত শ্রম-সময়ের ধারণার কোনো বালাই-ই এতে নেই। তাই শ্রমিক নিয়োগের কোনো প্রকার রীতিনীতির ধারই পুঁজিপতিকে ধারতে হয় না। এই ব্যবস্থার আরো একটি বিশেষত্ব এই যে, এখানে এক প্রকার মধ্যস্থতাকারী দালাল জুটে যেতে পারে। তারা মূল পুঁজিপতির কাছ থেকে কিছু পরিমাণ কাজ বুঝে নিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করে এবং তাদের দিয়ে কাজটি করিয়ে নিয়ে মাঝ থেকে বেশ কিছু রোজগার করে নেয়। ফলে শ্রমিকের মজুরি আরো কমে যায়। আর মজুরির একটি অংশ এই দালালদের পকেটে যায়।

পুঁজিপতিশ্রেণী নানা কারণে ফুরন মজুরি প্রথাকে অন্য দু'টি প্রথা থেকে বেশি পছন্দ করে। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট মানের নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্য তৈরি করার জন্য নির্দিষ্ট মজুরি ঠিক করা থাকে। এ অবস্থায় শ্রমিক যত বেশি পণ্য তৈরি করতে পারবে, তত বেশী আয় করতে পারবে। সুতরাং নিজের স্বার্থেই শ্রমিক তীব্রতম শ্রম প্রয়োগ করে বেশি পণ্য তৈরি করতে চেষ্টা করে। শ্রমিকের কাজের উপর খবরদারী করার জন্য কর্মচারী রাখার কোনো খরচ পুঁজিপতিকে বহন করতে হয় না। শ্রমিকের শ্রমের তীব্রতা ও আন্তরিকতার ফলে একই সময়ে পুঁজিপতি শ্রমিক পিছু আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত-মূল্য পায়। যেমন, মাস মাহিনার একজন শ্রমিক যেখানে তিন ঘণ্টায় ৬টি পণ্য তৈরি করে। সেখানে একজন ফুরন মজুরির শ্রমিক ৩ ঘণ্টায় ৭টি পণ্য তৈরি করবে। ফলে পুঁজিপতির তিন ঘণ্টার উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের পরিমাণ ১·৫০ টাকা থেকে বেড়ে ১·৭৫ টাকা হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়তঃ মাস-মাহিনার শ্রমিক ওভার টাইম কাজ করলে তাকে বাড়তি হারে

মজুরি দিতে হয়। কিন্তু, ফুরন মজুরির বেলায় তা হয় না। ফুরন মজুরির হার সব সময়ই এক থাকে, তা প্রচলিত ৮ ঘণ্টার শ্রম-সময়ের মধ্যেই হোক বা ওভার টাইমের সময়ের মধ্যেই হোক। শ্রমিক নিজের স্বার্থে নিজের ইচ্ছায় বেশী সময় কাজ করে। তাই ওভার টাইমের কাজের জন্য বাড়তি মজুরি দাবি করার অধিকার তার কোথায়? এমনিভাবে স্বাধীনতার নাম ক'রে শ্রমিককে চূড়ান্তভাবে শোষণ করা হয়।

তৃতীয়তঃ, এমন অনেক শিল্প আছে যেখানে সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে ঘরে বসে পণ্য তৈরি করা যায়, যেমন, 'রেডিমেড' পোশাক। যে কেউ একটি সেলাই কল নিয়ে নিজের ঘরে বসেই ফুরন মজুরিতে পোশাক সেলাই করতে পারে। ফলে মালিক পুঁজিপতি অল্পপরিমাণ স্থির পুঁজি নিয়ে অনেক বেশী পরিমাণ উৎপাদন চালাতে পারে। ফুরন মজুরির শ্রমিকরাই নিজ নিজ যন্ত্রে ঘরে বসে কাজ করবে। কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়েই পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত মূল্য আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে পারে।

চতুর্থতঃ, বাড়ির মহিলা ও ছেলেমেয়েরা ঘরে বসে অবসর সময়ে কাজ করতে পারে বলে এই আয়কে তারা বাড়তি আয় বলে মনে করে। সুতরাং, মজুরির হার কম হলেও তারা কাজ করতে রাজী হয়। নারী ও শিশুরা শ্রমিক হিসাবে কাজ করলে শ্রমিকশ্রেণীর যে ক্ষতি হয়, এখানেও তা ঘটে। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকরা একই কারখানায় সমবেত হয়ে কাজ করে না, বাড়িতে বসেই কাজ করে, তাই তারা সংঘবদ্ধ হতে পারে না। ফলে প্রতিটি শ্রমিকের ব্যক্তিগত অসন্তোষ থাকলেও তা সম্মিলিত দাবির রূপ পায় না।

পঞ্চমতঃ, অনেক সময় দেখা যায় যে, বাজারে অন্যান্য শ্রমিকদের মজুরির হার বেড়ে গেলেও ফুরন মজুরির হার অপরিবর্তিতই রয়েছে, কারণ, ফুরন মজুরির শ্রমিকদের পারস্পরিক প্রতিযোগিতাই তাদের সংঘবদ্ধ হতে বাধা দেয়, আবার নিজের শ্রমশক্তিকে চূড়ান্তভাবে দীর্ঘ সময় ধরে প্রয়োগ করে তারা মোট যে আয় করে তা সাধারণ শ্রমিকের আয়ের চেয়ে বেশি হয়। ফলে তাদের মনে একটি আত্মসন্তুষ্টির ভাব থাকে। তাই ফুরন প্রথায় পুঁজিপতিদের উপর মজুরি বৃদ্ধির চাপ কম হয়। এমনিভাবে অবশেষে তারা প্রচলিত শ্রম-সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সময় কাজ করেও আবশ্যিক শ্রম-সময়ের মজুরির কাছাকাছি মজুরি পায় মাত্র।

ষষ্ঠতঃ, ফুরন প্রথা শ্রমিকশ্রেণীর মনে একটি ভুয়া স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার মোহ সৃষ্টি করে, আর এই স্বাধীনতার মুখোশের আড়ালে থেকে পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রমিক-শ্রেণীর উপর চূড়ান্ত শোষণ চালায়। উপর থেকে দেখলে মনে হয়, এই ব্যবস্থায়

শ্রমিক সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইচ্ছে হলে সে কাজ করে, ইচ্ছে না হলে সে কাজ নাও করতে পারে। কিন্তু সত্যিই কি শ্রমিকের সেই স্বাধীনতা থাকে? শ্রমিকশ্রেণী সর্বহারা। উৎপাদনের কোনো প্রকার উপাদানই তার হাতে নেই। এমন কি সপরিবারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার মতো সংস্থানও তার নেই। এ অবস্থায় নিজের শ্রমশক্তিই তার একমাত্র সম্বল যা বিক্রয় করে সে তার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পারে। সুতরাং কাজ করবে, কি করবে না এই স্বাধীনতা শ্রমিকশ্রেণীর রয়েছে বলার অর্থ হল তাকে পরিহাস করা। অথচ এই মিথ্যা স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মোহে পড়ে শ্রমিকের মনে আত্মসন্তুষ্টির মনোভাব গড়ে উঠে, সে হয়ে পড়ে সংগ্রাম বিমুখ।

পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চয়

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা উৎপাদন পদ্ধতির দিক থেকে পুঁজিবাদী উৎপাদনের বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। দেখেছি—কি করে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি হয়, কি করে পুঁজিপতি তা আত্মসাৎ করে মুনাফা কামায়, কি করে পুঁজিপতি তার মুনাফার হার ও মোট পরিমাণ বাড়াতে পারে এবং শ্রেণীহিসাবে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের সম্বন্ধই বা কি। এইবার আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদনকে গতিশীল পুঁজিবাদী সমাজের গোটা উৎপাদন ব্যবস্থার পটভূমিতে আলোচনা করব।

আমরা জানি, মানুষের সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টার মূলে রয়েছে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদ। কারণ "—'ইতিহাস তৈরি করতে হলে মানুষকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। কিন্তু জীবন বলতে সব কিছুর আগে বোঝায়' খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাক ও অন্যান্য অনেক কিছু। তাই প্রথম ঐতিহাসিক কাজ হলো, এইসব অভাব মিটানোর উপায় উৎপাদন করা, বস্তুগত জীবনকেই উৎপন্ন করা।" (মার্কস—নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী)। আবার শারীর বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বিচার করলে খাদ্য. পানীয়, বাসস্থান ইত্যাদি জীবনে একবার মাত্র পেলেই চলে না. পেতে হয় বারবার। যেমন, দুপুরের খাওয়া শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাতের খাবার চাই; একটি ধুতি পাওয়ার পাঁচ-ছ' মাস পরেই আবার নতুন ধুতির প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই তো দুবেলা খাওয়ার জন্য বারেবারেই খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে হয়; কিছুদিন অন্তর অন্তর নতুন পোশাক চাই; কয়েক বছর পরে পরেই চাই নতুন বাসগৃহ ইত্যাদি। সুতরাং সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া মূলতঃই পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া। প্রতিটি যুগের সামাজিক উৎপাদন সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। সেই দিক দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদনও মূলতঃ পুনরুৎপাদন। তবে পুঁজিবাদী সমাজে এই পুনরুৎপাদন চলে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে।

পুনরুৎপাদন দু' প্রকারের হতে পারে। যেমন (১) যদি কোনো একটি সমাজ কোন একদিনে বা এক সপ্তাহে বা এক মাসে বা এক বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য-সামগ্রী তৈরি করে পরবর্তী দিনে বা সপ্তাহে বা মাসে বা বৎসরে যদি সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীই তৈরি করে, তবে এই পুনরুৎপাদনকে বলা হয় **'সরল পুনরুৎপাদন'**।

যে সমাজের জনসংখ্যা বাড়ে না বা কমে না, লোকজনের প্রয়োজন, পছন্দ ও অন্যান্য সব কিছু অপরিবর্তিত থাকে সরল পুনরুৎপাদনের সাহায্যে সেই সমাজ তার জীবনযাত্রার চলতি মান বজায় রাখতে পারে মাত্র। কোনরূপ উন্নতি করতে পারে না।

(২) আবার কোনো সমাজ কোনো এক সময়ে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করে, তার পরবর্তী সময়ে যদি তার চেয়ে বেশী পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করে তবে সেই পুনরুৎপাদনকে বলা হয় **'বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন'**। একটি প্রগতিশীল, প্রাণবন্ত সমাজের অগ্রগতির মূল ভিত্তিই হলো 'বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন'।

আমরা জানি, পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল প্রেরণা হলো মুনাফা। আর মুনাফার উৎস হলো উদ্বৃত্ত-মূল্য। আবার পুঁজিপতিশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে মুনাফার প্রতি তাদের লোভের শেষ নেই। তারা চায় ক্রমাগত মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে। সুতরাং, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন মূলতঃ বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন হবে। কারণ, সরল পুনরুৎপাদনের প্রতি স্তরেই উৎপাদনের পরিমাণ এক থাকে, ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের পরিমাণও একই থেকে যায়, যদি না উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হারের কোনো পরিবর্তন হয়। এ অবস্থা কেবলমাত্র এক স্তর থেকে পরবর্তী স্তরে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে, অর্থাৎ বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন করে, উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের পরিমাণ বাড়ানো যায়—অর্থাৎ মুনাফার পরিমাণ বাড়ানো যায়।

উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াতে হলে, উৎপাদনে নিযুক্ত পুঁজির পরিমাণ অবশ্যই বাড়াতে হয়। অর্থাৎ চলতি পুঁজির সঙ্গে আরো নতুন পুঁজি যোগ করতে হয়। মনে করি, পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে যত পুঁজি ছিল তার সবটাই উৎপাদনে নিযুক্ত রয়েছে। এ অবস্থায় পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে হলে আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটুকু বা তার একটি অংশ নতুন পুজি হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত করতে হবে, অর্থাৎ পুঁজিপতিকে তার আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের কিছু অংশ সঞ্চয় করে পুজির সঞ্চয় বাড়াতে হবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার আগে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা প্রয়োজন।

সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন

"কোন সমাজই তার উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশকে উৎপাদনের উপাদান, অর্থাৎ নতুন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনী উপাদান হিসাবে পরিবর্তিত না করে

উৎপাদনের কাজ, অন্যভাবে বললে পুনরুৎপাদনের কাজ চালিয়ে যেতে পারে না।”
(মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৬) অর্থাৎ পুনরুৎপাদনের ধারা বজায় রাখতে হলে চলিত উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশকে পর্যায়ক্রমে পরবর্তী সময়ে উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

মানুষ যখন খাদ্য সংগ্রহকারী ছিল, তখন এ সমস্যা ছিল না। তারা ফলমূল সংগ্রহ করে সঙ্গে সঙ্গেই তা ভোগ করে ফেলতো। কিন্তু, খাদ্য সংগ্রহকারীর স্তর পেরিয়ে তারা যখন খাদ্য উৎপাদনকারীর স্তরে পৌছল, তখন অবস্থা পালটে গেল! শস্য উৎপাদন করতে হলে প্রতি বৎসর বীজশস্য চাই, দু-চার বৎসর অন্তর চাষের জন্য নতুন যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হয়, নয়তো পুরোনো যন্ত্রপাতি সারাতে হয়। জমিতে বীজ পুঁতলে তখন তখনই ত' থেকে শস্য পাওয়া যায় না, তার জন্য তিন-চার মাস অপেক্ষা করতে হয়। আবার শস্য গাছকে বিভিন্ন সময়ে সেবা যত্ন করতে হয়। সেই সময়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য চাষীকে আগে থেকেই তার সংস্থান করে রাখতে হয়। এ সবই আসে আগের বারের ফসলের একটি অংশ থেকে। সুতরাং ফসলের যে অংশটি উৎপাদনের এইসব কাজের জন্য ব্যবহার হয় তা মূলতঃই উৎপাদনের উপাদান। যদি এই ব্যবস্থা বজায় রাখা না হয় তবে পুনরুৎপাদন বজায় থাকবে না। সরল পুনরুৎপাদন বজায় রাখতে হলে, অর্থাৎ এই বৎসর যে পরিমাণ শস্য পাওয়া গেছে, সেই পরিমাণ শস্য যদি পরের বৎসরও পেতে হয়, তবে এই বৎসর উৎপাদনের উপাদান হিসাবে যে পরিমাণ শস্য ব্যবহার করা হয়েছে, পরের বৎসরও সেই পরিমাণ শস্য উৎপাদনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপানদের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। মনে করি, দশ হাজার টাকা পুঁজি খাটিয়ে একজন পুঁজিপতি এক বৎসরে দু' হাজার টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্য পেল। পুঁজিপতির ভরণপোষণের জন্য প্রতি বৎসর যদি দু' হাজার টাকা প্রয়োজন হয়, তবে প্রতি বৎসর পুঁজিপতিকে দশ হাজার টাকা পুঁজিই খাটাতে হবে। তবেই সরল পুনরুৎপাদন বজায় থাকবে। এর অর্থ হলো প্রতি বৎসর একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে হবে।

অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থায়ও সরল পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতো। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কিন্তু সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে হাজির হয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনা অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, এক সময়ে কিছু লোক উৎপাদনের উপাদানগুলির মালিক হয়ে বসেছিল, আর সেই সঙ্গে কিছু লোক উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছিল।

যে নিষ্ঠুর নৃশংস বঞ্চনা ও আত্মসাতের মধ্য দিয়ে পুঁজির আদি-সঞ্চয় হয়েছিল, তার ইতিহাসও আমরা দেখেছি। আরো দেখেছি যে, সেই আদি সঞ্চয় ঘটেছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে। এইবার আমরা দেখতে পাব পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে কি করে নতুন ধারায় বঞ্চনা ও আত্মসাতের কাজটি চলছে।

পুঁজিবাদী উৎপাদনের প্রধান শর্ত হলো— মজুরি দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করা হয় চুক্তিমতো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। যেমন চুক্তি হলো,—একদিন আট ঘণ্টা শ্রম করার জন্য একজন শ্রমিককে মজুরি দেওয়া হবে চার টাকা। আট ঘণ্টা শ্রম করার পর সেই শ্রমিককে আর শ্রম করতে বাধ্য করা যায় না। পরের দিন ঐ শ্রমিককে দিয়ে আরো আট বা দশ ঘণ্টা কাজ করাতে হলে আবার নতুন করে মজুরির চুক্তি করতে হবে। এমন হতে পারে যে, ঐ শ্রমিক পরের দিনও চার টাকা মজুরিতেই আট ঘণ্টা কাজ করলো। কিন্তু তা হলেও চুক্তি দু'টি আলাদা চুক্তি। শ্রমিক তো পরের দিন ঐ পুঁজিপতির কাজ নাও করতে পারে, বা বেশি মজুরি দাবি করতে পারে বা কম মজুরি নিতে রাজি হতে পারে। সাপ্তাহিক, মাসিক বা বাৎসরিক মজুরির চুক্তিও এই একই চরিত্রের চুক্তি। একই শ্রমিক যখন বছরের পর বছর একই কারখানার মালিক বা একই খামারের মালিকের নিকট কাজ করে, তখন তা একই চুক্তি বার বার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং পুনরুৎপাদন বজায় রাখতে হলে পুঁজিপতিকে বার বার শ্রমশক্তি ক্রয় করতেই হবে।

বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে, পুঁজিপতি তার মোট পুঁজির একটি অংশ দিয়ে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করে এবং পুঁজির অপর অংশ দিয়ে শ্রমিকের মজুরি দেয়। সুতরাং মজুরি হিসাবে সে শ্রমিককে যা দেয়, তা তার কষ্ট করে সঞ্চিত পুঁজিরই একটি অংশ। কোনো একদিনের উৎপাদনকে আলাদা ভাবে দেখলে এ কথা সত্য বলে মনে হয়। কিন্তু, পুঁজিবাদী উৎপাদনকে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে দেখলে আমরা অন্য জিনিস দেখতে পাবো।

প্রচলিত রীতি এই যে, শ্রমিক তার মজুরি পায় চুক্তিমতো শ্রম-সময় কাজ করার পর। আর এই চুক্তিমতো শ্রম-সময় কাজ করে শ্রমিক কি উৎপন্ন করে? সে উৎপন্ন করে নতুন পণ্য-মূল্য। আবার এই নতুন পণ্য-মূল্য = মজুরির সমপরিমাণ মূল্য + উদ্বৃত্ত-মূল্য। তৈরী হওয়ার পর এই নতুন পণ্য-মূল্যের মালিক কে হয়? মালিক হয় শ্রমিককে নিয়োগ করে যে পুঁজিপতি। নতুন পণ্য-মূল্যের দু'টি অংশের একটি হল মজুরির সমপরিমাণ মূল্য—যা খেয়ে শ্রমিক বেঁচে থাকে। অপরটি উদ্বৃত্ত-মূল্য—যা আত্মসাৎ করে নিজে শ্রম না করেও পুঁজিপতি খেয়ে বেঁচে থাকে।

এমনিভাবে শ্রমিক শুধুই উদ্বৃত্ত-মূল্য অর্থাৎ যা খেয়ে পুঁজিপতি বেঁচে থাকবে, তাই সৃষ্টি করে না; মজুরি পাওয়ার আগেই, যা দিয়ে পুঁজিপতি তাকে মজুরি দেয়, তাও সৃষ্টি করে পুঁজিপতির হাতে তুলে দেয়। একদিনের উৎপাদনের কথা বিচার না করে যদি আমরা দিনের পর দিন যে পুনরুৎপাদন হয়, তার হিসাবে বিচার করি তবে জিনিসটি স্পষ্ট হয়।

কিন্তু এই সহজ-সরল সত্যটি কি করে লোকের চোখ এড়িয়ে যায়? এর কারণ এই যে, "আদান-প্রদানের ঘটনাটিকে আড়াল করে রাখা হয় দ্রব্যের পণ্যরূপ দ্বারা।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬৮)

শ্রমিকের মজুরি দেওয়া হয় মুদ্রায়। কিন্তু, এই মুদ্রা কি? এই মুদ্রা শ্রমিকের উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীরই পরিবর্তিত রূপ মাত্র। শ্রমিক যখন কারখানায় কাজ করছে বা খামারে কাজ করছে তখন তারই তৈরী গত সপ্তাহের দ্রব্যসামগ্রীরই একটি অংশ মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে তার কাছে মজুরি রূপে হাজির হয়। যদি একজন পুঁজিপতি ও একজন শ্রমিকের বদলে আমরা পুঁজিপতিশ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীকে ধরে বিষয়টি আলোচনা করি তবে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায়।

আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমস্ত পণ্যের মালিক হলো পুঁজিপতিশ্রেণী। এমন কি, শ্রমিক ও তার পরিবার যে-সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখে, তাও তাকে পুঁজিপতিদের নিকট থেকেই কিনতে হয়। অথচ পরিতাপের বিষয় এই যে, এ সমস্তই কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী নিজের শ্রমে উৎপন্ন করে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে।

পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরি দেয় টাকায়। সেই টাকা দিয়ে শ্রমিক-শ্রেণী কি করে! সে সেই টাকা নিয়ে ঘুরে পুঁজিপতিশ্রেণীর নিকটই যায় তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে। এমনিভাবে নিজের হাতে তৈরী জীবনধারণের উপায় শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরি হিসাবে হাত পেতে গ্রহণ করতে হয় পুঁজিপতিশ্রেণীর নিকট থেকে। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনে শ্রমিকশ্রেণী বার বার পণ্যে যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করে, তাতে থাকে মজুরি-মূল্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্য। অথচ পুঁজিপতিশ্রেণী গোটা-গুটি সমস্ত পণ্যই দখল করে নেয়। পরে পুঁজিপতিশ্রেণী সেই পণ্যভাণ্ডার থেকে মজুরি দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখছে বলে বাহাদুরি করে।

এ যেন মাছের তেলে মাছ ভাজা। এক প্রকার তৈলাক্ত মাছ আছে, যা ভাজতে হলে কড়াতে অল্প একটু তেল নিয়ে শুরু করলেই হয়। মাছ ভাজা হয়ে যাওয়ার পর দেখা যায়, মাছ ভাজাও হলো, আবার যতটুকু তেল দিয়ে ভাজা শুরু হয়েছিল—তার চেয়ে বেশি তেল ফিরে পাওয়া গেল। তেমনি পুঁজিবাদী উৎপাদন

শুরু করার মুখে লুটপাট করেই হোক, ডাকাতি করেই হোক বা হত্যা করেই হোক, পুঁজির কিছু আদি-সঞ্চয় দরকার হলেও পুনরুৎপাদনের ফলে পুঁজিপতিশ্রেণী শ্রম না করেও বিলাসবহুল জীবনযাপন করার উপায় তো পায়ই, উপরন্তু শ্রমিকের উৎপন্ন পণ্য মূল্য দিয়েই তাকে মজুরি দিতে পারে। বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদনের সময় আমরা আরো দেখতে পাবো যে, এইভাবে শ্রমিকের উৎপণ্য উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করে পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের মোট পুঁজিও বাড়িয়ে নিতে পারে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। মনে করি, একজন কৃষক এক জমিদারের নিকট থেকে কিছু জমি পেল। তাদের মধ্যে এই চুক্তি হলো যে, কৃষক তার নিজের জমিতে সপ্তাহে তিনদিন কাজ করবে৷ এবং সপ্তাহের বাকি চারদিন সে বেগার খাটবে জমিদারের জমিতে। সপ্তাহে তিনদিন নিজের জমিতে কাজ করে দিনের পর দিন কৃষক তার ও তার পরিবারের জীবন ধারণের উপায় পুনরুৎপাদন করে। আর নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সপ্তাহের বাকি চারদিন শ্রম করে জমিদারকে বসে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। এ অবস্থায় সে তার ও তার পরিবারের ভরণ-পোষণের উপায় কখনই অন্যের হাত থেকে মজুরি হিসাবে গ্রহণ করে না।

কিন্তু, একদিন সকালে উঠে এই কৃষক দেখতে পেল, তার ভাগ্য ফিরে গেছে। জমিদার তার সমস্ত জমি, লাঙল বলদ, এমন কি খাওয়ার জন্য মজুত ধানটুকু পর্যন্ত দখল করে নিয়েছে। এ অবস্থায় কি করে কৃষক তার ও তার পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখবে? একমাত্র নিজের শ্রমশক্তি জমিদারের নিকট বিক্রি করেই সে তা করতে পারে। কৃষক কিন্তু এখনও সপ্তাহে সাতদিনই কাজ করবে, তিনদিন নিজের ও পরিবারের ভরণপোষণের উপায় উৎপাদন করার জন্য, বাকি চারদিন মালিক জমিদারের জন্য। আগে সে উৎপাদনের জন্য নিজের যে-সকল উপাদান জমি, লাঙল, বলদ ইত্যাদি ব্যবহার করতো, এখনও সেই সকল উপাদানই ব্যবহার করবে। কিন্তু এখন সে আর এইসব উৎপাদনের মালিক নয়। উৎপন্ন শস্যাদির একটি অংশ এখনও আগের মতোই পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। তবে পরিবর্তন যা হবে তা হলো—কৃষক এখন পরিণত হবে মজুরি-শ্রমিকে। এখন কৃষক তার ও তার পরিবারের ভরণপোষণের উপায় পাবে জমিদারের কাছ থেকে মজুরি হিসাবে। যে মুহূর্তে বেগার-শ্রমিক মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হয়, সেই মুহূর্ত থেকে যে ভরণ-পোষণের উপায় আগে কৃষক নিজের জন্য নিজেই উৎপাদন করতো, এখন তা রূপান্তরিত হবে মালিক জমিদারের নিকট থেকে পাওয়া মজুরিতে। বুর্জোয়া পণ্ডিতরা কিন্তু এই সত্যটি উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অক্ষম বা সবকিছু বুঝেও তারা সত্যটিকে বাক্‌চাতুরীর আড়ালে ঢেকে রাখে।

পুঁজিবাদী সরল পুনরুৎপাদনের ফলে মোট পুঁজির চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। মনে করি, একজন পুঁজিপতি দশ হাজার টাকার পুঁজি নিয়ে উৎপাদন শুরু করে। তার মোট পুঁজির আট হাজার টাকা দিয়ে সে কারখানা বাড়ি, যন্ত্র-পাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করে। আর এক বছরে মজুরি হিসাবে দেয় দু হাজার টাকা। যদি এই পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার শতকরা একশো টাকা হয়, তবে সে বছরে দু হাজার টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করবে। এই হারে যদি সরল পুনরুৎপাদন চলতে থাকে, তবে পাঁচ বৎসরে সে মোট ২,০০০×৫= ১০,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায় করবে। অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে তার মোট পুঁজির সমান মূল্য ফিরে পাবে। পুঁজিপতি যদি প্রতি বৎসর প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্য ভোগ করে ফেলে, তবে পাঁচ বৎসরে সে তার মোট পুঁজি খেয়ে ফেলবে। অথচ, কার্যতঃ দেখা যাবে যে, শুরুতে সে যে পরিমাণ বাড়ি-ঘর, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিয়ে উৎপাদন শুরু করেছিল, এখনও সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি বাদ দিয়ে তার সবই বজায় রয়ে গেছে। আমরা দেখলাম, পাঁচ বৎসরে সে তার মোট পুঁজির সমান মূল্য খেয়ে ফেলেছে, অথচ তার বস্তুগত পুঁজি প্রায় অটুট রয়েছে, কি করে তা সম্ভব হলো? এই ঘটনাটি সম্ভব হলো এইভাবে যে, "কোনো প্রতিদান না দিয়ে সে উদ্বৃত্ত-মূল্যের মোট যে পরিমাণ আত্মসাৎ করেছে, তারই প্রতিরূপ হলো তার বর্তমান পুঁজির মূল্য। তার পূর্বতন পুঁজির মূল্যের একটি অণুও এখন আর বর্তমান নেই।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের ফলে কয়েক বছর পর পুঁজিপতির চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। "কয়েক বৎসর পর তার অধিকারে যে পুঁজি-মূল্য থাকে তা হলো, ঐ কয় বৎসরে সে সর্ব-মোট যে উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাৎ করেছে, তার সমান এবং সে যা ভোগ করছে, তার মোট মূল্য হয় তার আসল পুঁজির সমান।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০-৭১)।

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের মতে, সদাশয় পুঁজিপতি শ্রমিককে তো খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখেই, উপরন্তু শ্রমিকের পরিবারকেও দয়া করে বাঁচিয়ে রাখে। কিন্তু পুঁজিপতি পুনরুৎপাদনের স্বার্থে, অর্থাৎ নিজের স্বার্থেই শ্রমিক ও তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখে, দয়া-দাক্ষিণ্যের তাগিদে নয়। বস্তুতঃ পুঁজিপতি "এক ঢিলে দু' পাখি মারে। শ্রমিকের কাছ থেকে সে যা পায় শুধু তা থেকেই নয়, সে শ্রমিককে যা দেয়, তা থেকেও মুনাফা কামায়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭২) শ্রমিকের কাছ থেকে সে আদায় করে উদ্বৃত্ত-মূল্য, আর শ্রমিককে সে যে মজুরি দেয়, তা থেকে পায় নিত্য নতুন শ্রমশক্তির যোগান। শ্রমিক মজুরির পয়সায়

খাদ্য-আশ্রয় সংগ্রহ করে তা দিয়ে তার ক্ষয়প্রাপ্ত মাংসপেশী, হাড়, মস্তিষ্ক ইত্যাদি পুনরুৎপাদন করে, অর্থাৎ শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করে ; তার পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখে মালিকের জন্য নতুন শ্রমিকের যোগান নিশ্চিত করে।

"বস্তুতঃ শ্রমিকের নিজের দিক থেকে বিচার করলে তার ব্যক্তিগত ভোগ তার কাছে অনুৎপাদক, কারণ তা একটি অভাবগ্রস্থ জীব ছাড়া অন্য কিছুই পুনরুৎপাদন করে না। পুঁজিপতি ও রাষ্ট্রের কাছেই মাত্র তা উৎপাদক ভোগ ; তা তাদের জন্য সম্পদসৃষ্টিকারী শক্তি উৎপাদন করে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩) সুতরাং পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিকের অস্তিত্ব তার নিজের কোন স্বার্থসিদ্ধ করে না। সেখানে তার কোন স্বতন্ত্র সামাজিক অস্তিত্ব নেই। শ্রমিক যখন সাক্ষাৎভাবে উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত থাকে তখন সে "একটি সাধারণ শ্রমযন্ত্রের মতোই পুঁজির লেজুড় মাত্র।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩) নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে অনবরত তাকে শ্রমবাজারে হাজির হতে হয়, খুঁজতে হয় এমন পুঁজি যা তাকে নিযুক্ত করবে। তবে সে তার ও তার পরিবারের অস্তিত্ব বজায় রাখার মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করতে পারে, আর সেই সঙ্গে তাকে তৈরী করে দিতে হয় তার মালিকের বিলাস ব্যসনের উপায়। "রোমান ক্রীতদাসরা শেকল দিয়ে বাঁধা থাকতো, মজুরি শ্রমিক তার মালিকের কাছে বাঁধা থাকে অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে। তাদের স্বাধীনতার ভেক বজায় রাখা হয় কেবলমাত্র অনবরত নিয়োগকারীর পরিবর্তন করে এবং চুক্তির ভূয়া আইনের মাধ্যমে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৪)

ইতিহাস বলে দক্ষিণ আমেরিকার দাস মালিকরা তাদের ক্রীতদাসদের কম পুষ্টিকর খাদ্যের বদলে বেশি পুষ্টিকর খাদ্য খেতে বাধ্য করত। আধুনিক পুঁজিপতি-শ্রেণীকে কেউ যদি এমনি বোকা ও নিষ্ঠুর ভাবেন তো খুবই অন্যায় করবেন। কারণ, "সে সব সময়ই সেই সব নিষ্ঠুর দক্ষিণ আমেরিকানদের অনুকরণ করা থেকে দূরে থাকে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭২-৭৩) শ্রমশক্তি পুনরুৎ-পাদন করতে এবং নতুন শ্রমিক যোগান দিতে গেলে ন্যূনতম যতটুকু খাদ্য দরকার তার চেয়ে বেশি খাদ্য শ্রমিক যেন খেয়ে না ফেলে, সেদিকে পুঁজিপতিশ্রেণী সব সময়ই লক্ষ্য রাখে। কারণ পুঁজিপতি ও তাদের আশ্রিত বশংবদ তাত্ত্বিকদের মতে, "শ্রমিকের ব্যক্তিগত ভোগের সেই অংশটুকুই উৎপাদক ভোগ যেটুকু শ্রমিকশ্রেণীর যোগানের নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে একান্ত প্রয়োজন।...এই অংশের বাইরে শ্রমিক নিজের সাধ-আহ্লাদ পূরণের জন্য যা কিছু ভোগ করে তাই হল অনুৎপাদক ভোগ।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭৩)। সুতরাং পুঁজিপতিশ্রেণী

শুধু শ্রমিক দরদী নয়, তারা সমাজেরও প্রকৃত বন্ধু ; আর তাইতো তারা নিজের দায়িত্বে শ্রমিকদের সাধ-আহ্লাদ থেকে বঞ্চিত করে বৃহত্তর সমাজকে অনুৎপাদক ভোগের অপচয়ের হাত থেকে রক্ষা করে। সত্যি, এ না হলে আর বুর্জোয়া যুক্তি !

শ্রমিকের ব্যক্তিগত ভোগ তার জীবন-মরণ সমস্যার সঙ্গে জড়িত, কিন্তু পুঁজিপতিদের কাছে এ একটা খুবই মামুলি ব্যাপার। বয়লারে উত্তাপ বজায় রাখতে হলে তাতে তেল দিতে হয়, গাড়ির বলদটিকে কর্মক্ষম রাখতে হলে তাকে খোল-খড় খেতে দিতে হয়, তেমনি শ্রমিককে দিতে হয় তার ও তার পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় জীবন-ধারণের উপায়। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে উৎপাদনে নিযুক্ত আরো দশটা উপাদানের সঙ্গে শ্রমিকের কোন প্রভেদ নেই।

আমরা দেখেছি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনায় মূল শর্তের অন্যতম হলো—একদিকে থাকবে মুদ্রা বা মূল্যের মালিক, অন্যদিকে থাকবে মূল্য সৃষ্টিকারী শক্তি, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মালিক। একদিকে থাকবে উৎপাদনের উপাদান ও জীবন-ধারণের উপায়ের মালিক, অন্যদিকে সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত সর্বহারা শ্রমিক, অর্থাৎ একমাত্র শ্রমশক্তির মালিক। আর শ্রম বাজারে তারা পরস্পরের মুখোমুখি হবে ক্রেতা ও বিক্রেতা হিসাবে। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে কিন্তু এই শর্ত ক্রমেই বিস্তৃততর হয়ে গোটা সমাজকে ঘিরে ফেলে। "একদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়া অনবরত বস্তুগত সম্পদকে পুঁজিতে, অর্থাৎ আরো অধিক সম্পদ সৃষ্টির উপায়ে এবং পুঁজিপতিদের ভোগ বিলাসের উপায়ে পরিণত করে ; অন্যদিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ঢোকার মুখে শ্রমিক যে অবস্থায় ছিল, ছাড়ার সময়ও তাই থাকে, অর্থাৎ সম্পদের উৎস হিসাবেই থাকে অথচ সেই সম্পদ নিজের করে নেওয়ার সমস্ত উপায় থেকে সে বঞ্চিত।" (মার্কস ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৭০) সুতরাং, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন কেবলমাত্র অনবরত পণ্য ও উদ্বৃত্ত-মূল্যই সৃষ্টি করে না, তা ক্রমবর্ধমান হারে মজুরি-শ্রমিকও পুনরুৎপাদন করে। এই ব্যবস্থা ক্রমাগতই সাক্ষাৎ উৎপাদক-দের সংখ্যাগুরু অংশকে মজুরি শ্রমিকে পরিণত করে।

"পুঁজিবাদী উৎপাদন যেখানে একবার শেকড় গেড়ে বসে সেখানে অন্য সমস্ত প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থাকে—যেমন, নিজস্ব উদ্যোগে নিযুক্ত উৎপাদনকারী বা কেবলমাত্র উদ্বৃত্ত উৎপন্ন দ্রব্য পণ্য হিসাবে বিক্রয়কারী ধ্বংস করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রথমে পণ্য উৎপাদনকে সাধারণ নিয়মে পরিণত করে এবং পরে ধাপে ধাপে সমস্ত পণ্য উৎপাদনকে পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনে পরিণত করে।" (মার্কস. ক্যাপিটাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬) এমনি করে "পুঁজিবাদী উৎপাদন একবার প্রতিষ্ঠিত

হওয়ার পর, আরো বিকাশের মুখে এই বিচ্ছেদকে শুধু পুনরুৎপাদনই করে না, বরং এর পরিধি দূর থেকে আরো দূরে বিস্তৃত করে, যতদিন পর্যন্ত না এই ব্যবস্থাই প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা হয়ে দাড়ায়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩)

আমরা দেখেছি যে, পুঁজিপতি পণ্য হিসাবে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে মজুরি দিয়ে ক্রয় করে। সেই পণ্য পুঁজিপতি ভোগ করে শ্রমিকের শ্রমশক্তিকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত করে। সুতরাং পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমশক্তিরূপে পণ্য ভোগ করার প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া এক ও অভিন্ন। আবার এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শুধু অনবরত পণ্যই উৎপাদন করে না, পুঁজিরও পুনরুৎপাদন করে। আর এই পুঁজি হলো সেই শক্তি, যা তার উৎপাদনকারীকেই শোষণ করে, উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনকারী উভয়কে শাসন করে। সুতরাং পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে শ্রমিক অনবরত বস্তু ও বাস্তব সম্পদ উৎপন্ন করে, কিন্তু তা করে পুঁজিরূপে, অর্থাৎ তারই একটি শত্রু-শক্তিরূপে যা তাকেই শাসন ও শোষণ করে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৭১)

বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন ও পুঁজির সঞ্চয়

সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের আলোচনায় আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুজিপতি প্রতি স্তরেই আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্য নিজের ভোগের জন্য ব্যয় করে ফেলে। সুতরাং প্রতি স্তরেই উৎপাদন-পুজির পরিমাণ এক থাকে। আর এ অবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণও একই থেকে যাবে।

কিন্তু, এই রীতি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ মুনাফার প্রতি পুঁজিপতিশ্রেণীর লোভের শেষ নেই। পুঁজিপতি সব সময়ই চায় মুনাফার পরিমাণ বাড়িয়ে যেতে। আর মুনাফা যত বাড়তে থাকে পুঁজিপতির লোভও ততই বাড়তে থাকে। মুনাফা বাড়াতে হলে চাই উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো। আবার উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার অপরিবর্তিত থাকলে উৎপাদন পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়েই উদ্বৃত্ত মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব। তাই পুঁজিপতি সব সময়ই চেষ্টা করে কি করে পুঁজির পরিমাণ বাড়ানো যায়।

কিন্তু, একমাত্র মুনাফার লোভেই যে পুঁজিপতিকে তার উৎপাদন পুঁজি বাড়াতে উৎসাহিত করে, তাই নয়। উৎপাদন পুঁজি বাড়ানোর প্রশ্নটি পুঁজিপতি হিসাবে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রশ্নের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাজারে প্রতিটি উৎপাদনকারী চায় অন্য উৎপাদনকারীকে হটিয়ে দিয়ে নিজেই বেশির ভাগ বাজার

দখল করতে। সে যদি অন্য উৎপাদনকারীর চেয়ে কম দামে পণ্য দিতে পারে, তবেই তা সম্ভব হয়। তাই সে উৎপাদনের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে বা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার উৎপাদন ব্যয় কমাতে চেষ্টা করে। আর এর জন্য প্রয়োজন হয় আরো অধিক পরিমাণ পুঁজি। এ অবস্থায় কোন পুঁজিপতি যদি প্রতিযোগিতার মুখে নির্মূল হয়ে যেতে না চায়, তবে তাকে অবশ্যই উৎপাদনের পদ্ধতির উন্নতি করতে হবে, নতুন নতুন উন্নত যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে, অর্থাৎ তার পুঁজির সঞ্চয় বাড়াতে হবে।

এইবার প্রশ্ন হলো, পুঁজিপতি কি করে তার পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পারে? পুঁজির আদি সঞ্চয়ের যুগে পুঁজির জন্য সে লুটতরাজ, জোর-জুলুম, হত্যা ইত্যাদির সাহায্য নিয়েছে। কিন্তু, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের দৌলতে সে একটি সহজ উপায়ের সন্ধান পেয়েছে। অবশ্য লুণ্ঠন, জোর-জুলুম যে একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে তা নয়। তবে এখন সে সর্বহারা মজুরি-শ্রমিকের শ্রমে উৎপন্ন মূল্যের একটি অংশ উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে আত্মসাৎ করছে। সেই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে সে যদি নতুন উৎপাদন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করতে পারে, তবেই তার পুঁজি ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি দেখা যাক।

মনে করি, একজন পুঁজিপতি দশ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে উৎপাদন শুরু করলো; তার স্থির-পুঁজি হলো মোট পুঁজির $\frac{৪}{৫}$ অংশ অর্থাৎ আট হাজার টাকা এবং পরিবর্তনশীল-পুঁজি হলো মোট পুঁজির $\frac{১}{৫}$ অংশ, অর্থাৎ দু'হাজার টাকা। আরো মনে করি যে, উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার হলো শতকরা একশো ভাগ। সুতরাং প্রথমবার উৎপাদনের পর সে উদ্বৃত্ত মূল্য পাবে দু' হাজার টাকা। মনে করি, দ্বিতীয়বারের উৎপাদনে সে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করলো। সুতরাং এখন তার মোট পুঁজি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে। ১০,০০০+২,০০০=১২,০০০ টাকা। পূর্বের ভাগমতো নতুন ২,০০০ টাকা পুঁজির স্থির-পুঁজি অংশ হবে ১,৬০০ টাকা এবং পরিবর্তনশীল পুঁজির অংশ ৪০০ টাকা। এইবার উৎপাদনের পর সে পূর্বের দশ হাজার টাকার পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য পাবে দু'হাজার টাকা, আর নতুন পুঁজি থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্য পাবে চারশো টাকা, এর ফলে (১) তার মোট পুঁজি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে বারো হাজার টাকা, (২) উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে দু'হাজার চারশো টাকা।

তৃতীয়বারে তার মোট পুঁজি হবে (১০,০০০+২,০০০+২,৪০০) টাকা আর উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় হবে (২,০০০+৪০০+৪৮০) টাকা। ক্রমাগত এইভাবে পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়ে যাওয়ার নামই 'বর্ধিত হারে পুঁজি-

বাদী পুনরুৎপাদন'। আর এমনি ভাবেই পুঁজিপতি তার 'পুঁজির সঞ্চয়' বাড়িয়ে যেতে পারে।

সরল পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে, পুঁজিপতি আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটাই ভোগ করে ফেলে। আবার বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের উপরিউক্ত উদাহরণে আমরা ধরে নিয়েছি যে, আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটাই পুঁজিপতি নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করছে। কিন্তু, এর কোনোটাই বাস্তব ঘটনা নয়। বাস্তব ঘটনা হলো, উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ পুঁজিপতি নিজের ভরণপোষণের জন্য ব্যয় করে এবং অপর অংশটি নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্যের মালিক হলো পুঁজিপতি নিজে। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যের কতটুকু সে তখনই খেয়ে ফেলবে, আর কতটুকু নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করবে অর্থাৎ সঞ্চয় করবে—তা পুঁজিপতিই ঠিক করে। সে যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের বেশির ভাগ অংশই খেয়ে ফেলে, তবে স্বভাবতই সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হবে।

এই জন্যই বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদরা পুঁজির সঞ্চয় সম্বন্ধে ভোগ-নিবৃত্তি-তত্ত্ব প্রচার করে। যার মূল বক্তব্য হল,—বুদ্ধিমান ও সংযমী পুঁজিপতিশ্রেণী সামাজিক উৎপাদনের নিজের অংশটি সবটুকু ভোগ বিলাসে ব্যয় করে ফেলে না। তাদের এই কৃচ্ছ্রসাধনের ফলেই পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। 'ভোগ থেকে নিবৃত্ত হও, সঞ্চয় বৃদ্ধি করো—তবেই তোমাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, সমাজের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে, শ্রমিকরা বেশি সংখ্যায় কাজ পাবে, গোটা সমাজ সমৃদ্ধিতে উপচে উঠবে।' পুঁজিবাদী উৎপাদনের সূচনার যুগে এই নীতিবাক্যের কিছুটা মূল্য থাকলেও, আজ যখন পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যাপক ও উন্নততর স্তরে এসে গেছে এবং পুঁজিপতি-শ্রেণীর সামনে মুনাফার অসংখ্য রাস্তা খুলে গেছে, তখন এর কোনো মূল্যই নেই। "উপরন্তু কৃপণ যেমন নিজের শ্রম বাড়ানো ও ভোগ কমানোর অনুপাতে ধনী হয়, পুঁজিপতি এখন আর তেমনভাবে ধনী হয় না। এখন পুঁজিপতি ধনী হয় যে পরিমাণে সে অন্যের শ্রমশক্তিকে নিঙড়ে নিতে পারে এবং যে অনুপাতে সে শ্রমিককে তার জীবনের সকল প্রকার সাদ-আহ্লাদ থেকে নিবৃত্ত করে রাখতে পারে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৯৪)

এইবার দেখা যাক্ বাস্তব ক্ষেত্রে পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি হয় কিভাবে। মনে করি, পুঁজিপতিশ্রেণী গড়ে উদ্বৃত্ত-মূল্যের শতকরা চল্লিশ ভাগ ভোগ করে, আর শতকরা ষাট ভাগ নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করে। এর অর্থ হল, যদি উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ এক হাজার টাকা হয়, তবে নতুন পুঁজির জন্য পাওয়া যাবে ছয়শো টাকা। আবার

উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ২০০০ টাকা হলে, নতুন পুঁজি পাওয়া যাবে ১২০০ টাকা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুঁজির সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রধানতঃ উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। অন্য সব কিছু ঠিক থেকে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়লে পুঁজির সঞ্চয় বাড়ে। আরো একটি জিনিস লক্ষণীয় এই যে, একদিকে এতে যেমন পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিশ্রেণীর ভোগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় দুইভাবে (১) পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে, অর্থাৎ শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা বৃদ্ধি করে (শ্রম-সময় বাড়ানোর সমস্যাগুলি আগেই আলোচনা করেছি এবং আপাততঃ শ্রমযন্ত্র বাড়ানোর সমস্যাটিকে হিসাবের বাইরে রাখছি।) (২) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

(১) শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঃ—আমরা জানি, মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করতে হলে তা দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করতে হয়। তাই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশকে পুঁজিতে পরিণত করতে শ্রমবাজারে ক্রয় করার মতো শ্রম-শক্তি অবশ্যই থাকতে হবে। মনে হতে পারে যে প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগানের অভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে পুঁজিতে রূপান্তর করা সম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ সেই সমস্যা দেখা দেয় না। সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন শুধু পুঁজি ও শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদন করে না, নতুন শ্রমশক্তির আধার হিসাবে নতুন শ্রমিকও সৃষ্টি করে। কারণ, "শ্রমিকশ্রেণীকে মজুরির উপর নির্ভরশীল একটি শ্রেণীতে পরিণত করে—যার সাধারণ মজুরি শুধু তার বেঁচে থাকার পক্ষেই যথেষ্ট নয়, তার বৃদ্ধির পক্ষেও যথেষ্ট —পুঁজিবাদী উৎপাদনের কলা-কৌশল আগে থেকেই এর জন্য ব্যবস্থা করে রাখে। পুঁজিপতির দিক থেকে একমাত্র যা করতে হয় তা হলো, শ্রমিকশ্রেণী প্রতি বৎসর বিভিন্ন বয়সের শ্রমিক হিসাবে যে বাড়তি শ্রমশক্তি যোগান দেয়, তাকে বাৎসরিক উপাদানের মধ্যকার উদ্বৃত্ত উপাদানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া, আর এমনি করেই উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঁজিতে রূপান্তরিত করার কাজটি সম্পূর্ণ হয়। বাস্তব দিক দিয়ে দেখলে সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হারে পুঁজির পুনরুৎপাদনে নিযুক্ত হয়। সরল পুনরুৎপাদন যে বৃত্তে ঘুরছিল, তার রূপ বদলে যায় এবং...তা একটি ক্রমবর্ধমান পরিধির বৃত্তাকারে রেখায় পরিবর্তিত হয়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮১)

(২) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ঃ—শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে উৎপন্ন পণ্যের মোট পরিমাণ বেড়ে যায়। আগে নির্দিষ্ট শ্রম-সময়ে একজন শ্রমিক যে পরিমাণ পণ্য তৈরী করতে পারত এখন সেই সময়ে তার চেয়ে বেশি পণ্য সে তৈরী করতে পারবে। ফলে উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার অপরিবর্তিত

থাকলেও উদ্বৃত্ত-পণ্যের পরিমাণ আগের চেয়ে বেশী হবে। পুঁজিপতি পূর্বে উদ্বৃত্ত-পণ্য যে অনুপাতে ভোগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে ভাগ করতো, এখনও যদি সেই অনুপাতে ঠিক থাকে, তবে পুঁজি সঞ্চয়ের পরিমাণ না কমিয়েও পুঁজিপতির ভোগের জন্য এখন অনেক বেশি পণ্যসামগ্রী পাওয়া যাবে, অর্থাৎ পুঁজিপতির জীবনযাত্রার বস্তুগত মান বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় পুঁজিপতি যদি তার জীবনযাত্রার প্রকৃত মান আগের মতো রাখে, তবে সঞ্চয় ভাণ্ডারে জমা দেবার জন্য আরও বেশি পণ্য তার হাতে থাকবে, অর্থাৎ পুঁজির সঞ্চয় বেড়ে যাবে।

আবার আমরা জানি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তার মুদ্রা-মজুরি অপরিবর্তিত থেকেও উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার বেড়ে যায়। সুতরাং পুঁজিপতির হাতে মোট উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণও বেশি আসে এবং পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

উপরন্তু শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম কমে যাওয়াও পুঁজিপতির সঞ্চয়ে বস্তুগত পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ এখন একই দাম দিয়ে সে বেশি শ্রমযন্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করতে পারে। আবার ক্ষয়প্রাপ্ত মূল পুঁজি পূরণ করতে এখন অনেক কম খরচ পড়ে। এমনিভাবে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে পুঁজির সঞ্চয় ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবে।

বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের ফলে যে পুঁজির সঞ্চয় হয় তা গোটা পুঁজির চরিত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন এনে দেয়। আমাদের উপরোক্ত উদাহরণে পুঁজিপতি প্রারম্ভিক স্তরে দশ হাজার টাকার পুঁজি লগ্নি করেছিল। এই পুঁজি সে অবশ্যই কোনো না কোনো উপায়ে সংগ্রহ করেছিল। পুঁজির আদি সঞ্চয়ের ইতিহাস দিয়ে এই পুঁজির জন্ম-বৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু, সেই পুঁজিপতি যখন প্রথম বারে আদায় করা দু'হাজার টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্যের কিছু অংশ নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নি করে, তখন সেই নতুন পুঁজির জন্ম-রহস্য জানার জন্য আমাদের আর ইতিহাস ঘাঁটতে হয় না। কারণ এই উদ্বৃত্ত-মূল্য আমাদের চোখের সামনেই উৎপন্ন হয়েছে, আমাদের চোখের সামনেই পুঁজিপতি এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রতিদানে কাউকে সমমূল্যের কোনো কিছু না দিয়েই তা আত্মসাৎ করেছে; আমাদের চোখের সামনেই তাকে নতুন পুঁজিতে রূপান্তরিত করেছে। সুতরাং এই নতুন পুঁজির প্রতিটি অণু-পরমাণু আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্য দ্বারা গঠিত।

সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে, কয়েক দফা পুনরুৎপাদনের পর পুঁজিপতির প্রাথমিক পুঁজি কার্যতঃ আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের সমষ্টিতে পরিণত হয়ে পড়ে। আবার, এইমাত্র দেখলাম যে নতুন পুঁজির সঞ্চয় জন্ম থেকেই আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী

পুনরুৎপাদনের ফলে কয়েক দফা পুনরুৎপাদনের পর পুঁজিপতির গোটা পুঁজিই চরিত্রগতভাবে আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যে পরিণত হয়ে যায়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হয়েছিল সমান সমান পণ্যের বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু, বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে এসে এখন তা লোক দেখানো বিনিময়ে পরিণত হয়েছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হলো—শ্রমিকের শ্রমশক্তি ক্রয় করা। আর তা হয় মুদ্রা-পুঁজির মালিক পুঁজিপতি ও শ্রমশক্তির মালিক শ্রমিকের মধ্যে বিনিময়ের মাধ্যমে। আর সেই বিনিময় হয় সমান সমান মূল্যের মধ্যে। মজুরি হিসাবে শ্রমিক যে মূল্য পায়, তা তার শ্রমশক্তির মূল্য, অর্থাৎ তা শ্রমশক্তির উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। কিন্তু বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের সময় যখন আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নতুন পুঁজিতে পরিণত করে তাই দিয়ে শ্রমিকের শ্রমশক্তির মূল্য হিসাবে মজুরি দেওয়া হয়, তখন কার্যতঃ কি ঘটে ?

"যে মূল্য প্রক্রিয়া—অর্থাৎ সমান সমান মূল্যের মধ্যে বিনিময় - থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এখন তা এমনিভাবে পাল্টে গেছে যে, এখন তা দাঁড়িয়েছে কেবলমাত্র একটি লোক-দেখানো বিনিময়ের ঘটনায়। তার কারণ এই যে প্রথমতঃ, এখন যে পুঁজির সঙ্গে শ্রমশক্তির বিনিময় করা হয়, তা নিজেই অপরের শ্রমে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি অংশ, যার বদলে সমমূল্যের কোনো কিছু না দিয়েই তা আত্মসাৎ করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, তার উৎপাদনকারী শুধু এই পুঁজিটুকুই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকে না, উদ্বৃত্ত সহ তা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৩)

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে বিনিময়ের একটি পক্ষ, অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব সম্পত্তি শ্রমশক্তি দেয় বটে, কিন্তু অপর পক্ষ, অর্থাৎ পুঁজিপতিশ্রেণী যা দেয় তা কখনই আর তার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। কার্যতঃ তা হলো শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ। সুতরাং এ বিনিময় প্রকৃতপক্ষে লোক-ভোলানো বিনিময় ছাড়া আর কি ?

কিন্তু, পুঁজিপতিশ্রেণী ও তাদের ধ্বজাধারী পণ্ডিতরা তারস্বরে চিৎকার করে উঠতে পারে—এ সম্পূর্ণ মিথ্যা, এ নেহাতই প্রবঞ্চনা, কারণ, উদ্বৃত্ত-মূল্যের প্রকৃত মালিক তো পুঁজিপতিশ্রেণী। উত্তরে আমরা বিনীতভাবে শুধু এই কথাই মনে করিয়ে দিতে চাই যে, এ হচ্ছে সেই ন্যায়সঙ্গত বিনিময় যেখানে "প্রত্যেক বিজেতা বিজিতদের কাছ থেকে যে মুদ্রা লুট করে নিয়েছে, সেই মুদ্রা দিয়ে বিজিতদের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করছে।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৮৩)

পুঁজিবাদের বিকাশ ও তার সংকট

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেছি। আর সেই আলোচনার মধ্য দিয়ে কয়েকটি মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। সেই সিদ্ধান্তগুলি হল—

(১) পুঁজিবাদী উৎপাদন মূলত পণ্য-উৎপাদন, অর্থাৎ বিক্রয়ের জন্য জিনিসপত্র উৎপাদন। আর সেই উৎপাদনের মূল প্রেরণা হল—সেই জিনিসপত্র পণ্য হিসাবে বিক্রয় করে মুনাফা অর্জন করা। সুতরাং এক কথায় বলতে গেলে পুঁজিবাদী উৎপাদন হল, 'মুনাফার জন্য পণ্য উৎপাদন'।

(২) পুঁজি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে সঞ্চিত মুদ্রা হিসাবে। সেই মুদ্রা প্রথমে পণ্যে রূপান্তরিত করা হয়, পরে পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। কিন্তু, এই বারংবার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটে, অর্থাৎ মুদ্রা উদ্বৃত্ত-মুদ্রা সৃষ্টি করে। আর এই পরিমাণ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মুদ্রা সৃষ্টির প্রক্রিয়াই মুদ্রাকে পুঁজিতে পরিণত করে।

(৩) পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল্য শর্ত হল দু'টি। প্রথমতঃ, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নত স্তরে, কিছু লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থ সম্পদ জমতে হবে। (২) দ্বিতীয়তঃ, আর থাকবে এক স্বাধীন সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী। এই শ্রমিকশ্রেণীকে দু'টি অর্থে স্বাধীন হতে হবে—(ক) তারা অন্য কারো মতামত ছাড়াই স্বাধীনভাবে যে কোন প্রকার চুক্তি করতে পারবে। (খ) তারা সমস্ত প্রকার সম্পদের বন্ধন থেকে মুক্ত হবে, অর্থাৎ তাদের না থাকবে উৎপাদনের কোন প্রকার উপাদান, না থাকবে জীবনধারণের উপায়ের সংস্থান। নিজস্ব বলতে তাদের যা থাকবে তা হল তাদের শ্রমশক্তি। আর উপাদানের মালিক পুঁজিপতিদের নিকট মজুরির বিনিময়ে এই শ্রমশক্তি বিক্রয় করেই কেবলমাত্র তারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারবে, অর্থৎ তাদের শ্রমশক্তি পণ্যে পরিণত হবে।

(৪) পুঁজির আদি-সঞ্চয় হয়েছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে, পুঁজিবাদের সূচনার পূর্বে। পুঁজির আদি-সঞ্চয়ের ইতিহাস হল, বলপূর্বক আত্মসাৎ করা, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি নিষ্ঠুর ঘটনার ইতিহাস। আবার এরই মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পত্তনের প্রাথমিক শর্ত দু'টি পূরণ হয়েছিল।

(৫) পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হল—উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা। কারণ উদ্বৃত্ত মূল্যই হল পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস। মুদ্রা-পুঁজি দিয়ে পুঁজিপতি প্রথমে বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয় করে, যথা, জমি, বাড়ি, শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান ও শ্রমিকের শ্রমশক্তি। এই বিনিময় হয় তুল্যমূল্যের মধ্যে। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলির উৎপাদন ব্যয়ের সমান মূল্য দিয়েই পুঁজিপতিকে সেগুলি কিনতে হয়। আর শ্রমিককে মজুরি দিতে হয় তার শ্রমশক্তির উৎপাদন ব্যয়ের সমান মূল্য। এইবার পুঁজিপতি এই সকল পণ্য একসঙ্গে ভোগ করে, অর্থাৎ এদের সাহায্যে নতুন পণ্য উৎপাদন করে। নতুন পণ্যে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলির হারাহারি অংশের মূল্য হাজির হয়। কিন্তু, শ্রমিকের শ্রমশক্তির পণ্যে যে নতুন-মূল্য সৃষ্টি করে তা তার মজুরি-মূল্যের চেয়ে বেশী হয়, অর্থাৎ শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট নতুন-মূল্য=মজুরি-মূল্য+ উদ্বৃত্ত-মূল্য। সুতরাং, নতুন পণ্যের মূল্য=ব্যয়িত পুঁজির মূল্য (অন্যান্য উপাদানের মূল্য+মজুরি)+উদ্বৃত্ত-মূল্য।

(৬) পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যে নতুন পণ্য উৎপন্ন হয়, পুঁজির মালিকানার দাবিতে পুঁজিপতি তার সবটাই দখল করে। ফলে সে তার ব্যয়িত পুঁজির সবটা তো ফিরে পায়ই, উপরন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যটুকুও আত্মসাৎ করে। আর এই উদ্বৃত্ত-মূল্যই পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার উৎস।

(৭) পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন শুধু পুঁজিরই পুনরুৎপাদন করে না, পুঁজিবাদী সম্পর্কেরও পুনরুৎপাদন করে, অর্থাৎ একদিকে পুঁজিপতি অপরদিকে মজুরি-শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্ক পুনরুৎপাদন করে।

(৮) পুঁজির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্রমাগত নিজেকে বাড়িয়ে তোলা; আর তা করে মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করে। তাই পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন প্রধানতই বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন। আর এর জন্য চাই পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি। তাই পুঁজিপতি আত্মসাৎ করা উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ মূল-পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করে পুঁজির সঞ্চয় বাড়িয়ে নেয়। চলতে থাকে বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন।

মানবসমাজ একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান; সেই হেতু তা নিয়ত গতিশীল। পুঁজিবাদী সমাজ এর ব্যতিক্রম হতে পারে না. বরং এই ব্যবস্থা দ্রুত তার নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা পুঁজিবাদী সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ধারাগুলি বিস্তারিত আলোচনা করে উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি পেয়েছি। এখন উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে গতিশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশ ও নিশ্চিত পরিণতির চিত্র অঙ্কিত করব।

'মার্কসবাদ জানবো' এর প্রথম খণ্ডে সমাজ বিকাশের অধ্যায়ে আমরা দেখছি—সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিকাশের যুগে বিকশিত উৎপাদন শক্তি ও সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে বিরোধ বেধে যায়। শুরু হয় বুর্জোয়া সমাজ বিপ্লব। যার পরিণতিতে পত্তন হয় পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা।

সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসস্তূপের উপর পুঁজিবাদের উদ্ভবের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয়েছিল পুঁজির আদি-সঞ্চয়। সেই সঞ্চয়ের নিষ্ঠুর ইতিহাস আমরা দেখেছি। আরো দেখেছি কি করে আদি-সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদের প্রধান শর্ত দু'টি—অর্থাৎ (১) পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নততর পর্যায়ে কিছু লোকের হাতে উৎপাদনের উপাদান জড়ো হওয়া, (২) সেই সঙ্গে কিছু লোক উৎপাদনের সমস্ত প্রকার উপায় থেকে, এমন কি জীবনধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বহারা মজুরি-শ্রমিকে পরিণত হওয়া—পূরণ হয়েছিল। আর সেই পটভূমির উপর দাঁড়িয়ে পুঁজিবাদ তার যাত্রা শুরু করে।

আমরা জানি, যে কোন গতিশীল সমাজের অস্তিত্বরক্ষণ ও উন্নততর বিকাশের প্রধান শর্ত হল—বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন। পুঁজিবাদী সমাজের ক্ষেত্রেও তা হবে —বর্ধিতহারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন। তার জন্য চাই পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি। পুঁজি-পতি উৎপাদনের এক ধাপে যে উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করে, তার একটি অংশ নিজের ভোগবিলাসের জন্য ব্যয় করে, আর অপর অংশ সঞ্চয় করে। পরবর্তী ধাপে মূল-পুঁজির সঙ্গে এই সঞ্চিত অংশ যোগ করে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এমনিভাবে চলে বর্ধিতহারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন, বেড়ে চলে মুনাফা প্রাপ্তির পরিমাণ।

বর্ধিত পরিমাণে মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করা পুঁজির স্বভাব ধর্ম হলেও এই প্রচেষ্টা কার্যতঃ তার অস্তিত্ব রক্ষার বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গেও যুক্ত। প্রতিটি পুঁজি-পতিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয় তার প্রতিযোগী পুঁজিপতিদের সঙ্গে লড়াই করে; তাকে বড় হতে হয় তার প্রতিযোগীদের পরাজিত করে, সম্ভব হলে তাদের ধ্বংস করে। আর এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এগিয়ে চলে তার ইতিহাস নির্ধারিত পরিণতির দিকে। আর সেই পরিণতি হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, যার মূল কথা হল—ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ করে ব্যক্তিগত প্রতি-যোগিতার মূলোচ্ছেদ করা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটে, তা অতি দ্রুত পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পদের উৎপাদন সম্পর্কের বেড়া-গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে চায়। তাই দেখা দেয় তাদের মধ্যে বিরোধ, যার প্রকাশ ঘটে বারে বারে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সংকটরূপে। এই সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য পুঁজিবাদ তার মূল চরিত্র বজায় রেখে নানা অদলবদল করে।

কিন্তু তা করে সে কখনই তার মূল দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে না। তাই পুঁজি-বাদ ক্রমাগতই এগিয়ে চলে তার অন্তিম দিনটির দিকে। সেই গতির ধারাই আমরা এইবার আলোচনা করব।

পুঁজিবাদী পণ্য সঞ্চালনের যে ধারা দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছিলাম তা হল, মু→প→মু´। আবার পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পুঁজিবাদী পুনরুৎ-পাদনের আলোচনার আলোকে আমরা দেখছি যে, এই ধারায় তিনটি পর্যায় রয়েছে—

প্রথম পর্যায় –এই পর্যায়ে পুঁজিপতি তার মুদ্রা-পুঁজি নিয়ে পণ্য বাজারে হাজির হয়। ক্রয় করে উৎপাদনের নানা উপাদান, যেমন জমি, বাড়ি, শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি। তারপর সে হাজির হয় শ্রম বাজারে। সেখান থেকে পণ্য হিসাবে ক্রয় করে শ্রমিকের শ্রমশক্তি নির্দিষ্ট সময় কাজ করার চুক্তিতে। যদি মুদ্রাকে 'মু', পণ্যকে 'প', উৎপাদনের উপাদানকে 'উউ' এবং শ্রমশক্তিকে 'শ্র' দ্বারা বুঝানো যায়, তবে এই পর্যায়ের বিনিময়ের ধারাটি হবে—

দ্বিতীয় পর্যায়—এই পর্যায়ে পুঁজিপতি তার ক্রয় করা পণ্যগুলি একসাথে মিলিয়ে ভোগ করে, অর্থাৎ প্রকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে। এই পর্যায়ে শ্রমিক উৎপাদনের উপাদানের উপর নিজের শ্রমশক্তি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ শ্রম করে নতুন পণ্য তৈরী করে। সেই নতুন পণ্যের মূল্য=নিয়োজিত পুঁজির মূল্য+উদ্বৃত্ত-মূল্য এই প্রক্রিয়ায় পণ্য (প), নতুন পণ্য (প´) এ পরিণত হয়। আর 'প´'-এর মূল্য প থেকে বেশী হয়। ধারার এই অংশের রূপ হয়—

শ্র
প< ——————→প´
উউ উৎপাদন

তৃতীয় পর্যায় - এই পর্যায়ে পুঁজিপতি উৎপন্ন নতুন পণ্য নিয়ে পণ্য বাজারে হাজির হয়। প্রথম পর্যায়ে যে পণ্য-বাজার ও শ্রম-বাজার থেকে যত মূল্যের পণ্য ক্রয় করেছিল, এখন তার চেয়ে বেশী মূল্যের পণ্য নিয়ে পণ্য বাজারে হাজির হয়। সুতরাং পণ্য বিক্রি করে সে স্বভাবতই বেশী মুদ্রা ফিরে পায়। ধারার এই অংশের রূপটি হয়—

প´——————→মু´ (মু´=মু+উমু)
বিনিময়

সুতরাং সঞ্চালনের গোটা ধারাটি দাঁড়াল—

শ্র
মু——→প < ——→প´——→মু´
উউ

এই ধারাটিকে আমরা বলতে পারি 'মুদ্রা-পুঁজি সঞ্চালন ধারা'। আর এই ধারার প্রথম থেকে তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত এক একটি টুকরোকে আমরা বলব উৎপাদনের এক একটি ধাপ। একটি গতিশীল পুঁজিবাদী সমাজে এই ধারা পর্যায়ক্রমে বার বার আবর্তন করে, তবে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়।

তৃতীয় পর্যায়ে যে মূল্য পাওয়া যায় তাতে থাকে প্রথম পর্যায়ে নিয়োজিত মূল্য+উদ্বৃত্ত-মূল্য। এইবার প্রতিবারই শেষের ধাপে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত মূল্যের সবটাই যদি পুঁজিপতি ভোগ বিলাসে ব্যয় করে ফেলে তবে প্রতিবারই উৎপাদনের প্রথম পর্যায় শুরু হবে একই পরিমাণ পুঁজি নিয়ে। ফলে যা হবে তা হল সরল পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন। সেই অবস্থার সেই পুঁজিবাদী সমাজ একটি স্থিতিশীল সমাজে পরিণত হবে, তার আর কোন উন্নতি হবে না। সুতরাং সমাজের ক্রমবিকাশের জন্য যা প্রয়োজন হবে তা হল—উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ নতুন পুঁজি হিসাবে পুঁজি সঞ্চালনের ধারায় নিযুক্ত করা। উদ্বৃত্ত-মূল্যের সবটাই নতুন পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ পরাশ্রয়ী পুঁজিপতিশ্রেণীর উদ্বৃত্ত-মূল্যই একমাত্র সম্বল। তাই নিজের ভোগ বিলাসের জন্য সে অবশ্যই উদ্বৃত্ত-মূল্যের একটি অংশ খরচ করবে, অপর অংশটি নতুন পুঁজি হিসাবে লগ্নী করবে; তবেই বর্দ্ধিত হারে পুনরুৎপাদন বজায় থাকবে, সমাজের উন্নততর বিকাশ ঘটবে।

পুঁজিপতি সমাজের সফল ও বাধাহীন বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তা হল—পুঁজি-সঞ্চালনের ধারার পর্যায় তিনটির নিঝঁঞ্ঝাট রূপায়ণ। তাই আমরা পর্যায়গুলির বিস্তারিত আলোচনা করে দেখব এদের কোথায় কি সমস্যা রয়েছে, আর সেই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন অংশ ও গোটা সমাজের উপর সেই সমস্যার প্রতিক্রিয়া কি তাও লক্ষ করব।

(১) পুঁজি-সঞ্চালনের ধারার প্রথম পর্যায় হল মুদ্রা-পুঁজিকে পণ্যে রূপান্তরিত করার পর্যায়। সুতরাং এই পর্যায়ের সার্থকতার জন্য যা প্রয়োজন তা হল—পণ্য বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের বাস্তব উপাদান থাকতে হবে, আর থাকতে হবে শ্রম-বাজারে যথেষ্ট পরিমাণ শ্রমশক্তির যোগান, অর্থাৎ যথেষ্ট সংখ্যক শ্রমিক।

আমরা দেখেছি পুঁজিবাদী উৎপাদন শুরু হওয়ার আগেই পুঁজির আদি-সঞ্চয় সংগ্রহের মধ্য দিয়ে উপরোক্ত দু'টি জিনিস, অর্থাৎ উৎপাদনের বাস্তব উপাদান ও মজুরি-শ্রমিক পাওয়া গিয়েছিল, শুরু হয়েছিল পুঁজিবাদী উৎপাদন। তারপর

থেকে পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে "সরল পুনরুৎপাদন যেমন অনবরত পুঁজিবাদী সম্পর্ককেই পুনরুৎপাদন করে, অর্থাৎ একদিকে পুঁজিপতি শ্রেণী ও অপরদিকে মজুরি-শ্রমিকের মধ্যকার সম্পর্কের পুনরুৎপাদন করে তেমনি ক্রমবর্ধমান হারে পুনরুৎপাদন, অর্থাৎ সঞ্চয়, ক্রমবর্ধমান হ'রে পুঁজিবাদী সম্পর্কের পুনরুৎপাদন করে। অর্থাৎ এক প্রান্তে অনেক বেশী সংখ্যক বা আরো বড় বড় পুঁজিপতি, এবং অপর প্রান্তে আরো বেশী সংখ্যক মজুরি-শ্রমিক পুনরুৎপাদন করে।...পুঁজির সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির অর্থই হল, সর্বহারাশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি।" (মার্কস, ক্যাপিটাল প্রথম খণ্ড, পৃ: ৬১৩-১৪)। সুতরাং বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় শ্রমিকের যোগান সাধারণতই কোন সমস্যারূপে দেখা দেয় না। পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের প্রক্রিয়ার মধ্যেই এর ব্যবস্থা রয়ে গেছে।

বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদনের জন্য উৎপাদনের বাস্তব উপাদান পাওয়ার সমস্যাও নেই বললেই চলে। পুঁজিবাদী উৎপাদন চলে দু'টি বিভাগে—(১) প্রথম বিভাগ—যেখানে উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হয়, (২) দ্বিতীয় বিভাগ—যেখানে এইসব যন্ত্রপাতির সাহায্যে ভোগ্যদ্রব্য তৈরী হয়। এই বিভাগ দু'টি কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল। যন্ত্রপাতি না পেলে একদিকে যেমন ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী বিভাগের উৎপাদন চলতে পারে না। তেমনি আবার, ভোগ্যপণ্য না পেলে যন্ত্রপাতি উৎপাদনে নিযুক্ত বিভাগের কর্মীরা কি খেয়ে উৎপাদন চালাবে? এদের এই পারস্পরিক সম্পর্কই উভয় বিভাগের সঞ্চয়কে উৎপাদন-পুঁজিতে রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অন্য সব কিছু যদি ঠিক থাকে তবে পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি, অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উন্নততর বিকাশের পথে এই পর্যায়ে বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দেয় না।

(২) পুঁজি সঞ্চালনের দ্বিতীয় পর্যায় হল—নতুন পণ্য উৎপাদন করার পর্যায়। প্রথম পর্যায়ে পুঁজিপতি তার মুদ্রা-পুঁজির বিনিময়ে যে পণ্যগুলি সংগ্রহ করে, এই পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সেই সব পণ্যকে ভোগ করে, অর্থাৎ নতুন পণ্যের উৎপাদন করে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হল—নতুন পণ্যে উদ্বৃত্ত-মূল্য সৃষ্টি করা। কারণ তবেই সেই পণ্য বিক্রয় করে পুঁজিপতি মুনাফা অর্জন করতে পারবে। সুতরাং এই পর্যায়ে পুঁজিপতির সামনে প্রধান প্রশ্ন হলো, কি করে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো যায়। উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ বাড়ানো যায় দু'টি উপায়ে—(১) শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, (২) শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। আর একমাত্র পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি করে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করে ও তাতে উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেই তা করা সম্ভব।

আমরা জানি, পুঁজিপতি তার পুঁজিকে দু'টি অংশে বিভক্ত করে লগ্নী করে। প্রথমটি হল, স্থির পুঁজি—যা দিয়ে সে জমি, বাড়ি, শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করে। দ্বিতীয়টি হল, পরিবর্তনশীল পুঁজি—যা পুঁজিপতি ব্যবহার করে শ্রমিকের মজুরি দেওয়ার জন্য। মোট পুঁজির এই দু'টি অংশের পারস্পরিক সম্পর্ককে আমরা বলব 'পুঁজির আঙ্গিক গঠন'। পুঁজির এই আঙ্গিক গঠনকে উন্নত মানের আঙ্গিক গঠন বলা হয় তখন যখন স্থির পুঁজির পরিমাণ পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণের চেয়ে তুলনামূলক ভাবে বেশী থাকে। আর এর উল্টোটাকে বলা হয় পুঁজির নিম্নমানের আঙ্গিক গঠন।

পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে যেমন মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে পুঁজির উভয় অংশের পরিমাণও বাড়ে। কিন্তু এই বৃদ্ধি দু'রকম ভাবে হতে পারে—(১) প্রথমতঃ, মোট পুঁজির পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, পুঁজির উভয় অংশের পরিমাণও সেই অনুপাতে বাড়তে পারে। যেমন, মোট পুঁজি দ্বিগুণ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির পুঁজি ও পরিবর্তনশীল পুঁজি উভয়ই দ্বিগুণ হল। (২) দ্বিতীয়তঃ, মোট পুঁজির পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে, স্থির বা পরিবর্তনশীল পুজির যে কোন একটির পরিমাণ তার চেয়ে বেশী অনুপাতে বাড়তে পারে। স্বভাবতই তখন অপরটির বৃদ্ধির অনুপাত কম হবে। যেমন, মোট পুঁজির পরিমাণ দ্বিগুণ হল; অথচ স্থির পুঁজির পরিমাণ তিনগুণ হয়ে গেল। ফলে পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ অবশ্যই দ্বিগুণের চেয়ে কম বাড়বে।

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক। মনে করি, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির পরিমাণ ১০,০০০ টাকা। তার মধ্যে ৬,০০০ টাকা স্থির পুঁজি, আর ৪,০০০ টাকা পরিবর্তনশীল পুঁজি। অর্থাৎ পুঁজির আঙ্গিক গঠন হল ৩ : ২। আরো মনে করি, মালিক পুঁজিপতির উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার সব সময়ই শতকরা ১০০ ভাগ। সুতরাং মালিক এখন উদ্বৃত্ত-মূল্য পায় ৪,০০০ টাকা।

যেহেতু আমাদের এই পুঁজিপতি অবশ্যই বর্ধিত হারে পুনরুৎপাদন চালাবে, সুতরাং মনে করি, সে ৪,০০০ টাকা উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে ২,৭৫০ টাকা সঞ্চয় করে তা নতুন পুঁজি হিসাবে নিয়োগ করে। ফলে তার মোট পুঁজি বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ১২,৭৫০ টাকা। এইবার দেখা যাক সে তার স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজি কি হারে বাড়াতে পারে। (১) পূর্বে তার পুঁজির দু'অংশের মধ্যে যে অনুপাত ছিল, (অর্থাৎ ৩ : ২) নতুন পুঁজিকে সে সেই অনুপাতে ভাগ করে পুঁজির দুই অংশের সঙ্গে যোগ করতে পারে। সে ক্ষেত্রে নতুন ২,৭৫০ টাকার মধ্যে ১,৬৫০ টাকা

যোগ হবে স্থির পুঁজির সঙ্গে, আর ১,১০০ টাকা পরিবর্তনশীল পুঁজির সঙ্গে। অর্থাৎ এখন স্থির পুঁজি হবে ৭,৬৫০ টাকা ও পরিবর্তনশীল পুঁজি ৫,১০০ টাকা। পুঁজির দু'অংশের অনুপাত সেই ৩ : ২ থেকে যাবে অর্থাৎ, পুঁজির আঙ্গিক গঠনের কোন পরিবর্তন হবে না। কার্যক্ষেত্রে এর অর্থ দাঁড়াবে—আগে শ্রমিক পিছু যে পরিমাণ শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি লাগতো, পুঁজিপতি সেই অনুপাতে শ্রমযন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদি ক্রয় করবে এবং সেই অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াবে এবং তাদের জন্য মজুরির টাকা রেখে দেবে। অর্থাৎ উৎপাদন সংগঠনের অন্য কোন পরিবর্তন না করে কেবল তার প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি করবে মাত্র।

(২) আবার পুঁজিপতি নতুন ২,৭৫০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা দিয়ে একটি বা একাধিক উন্নত ধরনের যন্ত্র ও প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ক্রয় করতে পারে এবং নতুন শ্রমিকদের মজুরি দেওয়ার জন্য মাত্র ২৫০ টাকা রাখতে পারে। এইভাবে ভাগ করা সম্ভব এই জন্য যে, উন্নত ধরনের যন্ত্র ক্রয় করতে বেশী টাকার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তখন সাধারণতই কম শ্রমিক প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে তার স্থির পুঁজির পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,৫০০ টাকা আর পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ দাঁড়াবে ৪,২৫০ টাকা এবং তাদের অনুপাত দাঁড়াবে ৪ : ২ বা ২ : ১। অর্থাৎ পুঁজির আঙ্গিক-গঠন উন্নতমানের হয়ে যাবে।

থাকে। তাই কারখানায় তৈরি পণ্য কম দামে বিক্রি হয় ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে না। তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি হয় ধ্বংস হয়ে যায়, নয়ত পুঁজিপতিদের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তারা নিজেরা পুঁজিপতিদের কারখানায় মজুরি শ্রমিকের কাজ নিতে বাধ্য হয়, অবশ্য যদি কাজ জোগাড় করতে পারে। এর সাক্ষাৎ ফলকেই আমরা বলি **সামাজিক পুঁজির একত্রীভবন।** এতদিন সামাজিক পুঁজি সমাজের এক বৃহৎ জনসংখ্যার হাতে ছড়িয়ে ছিল। পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তা ক্রমাগতই অল্পসংখ্যক পুঁজিপতির হাতে জমতে থাকে। আর সমাজের বৃহত্তর অংশ উৎপাদনের উপাদান থেকে বঞ্চিত হয়ে সর্বহারাশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে অবশ্য সেই সঙ্গে সামাজিক পুঁজির মোট পরিমাণও বাড়ে। তবে তা স্বতন্ত্র পুঁজিপতিদের ব্যক্তিগত পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এইরূপে পুনরুৎপাদনের মধ্য দিয়ে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রায় গোটাটাই পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের আওতায় এসে যায়।

আমরা দেখলাম পুঁজির একত্রীভবনের মধ্য দিয়ে সামাজিক পুঁজি অল্প কয়েক-জন পুঁজিপতির হাতে জড়ো হয়। এর ফলে উৎপাদনে বিভিন্ন শাখা বা শিল্পে কয়েকজন করে পুঁজিপতি সৃষ্টি হয়। তখন তাদের নিজেদের মধ্যে দেখা দেয় প্রতিযোগিতা। সবলদের চাপে দুর্বলরা ক্রমেই কোণঠাসা হতে থাকে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না তাদের পুঁজি হয় ধ্বংস হয়ে যায়, নয়তো বৃহৎ পুঁজিপতিরা কম দামে তা নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয়। এমনি করে পুঁজিপতিদের হাত থেকে পুঁজি ক্রমে গুটিকয়েক বৃহৎ পুঁজি-পতির হাতে জমতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে বলে **পুঁজির কেন্দ্রীভবন।** এর ফলে এইসব বৃহৎ পুঁজিপতি বিশেষ বিশেষ শিল্পের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিকাশের ক্ষেত্রে 'পুঁজির একত্রীভবন ও 'পুঁজির কেন্দ্রীভবন' এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং, পরবর্তী সময়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা জানি পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে পুঁজির আঙ্গিক-গঠনের পরিবর্তন হয়, আর সাধারণতই আঙ্গিক-গঠনের মানের উন্নতি হয়। অর্থাৎ স্থির পুঁজি বেশী অনুপাতে বাড়ে, পরিবর্তনশীল পুঁজি বাড়ে কম অনুপাতে। এই পরিবর্তন পুঁজিপতিদের মুনাফার হারের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে। পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফার হার নির্ণয় করে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যকে মোট পুঁজির সঙ্গে তুলনা করে

$$\text{অর্থাৎ, মুনাফার হার} = \frac{\text{উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ}}{\text{স্থির পুঁজি + পরিবর্তনশীল পুঁজি}}$$

অথচ উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ নির্ভর করে পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণের উপর। সুতরাং পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ যদি মোট পুঁজির বৃদ্ধির অনুপাতের চেয়ে কম অনুপাতে বাড়ে, তবে তুলনামূলকভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্য বৃদ্ধির অনুপাত কম হবে। ফলে মুনাফার হার কমে যাবে। সুতরাং, পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে পুঁজির আঙ্গিক-গঠন উন্নত হলে মুনাফার হার কমে যায়।

বাস্তব উদাহরণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক। আমাদের উপরোক্ত উদাহরণে স্থির ও পরিবর্তনশীল পুঁজির প্রথম অনুপাত ছিল ৩ : ২। পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে (২) নং ক্ষেত্রে পুঁজির আঙ্গিক গঠন উন্নত হওয়ায় সেই অনুপাত দাঁড়াল ২ : ১। সঞ্চয় বৃদ্ধির পূর্বে পরিবর্তনশীল পুঁজি ছিল ৪,০০০ টাকা। শতকরা ১০০ ভাগ উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ ছিল ৪,০০০ টাকা। সঞ্চয় বৃদ্ধির পর পরিবর্তনশীল পুঁজি দাঁড়াল ৪,২৫০ টাকা, ফলে একই হারে উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪,২৫০ টাকা। মুনাফার হার নির্ণয় করার উপরোক্ত সূত্র মতো মুনাফার হার দাঁড়াবে—

$$\text{সঞ্চয় বৃদ্ধির পূর্বে মুনাফার হার} = \frac{৪০০০}{৬০০০ + ৪০০০} = \text{শতকরা ৪০ ভাগ}$$

$$\text{সঞ্চয় বৃদ্ধির পর মুনাফার হার} = \frac{৪২৫০}{৮৫০০ + ৪২৫০} = \text{শতকরা ৩৩}\tfrac{১}{৩}\text{ ভাগ}$$

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের মুনাফার হার হ্রাস করে।

এ দেখে মনে হতে পারে যে, পুঁজিপতিরা সবাই এমন সব শিল্পে পুঁজি লগ্নী করতে বেশী উৎসাহিত হয়, যাতে পুঁজির আঙ্গিক-গঠন নিম্নমানের। কারণ, তবেই তারা বেশী হারে মুনাফা পেতে পারবে। বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু তা হয় না। কারণ "পুঁজিপতিরা প্রত্যেকেই তাদের পুঁজি উৎপাদনের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় সরিয়ে নিতে পারে। ফলে তাদের নিজেদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা তাদের মুনাফার হারকে উভয় ক্ষেত্রেই গড়পড়তা হারে নামিয়ে আনে। কোন একটি সমাজের সমস্ত পণ্যের দামের পরিমাণ সমস্ত পণ্যের মোট মূল্যের পরিমাণের সমান হয়। কিন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাখার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা চলে তার ফলে পণ্য তাদের মূল্য অনুযায়ী বিক্রয় না হয়ে, তাদের উৎপাদন দাম অনুযায়ী বিক্রয় হয়। আর এই উৎপাদন দাম হল—ব্যয়িত পুঁজি ও গড়পড়তা মুনাফার যোগফলের সমান।" (লেনিন—মার্কসবাদ)

তৃতীয়তঃ, পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মতে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ ও পুঁজির স্বার্থ অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি হলে অধিক সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত হবে; শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পাবে। আমরা জানি শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ মোট পুঁজির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়; পরিবর্তনশীল পুঁজির উপর নির্ভরশীল। আবার মোট পুঁজির পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পায়, পরিবর্তনশীল পুঁজির পরিমাণ তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মোট পুঁজির পরিমাণ যে হারে বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি পায় না। আবার কিন্তু "পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি মানেই হল, সর্বহারা শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬১৪) সুতরাং পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার সবটা যদি নতুন নিয়োগের মধ্য দিয়ে পূরণ না হয়, তবে ক্রমে একটি "শ্রমিক মজুদ-বাহিনী" গড়ে ওঠে, অর্থাৎ এক বিশাল বেকারবাহিনী গড়ে উঠে। অবশ্য "স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে পরিমাণ শ্রমশক্তি যোগান দেয়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা তার উপরই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। তার বাধাহীন বিকাশের জন্য এই স্বাভাবিক সীমার বাইরে একটি শিল্প মজুদ-বাহিনী প্রয়োজন হয়। (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৫)।

পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিপতিরা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করে, উন্নত ধরনের আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, জটিলতর শ্রমবিভাগ প্রবর্তন করে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। একই শ্রমিক এখন একই শ্রম-সময়ে অনেক বেশী পণ্য তৈরী করতে পারে। প্রতিটি শ্রমিকের উপর শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। পুঁজিপতি তাই শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, নতুন শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ রাখে। ফলে বেকার শ্রমিকের মজুদ-বাহিনী বাড়তে থাকে। "শ্রমিকশ্রেণীর একটি অংশকে অতি পরিশ্রম করিয়ে অপর অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া আলস্যের অভিশাপ...স্বতন্ত্র পুঁজিপতির আরো ধনী হওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায়।" (মার্কস, ক্যাপিটাল, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৩৬)। এই চাপিয়ে দেওয়া বেকারীর ফলে শ্রমিকের উপর নেমে আসে সীমাহীন দুঃখদুর্দশা। অন্যদিকে তারা পুঁজিপতিদের খুশীমতো, নির্দেশ মতো কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হয়। পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়।

চতুর্থত, পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সঙ্গে পুঁজির একত্রীভবন ও কেন্দ্রীভবনের ফলে গড়ে উঠে বিরাট বিরাট কারখানা। ব্যবহার হতে থাকে নানা

প্রকারের উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র। নিজস্ব ব্যক্তিগত উৎপাদনের উপাদান নিয়ে স্বতন্ত্র উৎপাদন ব্যবস্থার স্থলে দেখা দেয় জটিল শ্রম-বিভাগের মধ্য দিয়ে পরস্পর নির্ভরশীল সম্মিলিত প্রচেষ্টার উৎপাদন। পূর্বে হস্তশিল্পীরা নিজেরাই নানা প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করে গোটা দ্রব্যটি তৈরী করত। এখন একজন শ্রমিক একটি দ্রব্যের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র তৈরী করে। অনেক শ্রমিকের টুকরো টুকরো শ্রমের ফলে একটি দ্রব্য তৈরী হয়। ফলে শ্রম ক্রমেই সামাজিক শ্রমে পরিণত হয়। উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদন সংগঠন ক্রমাগতই সামাজিক রূপ গ্রহণ করে। অথচ উৎপাদনের উপাদানের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা কায়েম থাকায় পণ্য ভোগ-দখলের অধিকার ব্যক্তিগতই থেকে যায়। উৎপাদন শক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের এই দ্বন্দ্ব পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরো তীব্রতর হতে থাকে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে এই পর্যায়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় তিনটি মৌলিক স্ববিরোধের সূচনা হয়। প্রথম স্ববিরোধটা হল—পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধির সঙ্গে মুনাফার হার হ্রাসের মধ্যকার স্ববিরোধ। মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পুঁজির সঞ্চয় বৃদ্ধি। আবার পুঁজির সঞ্চয় বাড়লে মুনাফার হার কমে যায়। সাময়িকভাবে কোন পুঁজিপতি হয়ত নিজের মুনাফার হার বাড়িয়ে উপরি মুনাফা কামাতে পারে। এবং তা করে নিজের কারখানায় উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি করে নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে। কিন্তু, তার প্রতিযোগী উৎপাদকরা নিশ্চয়ই চুপ করে বসে থাকবে না। অল্পদিনের মধ্যেই তারাও তাদের কারখানায় উন্নত পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করবে। এমনও হতে পারে যে তাদের মধ্যে কেউ হয়ত উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারে। তখন সকল পুঁজিপতিই উৎপাদন ব্যয়ে পণ্য বেচতে বাধ্য হবে; এবং গড় মুনাফা কমে যাবে। এমনিভাবে ক্রমাগত সঞ্চয় বৃদ্ধি করে পুঁজিপতিশ্রেণী গড় মুনাফা হ্রাসের জালে জড়িয়ে পড়ে। পুঁজিপতিদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়।

দ্বিতীয় স্ববিরোধটি হল—উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি ও জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাসের মধ্যকার বিরোধ। উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ও নতুন যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের মোট পরিমাণ তো বৃদ্ধি পায়ই, উপরন্তু শ্রমিক পিছু উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না; কর্মরত শ্রমিক বেকার হয়, কর্মক্ষম নতুন শ্রমিক কাজ পায় না; শ্রমিকের মজুদ বাহিনী ক্রমেই বড় হতে থাকে। এখানে ওখানে বিশেষ ও উচ্চ কারিগরী দক্ষতা বিশিষ্ট শ্রমিক বা সুবিধা-ভোগী মুষ্টিমেয় শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলেও, মোটের উপর কর্মরত শ্রমিকদের গড়

প্রকৃত মজুরি হ্রাস পায়। কর্মরত শ্রমিকেদের মজুরি হ্রাস ও ক্রমবর্ধমান বেকারীর ফলে সাধারণভাবে সমাজের মোট ক্রয়ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে। মোট উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে মোট ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ফলে পুঁজিপতিরা তাদের উৎপন্ন মোট পণ্য মুনাফাসহ বিক্রয় করতে পারে না। দেখা দেয় আপাত অতি উৎপাদনের সংকট আর এই সংকটের চাপে পুঁজিপতশ্রেণীর মধ্যকার দ্বন্দ্ব তীব্রতর রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

তৃতীয় স্ববিরোধটি হল- উৎপাদন সম্পর্ক ও শক্তির মধ্যকার বিরোধ। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয়— অনেক শ্রমিককে একত্র করে কারখানা প্রথায় উৎপাদন, জটিল শ্রম বিভাগ, উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা। ফলে উৎপাদন শক্তি সামাজিক হতে থাকে, অথচ উৎপাদন সম্পর্ক সেই পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কই রয়ে যায়। তাই শ্রমিক-শ্রেণী ও পুজিপাতশ্রেণীর মধ্যকার বিরোধ তীব্রতর হতে থাকে।

(৩) পুজি সঞ্চালনের তৃতীয় পর্যায় হল -উৎপন্ন নতুন পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করার পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে নতুন পণ্য তৈরী হয়, এই পর্যায়ে তাকে আবার মুদ্রায় রূপান্তরিত করা হয়। তবে পুনরুৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদনের মধ্য দিয়ে নতুন পণ্যে যে মূল্য সৃষ্টি হয় তা হল—ব্যয়িত পুঁজির মূল্য + উদ্বৃত্ত মূল্য। সুতরাং পণ্যকে মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারলেই তবে পুঁজিপতি তার মূল পুঁজি ফিরে পায়, আর সেই সঙ্গে পায় উদ্বৃত্ত-মূল্য। তাই এই পর্যায়ে প্রতিটি পুঁজিপতি চেষ্টা করে কি করে তার উৎপন্ন পণ্যের সবটুকু মুনাফাসহ বিক্রি করতে পারে।

আমরা জানি, নতুন পণ্যে আছে—ব্যয়িত পুঁজির মূল্য + উদ্বৃত্ত মূল্য। সেই পণ্যের সমস্তটা বিক্রি করতে পারলেই পুজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য সহ মূল পুজি ফিরে পায়। পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত মূল্য একটি গুরুত্বপুর্ণ বিষয়। এর একটি অংশ নিয়ে পরশ্রমভোগী পুঁজিপতিশ্রেণী তার ভোগবিলাসের ব্যবস্থা বজায় রাখে। আর অপর অংশটি মূল পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করে আরো বেশী বেশী উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের পথ করে নেয়। সুতরাং, উদ্বৃত্ত-মূল্যসহ ব্যয়িত পুজি ঠিকমতো ফিরে পাওয়ার উপরই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও উন্নততর বিকাশ নির্ভর করে।

পুঁজিপতি যখন কোন দ্রব্য তৈরী করে, তখন সে সেই দ্রব্যটির ব্যবহার-মূল্যের কথা অবশ্যই ভাবে। কারণ, তার উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য না থাকলে কেউ তা পণ্য হিসাবে ক্রয় করবে না। কিন্তু এই পর্যন্ত। দ্রব্যটি তৈরী হওয়ার পর

পুঁজিপতির নিকট তার বিনিময়-মূল্যই সব। আর এই বিনিময়-মূল্যের সবটুকু মুদ্রায় পরিণত করার উপরই তার অস্তিত্ব ও উন্নতি নির্ভর করে।

একটি উদাহরণ সহ বিষয়টি আলোচনা করা যাক। মনে করি এক তাঁত কারখানার মালিক ৩,০০০ টাকার স্থির পুঁজি ও ১,০০০ টাকার পরিবর্তনশীল পুঁজি খরচ করে ৫০০ জোড়া কাপড় তৈরী করল। যদি মালিকের উদ্বৃত্ত-মূল্য আদায়ের হার শতকরা ১০০ ভাগ হয় তবে. তার প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত-মূল্যের পরিমাণ হবে ১,০০০ টাকা। ৫০০ জোড়া কাপড়ের মূল্য দাঁড়াবে—(৩,০০০+১,০০০+১,০০০) টাকা ৫,০০০ টাকা। এর অর্থ হল—তার ব্যয়িত ৪,০০০ টাকা পুঁজির মূল্য ৪০০ জোড়া কাপড়ের মধ্যে আছে, আর ১ ০০০ টাকার উদ্বৃত্ত-মূল্য আছে ১০০ জোড়া কাপড়ের মধ্যে। তাই দেখা যাচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য প্রথম পণ্য-মূল্য হিসাবেই দেখা দেয়। বিনিময়ের মধ্য দিয়ে মূল পুঁজি যেমন পণ্যে রূপান্তরিত হয়, উদ্বৃত্ত-মূল্যও (যা এখন পণ্য রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে) তেমনি বিনিময়ের মধ্য দিয়েই মুদ্রা হিসাবে পুঁজিপতির হাতে আসে। তবেই পুঁজিপতি উদ্বৃত্ত-মূল্য থেকে প্রাপ্ত মুদ্রার একটি অংশ দিয়ে নিজের ভোগ বিলাসের দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে, আর বাকী অংশটি মূল পুঁজির সঙ্গে যুক্ত করে বর্ধিতহারে পুনরুৎপাদন চালাতে পারে।

উৎপন্ন পণ্য-মূল্যের সবটুকু মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারার শর্ত কি? শর্তটি হল—বাজারে যথেষ্ট ক্রেতা থাকতে হবে এবং তাদের এমন অর্থ সামর্থ থাকতে হবে, যেন তারা অন্তত উৎপাদন ব্যয়ের দামে পণ্যটি কিনতে পারে। এমনও হতে পারে যে আমাদের পুঁজিপতি মাত্র ৪০০ জোড়া কাপড বিক্রয় করতে পারল। এ অবস্থায় সে তার ব্যয়িত পুঁজিটুকুই মাত্র মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারবে। উদ্বৃত্ত মূল্যটুকুই অবিক্রিত পণ্য হিসাবে পড়ে থাকবে। আবার যদি সে ৪৭৫ জোড়া কাপড় বিক্রয় করতে পারে, তবে সে তার মূল পুঁজি তো ফিরে পাবেই, উপরন্তু উদ্বৃত্ত-মূল্যের ৳ অংশ মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে পারবে।

আবার এমন অবস্থাও হতে পারে যে, আমাদের পুজিপতি ৫০০ জোড়া কাপড়ই বিক্রয় করল বটে, তবে তা থেকে সে পেল মাত্র ৪,৭০০ টাকা। অর্থাৎ বাজারে কাপড় বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাজার দাম কাপড়ের উৎপাদন ব্যয়ের চেয়ে কম ছিল। তাই সে সমস্ত কাপড় বিক্রয় করেও পণ্য মূল্যের সবটা আদায় করতে পারল না। উপরোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই পণ্য-মূল্যের সবটুকুই মুদ্রায় রূপান্তরিত করতে না পারার জন্য পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদন ব্যাহত হবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নির্ঝঞ্ঝাট বিকাশ বাধা পাবে।

এইবার দেখা যাক বাস্তব অবস্থায় কি ঘটে। পণ্য "উৎপাদনের উপর

প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি সমাজের বৈশিষ্ট্য এই যে, সেই সমাজে উৎপাদনকারীগণ নিজেদের সামাজিক সম্পর্কের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। নিজেদের হাতে উৎপাদনের যে উপাদান থাকে তাই দিয়ে প্রত্যেক উৎপাদক নিজের স্বার্থে উৎপাদন চালায় এবং বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটায়। কেউই জানে না যে, সে যে দ্রব্য তৈরী করছে সেই দ্রব্য বাজারে কি পরিমাণ আমদানী হয় বা বাজারে সেই দ্রব্যের কি পরিমাণ চাহিদা আছে। কেউই জানে না তার নিজস্ব উৎপন্ন দ্রব্য বাস্তব প্রয়োজন মেটাবে কিনা, তার উৎপাদন খরচ আদায় হবে কি না, অথবা সে তার উৎপন্ন দ্রব্য আদৌ বিক্রয় করতে সক্ষম হবে কি না।" (এঙ্গেলস্)

পণ্য-উৎপাদনের উপর নিভরশীল যে কোন সমাজ ব্যবস্থার সম্বন্ধেই একথা খাটে। আবার পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা হল সর্বব্যাপী পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা। কারণ, পুঁজিবাদ পণ্য উৎপাদনকে প্রথমতঃ পুঁজিবাদী পণ্যোৎপাদনের আওতায় আনে এবং পরে সমাজের সমস্ত উৎপাদনকেই পণ্যোৎপাদনে পরিণত করে। এ অবস্থায় পুঁজিবাদী সমাজে উপরোক্ত বিশৃঙ্খলা প্রবল আকারে দেখা দিতে বাধ্য।

"দু'পা সামনে ও এক পা (কখনো দু'পা) পিছনে—পুঁজিবাদী উৎপাদন এমনি লাফিয়ে চলা ছাড়া অন্য কোন ভাবে উন্নতির পথে এগুতে পারে না। আগেই আমরা দেখেছি যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন হচ্ছে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন, বাজারের জন্য পণ্য উৎপাদন। উৎপাদন চালায় স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত পুঁজিপতিরা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ খুশীমতো উৎপাদন করে। বাজারে কোন পণ্য কতটুকু প্রয়োজন হবে কেউই তা সঠিক বলতে পারে না। উৎপাদন চলে আন্দাজের উপর ; প্রত্যেক উৎপাদনকারীর চেষ্টা হলো, যে কোন উপায়ে অপরকে ছাড়িয়ে যাওয়া। সুতরাং উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ বাজারের চাহিদার অনুরূপ না হওয়াই খুব স্বাভাবিক।" (লেনিন গ্রন্থাবলী)

বর্ধিত হারে পুঁজিবাদী পুনরুৎপাদনের লক্ষণ হল—উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি ও উৎপাদন সংগঠনের বিস্তার। প্রথম উৎপাদন শুরু হয় ছোট ছোট কারখানায়। ক্রমে তার জায়গায় দেখা দেয় যন্ত্রপাতি সহ বড় বড় মিল ও ফ্যাক্টরী, শেষ পর্যায়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সহ বিরাট বিরাট কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত অসংখ্য স্বতন্ত্র উৎপাদনকারীর ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পদ জড়ো হয় কিছু সংখ্যক পুঁজিপতির হাতে। পরে আবার এই পুঁজিপতিদের অধিকাংশের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয় গুটিকয়েক একচেটিয়াপতির হাতে। সমাজের সর্ববৃহত্তম সংখ্যাগুরু অংশ পরিণত হয় মজুরি-শ্রমিকে।

উৎপাদনে উন্নততর পদ্ধতি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন

ক্ষমতার অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে চলে অপ্রতিহত গতিতে। উৎপাদন ক্ষমতার দ্রুত বৃদ্ধির ফলে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ কমতে থাকে, কর্মরত শ্রমিক বেকার হয়। কর্মক্ষম সম্ভাব্য শ্রমিক বেকার থাকতে বাধ্য হয়। গড়ে উঠে সর্বহারা শ্রমিকের এক বিরাট মজুদবাহিনী। পণ্যের প্রকৃত ক্রেতা জনগণের বৃহত্তম সংখ্যাগুরু অংশের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমাগতই কমতে থাকে।

একদিকে উৎপাদনের পরিমাণের সীমাহীন বৃদ্ধি, অন্যদিকে জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের ক্রয়-ক্ষমতার ক্রম অবনতি—এই দু'এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে যা ঘটে তা দেখাতে গিয়ে এ লিয়নটিয়েভ তাঁর 'মার্কসীয় অর্থনীতি' বই-এ একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন, তা হল—

"একজন খনি মজুরের ছেলে তার মাকে জিজ্ঞেস করছে, 'আগুন জ্বালছো না কেন মা? বড় যে ঠাণ্ডা!' 'আমাদের যে কয়লা নেই বাবা; তোমার বাবা যে বেকার; তাই আমাদের কয়লা কেনার টাকা নেই।' কিন্তু, বাবার চাকুরি নেই কেন মা?' 'অনেক কয়লা মজুদ রয়েছে, তাই'।"

এর অর্থ হল—হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ সর্বহারা মজুরি-শ্রমিক দিনের পর দিন অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে এমন এক সময়, যখন তাদেরই তৈরী বিভিন্ন পণ্য-সম্ভারে পুঁজিপতিদের গুদামগুলি এমনভাবে ভর্তি হয়ে গেছে যে, উৎপন্ন পণ্য রাখার জায়গার অভাবে উৎপাদন বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। কেন এমন হয়? হয় এইজন্য যে, পুঁজিপতিদের মুনাফাসহ উৎপাদন ব্যয় উসুল হয় এমন দামে সেইসব দ্রব্য ক্রয় করার মতো যথেষ্ট অর্থ জনসাধারণের হাতে নেই। তাই একদিকে দেখা যায় পুঁজিপতিরা হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের মজুত পণ্য বিক্রি করার ধান্দায়, আর তারই পাশাপাশি সর্বহারা মজুরি-শ্রমিক দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে অনাহার, দারিদ্র, অশিক্ষা ও অপুষ্টির সঙ্গে লড়াই করে।

"একটি প্রতিষ্ঠানকে মুনাফা করতে হলে তাকে তার উৎপন্ন দ্রব্য সম্ভার বিক্রয় করতে হবে, খদ্দের সংগ্রহ করতে হবে। আবার এক বিরাট সংখ্যক জনসাধারণকেই হতে হবে এইসব দ্রব্য সামগ্রীর খদ্দের, কারণ বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠান প্রভূত পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করে। কিন্তু, সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের জনসমষ্টির দশ-ভাগের নয় ভাগই দরিদ্র; আর এরা হল সেই দেশের শ্রমিক ও কৃষক। শ্রমিকরা মজুরি পায় খুবই সামান্য, আর কৃষকদের অধিকাংশই শ্রমিকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর অবস্থার মধ্যে বাস করে। আবার তেজী বাজারের সময় বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অত্যধিক পরিমাণে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে এবং বাজারে সেই দ্রব্য এত অধিক পরিমাণে রপ্তানি করে যে, অধিকাংশ লোক দরিদ্র থাকায় দ্রব্যসম্ভারের সবটাই

তারা বিক্রি করে উঠতে পারে না। যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, গুদাম, আড়ত, রেলপথ প্রভৃতির সংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু, সময় সময় এই বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, কারণ উৎপাদনের এইসব উন্নত উপকরণ শেষ পর্যন্ত যাদের অভাব মেটাবে, সেই জনসাধারণ প্রায় ভিক্ষুকের মতো নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।" (লেনিন গ্রন্থাবলী)

এই পরিস্থিতিকেই পুঁজিবাদের অতি উৎপাদনের সংকট বলা হয়। আর এই সংকট পুঁজিবাদের নিত্য সহচর। এ থেকে পুঁজিবাদের নিস্তার নেই। পুঁজিবাদ বার বার এই সংকটে পড়ে, নানা ক্ষয়ক্ষতির মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে তা থেকে বেরিয়ে আসে আবার নতুন বৃহত্তর সংকটে পড়ার অপেক্ষায়। কারণ, পুঁজিবাদ কখনই তার মৌলিক দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ ক্রমাগত সামাজিক হয়ে পড়া উৎপাদন শক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত মালিকানার উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বের মীমাংসা করতে পারে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যেই, অর্থাৎ পুঁজি-সঞ্চালনের ধারার মধ্যেই রয়েছে পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ। পুঁজি-সঞ্চালনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদনের মধ্যে যে স্ববিরোধগুলির সূচনা হয়, পরবর্তী পর্যায়ে, পুঁজি-সঞ্চালনের তৃতীয় পর্যায়ে, অর্থাৎ উৎপন্ন পণ্যকে মূল্যে রূপান্তরিত করার পর্যায়ে সেই স্ববিরোধগুলি পুঁজিবাদী সংকট ডেকে আনে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই সংকট সম্বন্ধে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোতে বলা হয়েছে --

"আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ তার উৎপাদন ব্যবস্থা, বিনিময় ব্যবস্থা ও সম্পত্তি সম্পর্ক নিয়ে এক বিশেষ সমাজরূপে গড়ে উঠেছে। এই সমাজ যাদুকরের মতো উৎপাদন ও বিনিময়ের এক বিরাট উপকরণ গড়ে তুলেছে, অথচ নিজের যাদুমন্ত্রে সঞ্জীবিত পাতালপুরীর এই শক্তিকে সেই যাদুকর এখন আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। বিগত কয়েক দশকের শিল্প ও বাণিজ্যের ইতিহাস হল, আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আধুনিক উৎপাদন শক্তির বিদ্রোহ, অর্থাৎ বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব ও তার আধিপত্য বজায় রাখার জন্য যে সম্পদ সম্পর্ক রয়েছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই উপলক্ষ্যে কয়েক বছর পর পর ফিরে আসা বাণিজ্যিক সংকটের কথা বললেই যথেষ্ট হবে যে, বাণিজ্যিক সংকট প্রতিবারই গোটা বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বকেই আগের আগের বারের চেয়ে বেশী মাত্রায় পরীক্ষার মধ্যে ফেলে। এইসব সংকটে বর্তমান কালে উৎপন্ন দ্রব্যের একটি বড় অংশই শুধু নষ্ট হয় না, উপরন্তু আগে আগে তৈরী হয়েছে এমন উৎপাদন শক্তির একটি প্রধান অংশও কিছুদিন পর পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এইসব সংকটের সময় এমন এক মহামারী—অর্থাৎ অতি উৎপাদনের মহামারী দেখা দেয় যা পূর্ববর্তী যুগে কল্পনাতীত বলে মনে হতো।

সমাজ দেখতে পায় যে, সে যেন হঠাৎ সাময়িকভাবে বর্বর যুগে ফিরে গেছে। এমন মনে হয়, যেন একটি দুর্ভিক্ষ, যেন একটি বিশ্বজোড়া বিধ্বংসী যুদ্ধ জীবনধারণের সমস্ত উপকরণের যোগান রুদ্ধ করে দিয়েছে, শিল্প ও বাণিজ্য যেন ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কেন? কারণ. এখন সেখানে রয়েছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী সভ্যতা, রয়েছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জীবনধারণের উপকরণ, রয়েছে প্রয়োজনের চেয়ে বেশী শিল্প ও বাণিজ্য! সমাজের হাতে যে উৎপাদন শক্তি রয়েছে এখন তা বুর্জোয়া সমাজের সম্পদের অবস্থাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সহায়ক হতে পারছে না, বিপরীতপক্ষে যে সর্তগুলি দিয়ে উৎপাদন শক্তিগুলি বাঁধা রয়েছে তার চেয়ে তারা অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে পড়ছে। আর যখনই তারা সেই শৃঙ্খলকে অতিক্রম করেছে তখনই গোটা বুর্জোয়া সমাজে নেমে এসেছে বিশৃঙ্খলা, বুর্জোয়া সমাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বুর্জোয়া সমাজের অবস্থা এত সংকীর্ণ যে, সে এখন তাদের দ্বারা সৃষ্ট সম্পদকে আর ধরে রাখতে পারছে না। কিন্তু, কি করে বুর্জোয়াশ্রেণী এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসে? একদিকে উৎপাদন শক্তির এক বিরাট পরিমাণের উপর জোর করে ধ্বংস চাপিয়ে দিয়ে; অন্যদিকে নতুন নতুন বাজার জয় করে এবং পুরানো বাজারকে আরো বেশী পুরোপুরিভাবে শোষণ করে, অর্থাৎ ব্যাপক ও অধিকতর ধ্বংসাত্মক সংকটের পথ প্রশস্ত করে এবং সংকটকে রোধ করা যায় এমন সব উপায়কে কমিয়ে ফেলে।"

এ থেকে এ ধারণা মনে আসতে পারে যে পুঁজিবাদ নিজের সৃষ্ট সংকটের জালে জড়িয়ে আপনা থেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু, বাস্তবে তা হয় না। পুরানো ব্যবস্থাকে জোর করে উচ্ছেদ করেই কেবল মাত্র নতুন ব্যবস্থা শুরু হতে পারে। এইমাত্র আমরা দেখলাম যে সংকটের মুখে পড়ে পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তার উৎপন্ন দ্রব্য নষ্ট করে, উৎপাদন শক্তির অংশ বিশেষ ধ্বংস করে। আর এমনি করে বারে বারে উন্নত ও শক্তিশালী উৎপাদন শক্তিকে দুর্বল করে তাকে সাময়িকভাবে পুঁজিবাদী সম্পদ সম্পর্কের শৃঙ্খলের মধ্যে থেকে কাজ করতে বাধ্য করে। কিন্তু, "সংকট দেখিয়ে দেয় যে, আধুনিক সমাজ যা উৎপাদন করছে তার চেয়ে অনেক বেশী সে উৎপাদন করতে পারে এবং যদি জনগণের দারিদ্র্যের সুযোগে জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কোটি কোটি টাকা মুনাফা আদায়কারী গুটিকয়েক ব্যক্তিগত মালিকের অধিকারে না থাকত, তবে সেই উৎপাদন সমগ্র খেটেখাওয়া মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নত করার কাজে ব্যবহার হতে পারত।" (লেনিন গ্রন্থাবলী)

পুঁজিবাদের সূচনার যুগে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল প্রগতিশীল। তারা নিজের

প্রয়োজনে উৎপাদন শক্তির নব নব বিকাশের সূচনা করেছে। সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে উন্নততর পর্যায়ে। কিন্তু আজ আর সে প্রগতিশীল নয়। উৎপাদন শক্তি আজ ক্রমাগতই সামাজিক হওয়ার দিকে এগিয়ে চলেছে। ফলে পুঁজিবাদী সম্পদ সম্পর্কের মধ্যে সে আর বিকাশ লাভ করতে পারছে না। একমাত্র উৎপাদন সম্পর্কের সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন হলেই উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশ সম্ভব। এর অর্থই হল, একটি সমাজ বিপ্লবের ক্ষেত্র এখন প্রস্তুত। কিন্তু "এর অর্থ এই নয় যে, উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন এবং পুরাতন উৎপাদন সম্পর্ক থেকে নতুন উৎপাদন সম্পর্কে ক্রমবিকাশ নির্ঝঞ্ঝাটে, সংঘর্ষ ছাড়াই, বিপ্লব ছাড়াই সংঘটিত হয়। বিপরীত পক্ষে, বিপ্লবের সাহায্যে পুরাতন সম্পর্কের উচ্ছেদ করে এবং নতুন সম্পর্ক পত্তন করে সাধারণত এই ক্রমবিকাশ ঘটে থাকে। একটা স্তর পর্যন্ত উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করেই ঘটে। কিন্তু তা ততদিনই সম্ভব যতদিন পর্যন্ত না নতুন বিকশিত উৎপাদন শক্তি উপযুক্ত পরিপক্কতা লাভ করে। নতুন উৎপাদন শক্তি পরিপক্কতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রচলিত উৎপাদন সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কের ধারক বাহক, অর্থাৎ শাসকশ্রেণী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের পথে বিষম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন একমাত্র উদীয়মান শ্রেণীগুলির সজ্ঞান ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারাই অর্থাৎ এইসব শ্রেণীর বলপ্রয়োগ, অর্থাৎ বিপ্লব দ্বারাই তা দূর করা সম্ভব।" (লেনিন- রাষ্ট্র ও বিপ্লব)

তাই দেখা যাচ্ছে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদন শক্তির উন্নততর বিকাশের ফলে তার সঙ্গে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধ বাধে। আর সেই বিরোধেরই প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বারেবারে ফিরে আসা অতি-উৎপাদনের সংকটের মধ্যে। দেখা দেয় সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা। আর বুর্জোয়াশ্রেণী চায় সেই পরিবর্তনকে আটকে রাখতে। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় এমন একটি প্রগতিশীল শক্তির, যা সচেতনভাবে প্রচেষ্টা চালাবে পরিবর্তনের স্বপক্ষে, সংগঠিত করবে একটি সমাজ-বিপ্লব। বর্তমান যুগে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীই সেই প্রগতিশীল শক্তি। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শ্রমিকশ্রেণী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ব্যক্তিগত সম্পদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ করে সামাজিক মালিকানার উৎপাদন সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা করে। উৎপাদন শক্তির নব নব বিকাশের পথ খুলে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মৌলিক দ্বন্দ্বের অবসান হয়, বার বার ফিরে আসা অতি-উৎপাদনের সংকটের বিপদ দূর হয়। উৎপাদন ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের উপায় থেকে পরিবর্তিত হয়ে সমাজের সমস্ত সভ্যের উন্নততর জীবনযাত্রার উপায় হিসাবে বিকাশ লাভ করে।